উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ'-গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল—'কোর কোর্স', ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল'/'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সামনে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুযোগ এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যান্মাষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুবিধা। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস. পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক—উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই নতুন শিক্ষাক্রম এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে নির্বাচনভিত্তিক এই পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি. কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন—যদিও পূর্বের পরম্পরা অনুযায়ী অন্যান্য বিদ্যায়তনিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। এই নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি-প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্তশিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং এই উদ্যোগের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

Netaji Subhas Open University

Under Graduate Degree Programme

Choice Based Credit System (CBCS)
Subject : Honours in Education (HED)
নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা
বিষয় : শিক্ষা
Course : শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি
Course Code : CC-ED-04

First Print : August, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the Distance
Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

Netaji Subhas Open University

Under Graduate Degree Programme
Choice Based Credit System (CBCS)
Subject : Honours in Education (HED)
নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা
বিষয় : শিক্ষা
Course : শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি
Course Code : CC-ED-04

: বিষয় সমিতি :

: সদস্য :

ড. অতিন্দ্রনাথ দে
Director, SoE, NSOU
Chairperson (BoS)

শ্রী স্বপন কুমার সরকার
Associate Professor, SoE, NSOU

ড. সনৎ কুমার ঘোষ
Professor, SoE, NSOU

ড. সুমন্ত চ্যাটার্জি
Professor, SoE, NSOU

ড. পাপিয়া উপাধ্যায়
Assistant Professor, SoE, NSOU

ড. পরিমল সরকার
Assistant Professor, SoE, NSOU

ড. দেবশ্রী ব্যানার্জি
Professor, Dept. of Education
University of Calcutta

ড. কুতুবুদ্দিন হালদার
Professor, Dept. of Education
University of Calcutta

ড. দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য
Professor, Dept. of Education
University of Calcutta

: কোর্স রচয়িতা :
ড. সনৎ কুমার ঘোষ
Professor, SoE, NSOU

: অনুবাদক :
শ্রী সন্তু বিশ্বাস
SACT-I, Department of Education
Dwijendralal College

: সম্পাদক :
মডিউল—১
ড. পরিমল সরকার
Assistant Professor, SoE, NSOU
মডিউল—২
স্বপন কুমার সরকার
Associate Professor, SoE, NSOU

: বিন্যাস সম্পাদনা :
ড. পাপিয়া উপাধ্যায়
Assistant Professor, SoE, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কিশোর সেনগুপ্ত
নিবন্ধক

UG : শিক্ষা
(HED)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Course : শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি
Course Code : CC-ED-04

মডিউল-১ : Psychological Foundation of Education (শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি)

একক 1 ❑ শিক্ষা মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology) 7 – 34

একক 2 ❑ বৃদ্ধি এবং বিকাশ (Growth & Development) 35 – 73

একক 3 ❑ বিকাশের তত্ত্ব (Theories of Development) 74 – 98

মডিউল-২ : Educational Psychology (শিক্ষা মনোবিজ্ঞান)

একক 4 ❑ ব্যক্তিত্বের মনোবিজ্ঞান (Psychology of Personality) 99 – 126

একক 5 ❑ মানুষের ক্ষমতার মনোবিজ্ঞান (Psychology of Human Abilities) 127 – 161

একক 6 ❑ শিখনের মনোবিজ্ঞান (Psychology of Learning) 162 – 217

একক - ১ ❑ শিক্ষা মনোবিজ্ঞান (Education Psychology)

গঠন **(Structure)**

১.১ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

১.২ ভূমিকা **(Introduction)**

১.৩ মনোবিদ্যা ঃ ধারণা, প্রকৃতি এবং পরিধি **(Concept, Nature and Scope of Psychology)**

  ১.৩.১ মনোবিদ্যার ধারণা **(Concept of Psychology)**

  ১.৩.২ মনোবিদ্যার প্রকৃতি **(Nature of Psychology)**

  ১.৩.৩ মনোবিদ্যার পরিধি **(Scope of Psychology)**

১.৪ শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে মনোবিদ্যা **(Psychology as the Foundation of Education)**

১.৫ শিক্ষাগত মনোবিদ্যার ধারণা প্রকৃতি এবং গুরুত্ব **(Concept, Nature and Significance of Educational Psychology)**

  ১.৫.১ শিক্ষাগত মনোবিদ্যার ধারণা ও সংজ্ঞা **(Concept and Definitions of Educational Psychology)**

  ১.৫.২ শিক্ষাগত মনোবিদ্যার প্রকৃতি **(Nature of Educational Psychology)**

  ১.৫.৩ শিক্ষাগত মনোবিদ্যার তাৎপর্য বা গুরুত্ব **(Significance of Educational Psychology)**

১.৬ সারাংশ **(Summary)**

১.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন **(Self-Assessment Questions)**

১.৮ গ্রন্থপঞ্জি **(Reference)**

১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

কোর্স শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা আশা করা হচ্ছে যা শিখবে—

- মনোবিদ্যার ধারণা এবং শিক্ষার সাথে মনোবিদ্যার সম্পর্ক,
- শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান উপলব্ধি করবে।

- মানব জীবনের বিকাশের পর্যায়, তত্ত্ব এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে জানবে।
- শিক্ষা মনোবিদ্যা এবং শিক্ষার উপর মনোবিদ্যার প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবে।
- মানুষের ক্ষমতা এবং এর প্রভাবের দিকগুলির সাথে পরিচিত হবে।
- শিক্ষা মনোবিদ্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবে।

১.২ ভূমিকা (Introduction)

শিক্ষা বলতে বোঝায় এমন কোনো কাজ বা অভিজ্ঞতাকে যার গঠনমূলক প্রভাব রয়েছে, একজন ব্যক্তির মন, চরিত্র বা শারীরিক ক্ষমতার উপর। আবার প্রযুক্তিগত দিক থেকে বলা যায়—শিক্ষা হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজ, বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রেরণ করে (জর্জ নেলার ১৯৭৫)। শিক্ষা তার সাধারণ অর্থে একটি রূপ, যেখানে একদল মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও অভ্যাস স্থানান্তরিত হয়। যদিও শিক্ষা একটি উপাদান, এটি প্রায়শই শিক্ষকদের নির্দেশনায় সঞ্চালিত হয়। বর্তমানে শিক্ষা একটি একাডেমিক শৃঙ্খলা হিসাবে ঐতিহ্যগতভাবে চারটি বিষয়গত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। যা হল—শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical Basis of Education), শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি (Sociological Basis of Education), শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Psychological Basis of Educatin), শিক্ষার ঐতিহাসিক ভিত্তি (Historical Basis of Education)।

বর্তমান কোর্সের বিষয়টি শিক্ষা মনোবিদ্যার ভিত্তির উপর করা হয়েছে। শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ধারণা ভালোভাবে বোঝার জন্য শিক্ষা মনোবিদ্যার কিছু মৌলিক ক্ষেত্র স্নাতক স্তরে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান অধ্যয়নের সম্পর্কিত বিষয় হল—(১) মনোবিদ্যা, শিক্ষা এবং শিক্ষা মনোবিদ্যা (২) শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রেক্ষিত (৩) শিক্ষা মনোবিদ্যার বিকাশমূলক তত্ত্ব (৪) ব্যক্তিত্ব (৫) মানসিক ক্ষমতা (৬) শিখন।

১.৩ মনোবিদ্যার ধারণা, প্রকৃতি এবং পরিধি (Concept, Nature and Scope of Psychology)

মনোবিদ্যা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক শৃঙ্খলা অধ্যায়নের শাখা। মনোবিদ্যার গুরুত্ব বোঝার জন্য প্রথমে মনোবিদ্যার ধীরে ধীরে ধারণাগত বিবর্তন বোঝা দরকার। মনোবিদ্যা মূলত মানুষের আচরণের অধ্যায়নের বিজ্ঞান। এর গবেষণার ভিত্তি হলো আভ্যন্তরীণ মানসিক ঘটনাগুলির মাইক্রো লেভেলের-এর অধ্যায়ন যা ঘটে মানুষের মনের মধ্যে। মানুষের আচরণ স্বাভাবিক এবং অর্জিত উভয়ই হয়ে থাকে সুতরাং মনোবিজ্ঞানের মাধ্যমে এই দুটি ক্ষেত্রের বৈজ্ঞানিকভাবে অধ্যায়ন করা হয়।

১.৩.১ মনোবিদ্যার ধারণা (Concept of psychology)

মনোবিজ্ঞান বিষয় হিসেবে তুলনামূলকভাবে নবীন, যদিও প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টোটল মনোবিজ্ঞানের পৃথক বিজ্ঞান হিসাবে প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। মনোবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল **'Psychology'** যা গ্রিক শব্দ **'Psyche'** ও **'logos'** থেকে এসেছে। **'Psyche'** কথার অর্থ হল আত্মা (Soul) এবং **'Logos'** শব্দের অর্থ হলো বিজ্ঞান (Science) অর্থাৎ **আত্মার বিজ্ঞান হল মনোবিদ্যা (Psychology is the science of soul)** প্রাচীনকালে গ্রীক মনোবিদরা মনোবিজ্ঞানকে আত্মার বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞা অনেকের কাছে মনঃপুত হল না। কেননা আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। তাদের মতে আত্মা পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ যোগ্য নয় তাই এর প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না। আত্মা নিয়ে কোন বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না তাই একে আত্মার বিজ্ঞান বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

পরবর্তীকালে মনোবিজ্ঞান **'মন'** এর বিজ্ঞান বলে চিহ্নিত হয়। **মনোবিদ হফডিং (Hoffding) বলেন মনোবিজ্ঞান হল মনের বিজ্ঞান (Psychology is the science of mind)** কিন্তু এই ধারণাটি পরবর্তীকালে বিভিন্ন মনোবিদরা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাদের মতে মন শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। মন সম্পর্কেও দার্শনিকগণ এর মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল তাই বলেন মন হল বিমূর্ত ধারণা, তাছাড়া আত্মার মত মনও পর্যবেক্ষণগ্রাহ্য ও পরীক্ষণ সাপেক্ষ নয় তাই এই বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না।

ভুণ্ড (Wundt), টিচেনার (Titchener) প্রমুখ মনোবিদগণ **মনোবিজ্ঞানকে চেতনা অনুশীলনকারী বিজ্ঞান (Science of consciousness)** হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। মনোবিজ্ঞান চেতনার বিজ্ঞান সংজ্ঞাটি পূর্বের সংজ্ঞা দুটি থেকে উন্নত, কারণ চেতনাকে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করার জন্য 'অন্তদর্শন' পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই প্রথম মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব পদ্ধতি উল্লিখিত হয়। অন্তদর্শন হল কোনো বিশেষ মানসিক অভিজ্ঞতা কালে (যেমন—ভয়, রাগ ইত্যাদি) নিজেকে দেখা। ব্যক্তির অভ্যন্তরে কী ঘটছে তা ব্যক্ত করাই হল 'অন্তদর্শন'। কিন্তু এই সংজ্ঞাটিও সমালোচনার সম্মুখীন হয়। শুধু 'চেতন মন'ই মন নয়, 'প্রাক্‌চেতন' ও 'অবচেতন' মন মনোবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। তাই মনোবিজ্ঞান 'চেতন মনের বিজ্ঞান' এই সংজ্ঞাটি আংশিক। McDougall এর মতে, মনোবিজ্ঞান শুধু চেতন মনের বিজ্ঞান হলে বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মনোবিশ্লেষণ সম্ভব নয়। শিশুর আচরণ বা প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। এছাড়া পদ্ধতি হিসাবে অন্তদর্শন পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়ায় এর সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের সামান্যীকরণ সম্ভব নয় যা বিজ্ঞানের অন্যতম শর্ত।

পরবর্তীকালে মনোবিজ্ঞানকে **'আচরণের বিজ্ঞান'** বলে গণ্য করা হয়। Watson, Mc. Dougall, Woodworth প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীগণ এই মতের সমর্থক, যদিও তাঁদের ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

মনোবিদ ওয়াটসন (Watson-1904) বলেন, **মনোবিজ্ঞান হল আচরণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান (Psychology is a science of behaviour)**। মনোবিজ্ঞানকে যদি বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করতে হয় তবে আত্মা, মন, চেতনা প্রভৃতি যে বস্তুগুলি ইন্দ্রিয়াতীত ও যেগুলি পরীক্ষাসাপেক্ষ নয় সেগুলিকে বাদ দেওয়া উচিত। আচরণ হল পর্যবেক্ষণযোগ্য। সুতরাং মনোবিজ্ঞানকে প্রাণীর আচরণের বিজ্ঞান বলাই যুক্তিযুক্ত। যেমন একটি শিশু ভয় পেয়েছে যদি একে আত্মা, মন, চেতনা দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয় তবে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করা যাবে না। কিন্তু যদি শিশুটি ভয়ের ফলে কী ধরনের আচরণ করেছে তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, অর্থাৎ শিশুটির বাহ্যিক আচরণগুলিকে যদি পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এর সঙ্গো সঙ্গো দৈহিক আচরণ যথা মাংসপেশির সংকোচন, গ্রন্থির রস নিঃসরণ, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তচাপ, হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করা হয় তবে অনেক মূল্যবান তথ্যসংগ্রহ করা সম্ভব এবং এটাই হল মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

পরবর্তীকালে **মনোবিদ Mc. Dougall** বলেন, 'Psychology is the positive science of behaviour of living things.' অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান হল প্রাণীর আচরণের বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান।

Mc. Dougall-এর সংজ্ঞার সঙ্গো **Watson**-এর সংজ্ঞার ভাষাগত সাদৃশ্য থাকলেও এর অন্তর্নিহিত অর্থের পার্থক্য রয়েছে।

Watson প্রমুখ আচরণবাদী মনোবিদদের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবদেহের আচরণ ব্যাখ্যা করা যায়, অর্থাৎ তাঁরা জীবের আচরণকে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন।

অপরদিকে Mc. Dougall বলেন, জড়বস্তু যান্ত্রিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু জীবের আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। তারা নিজেদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সচেতনভাবে অনুসরণ করে এবং নিজের সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছোয়।

Desigerato, Howies ও **Jackson** প্রমুখ আচরণবাদীদের মতে, মনোবিজ্ঞান হল মানুষসহ প্রাণীর আচরণ ও ওই আচরণের সঙ্গো সম্পর্কিত মানসিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলি অনুসরণ। মনোবিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যার সঙ্গো Watson-এর ব্যাখ্যার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

আচরণবাদী **মনোবিদ Woodworth** বলেন, 'Psychology is the science of activities in relation to his environment'। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের প্রেক্ষিতে ক্রিয়াকলাপের বিজ্ঞান হল মনোবিজ্ঞান। Woodworth তাঁর সংজ্ঞায় activities বা ক্রিয়াকলাপ বলতে প্রত্যক্ষণ, কল্পনা, চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন এবং পারিপার্শ্বিক বলতে মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গো বহির্জগতের সম্পর্ককে বোঝাতে চেয়েছেন।

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা সম্পর্কে আচরণবাদীদের বক্তব্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে একটি সার্বিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় "মনোবিজ্ঞান জীবের আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান যা জীবের আচরণের ভিত্তিতে মানসিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ, শ্রেণিবিভাগ, গতিপ্রকৃতি, নিয়ম, কারণ ও পরিমাণ নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করে এবং মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গো যুক্ত বিভিন্ন দেহগত প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করে।" এ যাবৎকাল মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে যে সংজ্ঞাগুলি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হল আচরণ সম্পর্কিত বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান। কারণ—

1. **মনোবিজ্ঞান হল বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান (Psychology is positive science) :**

   মনোবিজ্ঞান প্রকৃত বিষয়গুলিকে তুলে ধরে যা বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞানের প্রকৃতি। ভালোমন্দ, নৈতিক-অনৈতিক বা কোনো আদর্শের নিরিখে নয়, যা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানের প্রকৃতি।

2. **মনোবিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ-সাপেক্ষ (Psychology has with observable and experimentable facts) :**

   মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং পরীক্ষণ-সাপেক্ষ। কোনো অতীন্দ্রিয় বিষয় নিয়ে মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে না।

3. **আচরণের নিয়ন্ত্রক হিসাবে মানসিক প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব (Importance on mental process in explaining behaviour) :**

   উডওয়ার্থের মতে, আচরণ বলতে এখানে শুধুমাত্র বাহ্যিক এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আচরণ বলা হয়নি, অভ্যন্তরীণ মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও ভূমিকার কথাও ব্যক্ত হয়েছে এবং সে জন্যই অন্তদর্শনের গুরুত্বও এখানে স্বীকৃত।

4. **আচরণ হল প্রাণী ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ফল (Behaviour results from the interaction between organ and environment) :**

   জীব ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ফলে জীবের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাই হল 'আচরণ'। অর্থাৎ প্রাণী ও পরিবেশের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফলই আচরণ।

5. **মনোবিজ্ঞানে দৈহিক ও মানসিক উভয় ধরনের প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ (Psychology deals with both physical and mental processes) :**

   এই সংজ্ঞায় জীবের দৈহিক ও মানসিক উভয় ধরনের প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ আছে। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গো এখানে আরও একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি হলেন জার্মানির প্রখ্যাত মনোচিকিৎসক সিগমন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Frued), যিনি মনোবিশ্লেষণের

জনক বলে পরিচিত। তাঁর মতে, মনোবিশ্লেষণ হল মানুষের আচরণকে অবচেতন মনের দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ব্যাখ্যা করার জন্য কৌশল ও তত্ত্ব সংগ্রহ। মনস্তত্ত্বের সর্বাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি হল প্রজ্ঞামূলক মনস্তত্ত্ব (Cognitive Psychology) এবং মানবতা ভিত্তিক মনস্তত্ত্ব (Humanistic Psychology)।

6. প্রজ্ঞামূলক মনস্তত্ত্ব (Cognitive Psychology) :

প্রজ্ঞামূলক মনস্তত্ত্ব বলতে বোঝায় সেই মনস্তত্ত্ব যা মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলি অধ্যয়ন করে। যেমন—কীভাবে আমরা চিন্তা করি, প্রত্যক্ষণ করি, স্মরণ করি এবং শিখি। এর মূল বিষয় হল কীভাবে মানুষ তথা অর্জন করে প্রক্রিয়াকরণ করে এবং স্মরণ করে। এর আধুনিকতম ধারণা হল 'Meta Cognition' (অধি প্রজ্ঞা) যা মানুষকে তার প্রজ্ঞামূলক বিকাশ কীভাবে ঘটে তা বুঝতে সাহায্য করে। প্রজ্ঞামূলক মনস্তত্ত্বের সমর্থকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আশুবেল (Ausubel), পিঁয়াজে (Piaget), গ্যানে (Gagne), ব্রুনার (Bruner) প্রমুখ।

7. মানবতাভিত্তিক মনস্তত্ত্ব (Humanistic Psychology) :

মানবতাভিত্তিক মনস্তত্ত্বে সমগ্র মানুষের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর পথিকৃৎ হলেন কার্ল রজার্স (Carl Rogers)। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করা হয় মানুষের আচরণ তার অভ্যন্তরীণ অনুভূতি এবং স্ব-প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত। মানুষের দুঃখ, বেদনা, যত্ন এবং স্ব-মূল্যের উপর এই দৃষ্টিভঙ্গি আস্থাশীল। ম্যাসলো (Maslow) যিনি এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক তাঁর মতে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তার চাহিদার ধারা এই চাহিদাগুলি উচ্চ ক্রমপর্যায় ভুক্ত। যার নীচের দিকে আছে জৈবিক চাহিদাগুলি। যেমন—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন চাহিদা এবং উচ্চ পর্যায়ে আছে ব্যক্তিগত চাহিদা যেমন—আত্মসম্মান, আত্মপূর্ণতা ইত্যাদি।

১.৩.২ মনোবিদ্যার প্রকৃতি (Nature of Psychology) :

বিভিন্ন মতভেদের মধ্যে দিয়ে মনোবিদ্যা একটি স্বতন্ত্রতার জায়গায় উপনীত হয়েছে এবং বিজ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও বিভিন্ন মনোবিদ এই নিয়ে মতভেদ প্রমাণ করেছেন। এই মতভেদ প্রসঙ্গে এল. এন. মান (Munn) বলেছেন—'মনোবিজ্ঞান হল বিজ্ঞান এবং যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত মনোবিদ একজন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও পদ্ধতির অনুশীলনকারী। Psychology হল বৈজ্ঞানিক চর্চা ও তার বাস্তবিক মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলি প্রয়োগ। যেমন—আবেগ, অনুভূতি, আচরণ, জ্ঞান, যা মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই তার প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করলে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা যাবে।

1. **বর্ণনামূলক বিজ্ঞান (Descriptive Science) :**

   মনোবিজ্ঞান হল বর্ণনামূলক বিজ্ঞান। আমাদের মানসিক অভিজ্ঞতা ও ব্যবহার বাস্তব ক্ষেত্রে যেমন হয় তারই বর্ণনা করে।

2. **কার্যকারণ সম্পর্ক (Cause-effect relation) :**

   মনোবিদ্যা বিভিন্ন দিকের কার্যকারণ সম্পর্কে অনুধাবন করে। তাই এটি কার্যকারণ সম্পর্কে বিশ্বাসী।

3. **ব্যবহারিক বিজ্ঞান (Practical Science) :**

   বর্ণনামূলক বিজ্ঞানের সাথে সাথে এটি একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান। কারণ, পদার্থবিদ্যা, গণিত বা রসায়ন এর মতো বিজ্ঞান হলেও এটি প্রাণীর আচরণ নিয়ে আলোচনা করে বলে একে ব্যবহারিক বিজ্ঞানও বলা হয়।

4. **সুসংবদ্ধ জ্ঞান ও তথ্য (Coherent knowledge and information) :**

   অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো মনোবিদ্যার সুসংবদ্ধ জ্ঞান, তথ্য, নীতি ও তত্ত্ব রয়েছে যেগুলি নতুন তথ্য আবিষ্কার এর ফলে এবং নতুন নীতি প্রয়োগও তত্ত্বের প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয়।

5. **সত্যের অনুসন্ধান (Search for truth) :**

   মনোবিদ্যার একটি দিক অন্যতম দিক হলো সত্যের অনুসন্ধান করে।

6. **ব্যবহারিক ও প্রয়োগমূলক (Practical and pragmatic) :**

   যেকোনো বিজ্ঞানের সাধারণত দুটি দিক থাকে, একটি শুদ্ধ (Pure) একটি ফলিত (Applied)। মনোবিদ্যার এই দুটি দিকই বর্তমান।

7. **বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনামূলক বিজ্ঞান (Objective descriptive science) :**

   মনোবিদ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত নৈব্যক্তিক নয় বরং মনোবিদ্যাকে বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনামূলক বিজ্ঞানও বলা যেতে পারে।

১.৩.৩ মনোবিদ্যার পরিধি (Scope of Psychology) :

মনোবিজ্ঞানের কার্যকারীতা এবং প্রয়োগ এর ক্ষেত্র ব্যাপক ও বিস্তৃত। যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর আচরণ বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করে। এখানে আচরণ কার্যটির দ্বারা সবধরনের ক্রিয়াকলাপ ও অভিজ্ঞতা এবং আচরণের জ্ঞানমূলক (Cognitive), অনুভূতি মূলক (Alective), ইচ্ছামূলক (Connetive)

ইত্যাদির দিকে মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। নিম্নে মনোবিদ্যার বিভিন্ন পরিধিগত দিকগুলি আলোচিত হল—

1. বিকাশমূলক মনোবিদ্যা (Development Psychology) :

মনবিদ্যার এই শাখায় মানুষ কীভাবে বেড়ে ওঠে জন্মের পর থেকে শৈশব, বাল্য, কৈশর, বার্ধক্য ইত্যাদি বয়স বৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গো শিশুর সামগ্রিক যে পরিবর্তনের ধারা সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করে বিকাশ মূলক মনোবিদ্যা, যা পরিধির অন্তর্গত।

2. সামাজিক মনোবিদ্যা (Social Psychology) :

মানুষের সমাজ প্রকৃতি ও তার সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান জোগায় মনোবিজ্ঞানের যে শাখায় তা Social Psychology বা সামাজিক মনোবিদ্যা নামে পরিচিত। মানুষের সঙ্গো সম্পর্ক কেমন হবে? মানুষ সংঘবদ্ধ ভাবে কেন বাস করে? দলবদ্ধভাবে থাকার মানসিকতার কারণ কি? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে সামাজিক মনোবিদ্যা।

3. পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যা (Experimental Psychology) :

মনোবিদ্যার এই শাখাটি সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ, শিখন, চিন্তন ইত্যাদি বিষয়গুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা অধ্যয়ন করে থাকে। মূলত এটি ল্যাবরেটরি ভিত্তিক, যেখানে মূলত পায়রা, কুকুর ইত্যাদি পরীক্ষামূলক বিষয় হিসেবে অধ্যায়ন করে থাকে।

4. শারীরতাত্ত্বিক তাত্ত্বিক মনোবিদ্যা (Physiological Psychology) :

দৈহিক গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক প্রক্রিয়া কে বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তা শারীরতাত্ত্বিক মনোবিদ্যা নামে পরিচিত। ইন্দ্রিয়, পেশী, গ্রন্থি, মস্তিষ্ক, সম্পূর্ণ স্নায়ুতন্ত্র হল শারীরতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

5. শিক্ষা মনোবিদ্যা (Educational Psychology) :

মনোবিজ্ঞানের পরিধির মধ্যে অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো শিক্ষা মনোবিদ্যা। শিক্ষা মনোবিদ্যা হল একটি মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগমূলক শাখা যেখানে বিশেষ করে শিক্ষাকালীন শিক্ষার্থীদের আচার আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

6. অস্বাভাবিক মনোবিদ্যা (Abnormal Psychology) :

অস্বাভাবিক বা অসুস্থ মনকে অনুশীলন করার জন্য মনোবিজ্ঞানের যে শাখাটি রয়েছে তা অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান নামে পরিচিত। মানসিক অসুস্থতা পর্যবেক্ষণ করা, তার কারণ খুঁজে

বের করা, তার জন্য চিকিৎসাবিদ্যার পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা, মানুষকে সুস্থ জীবনযাপনের সহায়তা করাই হলো এই মনোবিদ্যার মূল বিষয়বস্তু।

7. শিল্পতত্ত্বমূলক মনোবিদ্যা (Industrial Psychology) :

শিল্প প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার লোক তাদের ভিন্ন ভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা, শিল্প কেন্দ্র সমাজ ইত্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞানেরযে শাখায় আলোচনা হয় তাকে শিল্পতত্ত্বমূলক মনোবিদ্যা বলে।

8. শিশু মনোবিদ্যা (Child Psychology) :

শিশু মনোবিদ্যা হল মনোবিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যেখানে শিশুদের আচার আচরণ, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

9. পরামর্শগত মনোবিদ্যা (Counselling Psychology) :

মনোবিজ্ঞানের এই শাখাটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত, সমাজগত, শিক্ষাগত এবং পেশাগত সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অভ্যাস ও শিক্ষার্থীর উপযুক্ত চাকরির জন্য তাকে পরামর্শ দান করে থাকে।

10. পরিবেশগত মনোবিদ্যা (Environmental Psychology) :

মনোবিদ্যার এই শাখাটি বাহ্যিক জগৎ তথা শব্দ দূষণ পরিবেশ গত ব্যবহার সম্পর্কে মানুষের আচার-আচরণ কেমন হবে ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচনা করাই পরিবেশগত মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু।

মনোবিদ্যার বিভিন্ন পদ্ধতি (Methods of Psychology)

মনোবিজ্ঞানে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণত যে পদ্ধতি গুলি ব্যবহার হয়, তা নিম্নে আলোচিত হলো—

1. অন্তদর্শন পদ্ধতি (Introspection Method) :

অন্তদর্শন হল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পদ্ধতি যা প্রথমে দর্শনের উপর ও পরে মনস্তত্ত্বে ব্যবহৃত হয়। এর সাহায্যে ব্যক্তি তার চেতন মনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করে। অন্তদর্শনের অর্থ হল নিজের ভেতরকে জানা অর্থাৎ মানসিক অভিজ্ঞতাকে অধ্যয়ন করা। গঠনবাদী মনস্তত্ত্ববিদগণ (Structuralist) এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। ব্যক্তি নিজের চেতন মনকে অধ্যয়ন করাই হল অন্তদর্শন। নিজের মানসিক প্রক্রিয়া যেমন—চিন্তা, অনুভূতি, প্রেষণা, কল্পনা ইত্যাদি জানার প্রক্রিয়া হল অন্তদর্শন। মনোবিদ উন্ড (Wundt) প্রথম অন্তদর্শন (Introspection) পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন।

একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, কোনো ব্যক্তিকে বলা হল—"বরফের ঠাণ্ডা জলে আঙুল চুবিয়ে তোমার কী অনুভূতি হয়, কী অভিজ্ঞতা হয় তা ব্যক্ত করো।" ব্যক্তি যেভাবে তার অভিজ্ঞতা জানার চেষ্টা করে তাই হল অন্তদর্শন।

2. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Observation Method) :

আক্ষরিক অর্থে পর্যবেক্ষণ হল বাইরে থেকে দেখা। প্রায় সমস্ত রকমের গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যসংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক পদ্ধতি। ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ করে ব্যক্তির অভ্যন্তরে যে মানসিক প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল তা অধ্যয়ন করাই হল এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য। ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রকাশ বাহ্যিক আচরণের মধ্য দিয়ে ঘটে বলে মনে হয়। ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণই ব্যক্তির মানসিক অবস্থার সংকেত বহন করে। ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্য বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ সঞ্চার করে। শিশুর বিকাশ সম্পর্কীয় বহু গবেষণা বিকাশের বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করেছে যা শিশু মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পর্যবেক্ষণকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায় যেমন—স্বাভাবিক কৃত্রিম, সংগঠিত-অসংগঠিত, অংশগ্রহণকারী এবং অংশ গ্রহণকারী নয় ইত্যাদি।

3. সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview Method) :

সাক্ষাৎকার হল একটি পদ্ধতি যেখানে সাক্ষাৎকারক কথাবার্তার মাধ্যমে ব্যক্তি সম্পর্কীয় নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করে, তার মূল্যায়ন করে। সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য নানারকমের হতে পারে, যেমন—চাকুরীর জন্য সাক্ষাৎকার, মনো-চিকিৎসার জন্য সাক্ষাৎকার, পরামর্শদানের জন্য সাক্ষাৎকার। অনেক সাক্ষাৎকারে মৌখিক সাক্ষাৎকারককে মৌখিক প্রশ্নাবলি বলেন। এটা সঠিক নয়, কারণ প্রশ্নাবলি হল অ-প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি আর সাক্ষাৎকার হল সামনা-সামনি বসে কথোপকথনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি। সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকারী প্রয়োজনীয় তথ্য সামনা-সামনি বসে ব্যক্ত করে। সাধারণত ব্যক্তি লেখার থেকে বলতে পছন্দ করে। একজন দক্ষ সাক্ষাৎকারের নিকট তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অন্যান্য পদ্ধতি থেকে সাক্ষাৎকার অধিকতর গ্রহণযোগ্য। সাক্ষাৎকারক সাক্ষাৎকারীর সঙ্গে সু-সম্পর্ক বা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে এমন সব গোপন তথ্য জানতে পারে যা সাক্ষাৎকারীর পক্ষে লিখিতভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সাক্ষাৎকার হল একটি দ্বি-মুখী প্রক্রিয়া যা তথ্য ও ভাবধারার আদান-প্রদানকে উৎসাহিত করে। এর জন্য প্রয়োজন হল দুই বা ততোধিক ব্যক্তির নৈকট্য এবং কথাবার্তার সমস্ত রকম পথ উন্মুক্ত রাখা। সাক্ষাৎকার হল একটি কৌশল যা কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। লক্ষ্য, প্রকৃতি ও কার্যধারার প্রেক্ষিতে সাক্ষাৎকারকে বিভক্ত করা যায়। সাক্ষাৎকারের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করা হল—

ব্যক্তিগত ও দলগত সাক্ষাৎকার (Group and Individual Interview) : সাক্ষাৎকার যখন একক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হয় তখন তাকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার বলে এবং যখন একদল ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কোনো সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তখন তাকে দলগত সাক্ষাৎকার বলে।

সংগঠিত ও অ-সংগঠিত সাক্ষাৎকার (Structured and Unstructured Interview) : সংগঠিত সাক্ষাৎকার পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। একই প্রশ্ন এখানে একইভাবে উপস্থাপিত হয়। বিকল্প প্রশ্নের সংখ্যা খুব সীমিত এবং তা পূর্ব-পরিকল্পিত।

অ-সংগঠিত সাক্ষাৎকার নমনীয় হয়। সাক্ষাৎকারকের প্রশ্নের স্বাধীনতা বেশি থাকে এবং সাক্ষাৎকারীর উত্তরের বাধাও কম থাকে। প্রশ্নগুলি পূর্ব পরিকল্পিত হলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রশ্নের পরিবর্তনের অবকাশ থাকে।

অ-নির্দেশিত এবং কেন্দ্রীভূত সাক্ষাৎকার (Non-directed and Focused interview) : অ-নির্দেশিত সাক্ষাৎকার (মনোবিশ্লেষণ যার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য) অভ্যন্তরীণ প্রেষণা, অন্তর্নিহিত প্রতিন্যাস, ব্যক্তিগত আশা, ভয়, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত হতে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। নির্দিষ্ট কোনো একটি বিষয় প্রাসঙ্গিক আলোচনার দ্বারা পরিচালিত সাক্ষাৎকার হল কেন্দ্রীভূত সাক্ষাৎকার।

আদর্শায়িত ও অ-আদর্শায়িত সাক্ষাৎকার (Idealized and Non-idealized interviews) : আদর্শায়িত এবং সংগঠিত সাক্ষাৎকারের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। উভয়ের মধ্যেই উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নাবলি পদ্ধতির মিল আছে। নির্দিষ্ট পরিবেশে, নির্দিষ্ট প্রশ্নের মাধ্যমে এই সাক্ষাৎকার পরিচালিত হবে। অ-সংগঠিত সাক্ষাৎকারের সঙ্গে অ-আদর্শায়িত সাক্ষাৎকারের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে প্রশ্নগুলি অনেক সময় পূর্ব-পরিকল্পিত হলেও সাক্ষাৎকারীর গভীরে প্রবেশ করার জন্য সাক্ষাৎকারককে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

4. ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি (Clinical Method) :

প্রধানত অপসংগতিমূলক এবং স্বাভাবিক থেকে বিচ্যুত আচরণ সম্পর্কিত বিশদ তথ্যসংগ্রহের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। অপসংগতিমূলক আচরণ নানা প্রকৃতির হতে পারে যেমন—অসামাজিক আচরণ, প্রক্ষোভমূলক সমস্যা, শিখন সমস্যা, বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়ে পিছিয়ে পড়া ইত্যাদি।

ক্লিনিক্যাল পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির সমস্যা চিহ্নিত করা, কারণ নির্ণয় করা এবং পরিবেশের সঙ্গে সঠিক অভিযোজনের জন্য চিকিৎসার সুপারিশ করা। চিকিৎসার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির অবচেতন মনে প্রবেশ করে অসংগতিপূর্ণ আচরণ নির্দিষ্ট করা ও তার সংশোধন করা। চিকিৎসক সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীকে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষার্থীর অতীত এবং বর্তমান অভিজ্ঞতা, গৃহে,

বিদ্যালয়ে এবং সমাজে শিক্ষার্থীর অতীত এবং বর্তমান অভিজ্ঞতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমস্ত উৎস থেকে তথ্যসংগ্রহ করে তাকে ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করে শিক্ষার্থীর 'কেস হিস্ট্রি' তৈরি করা এবং অস্বাভাবিকতার কারণ নির্ণয় করা হয়।

চিকিৎসকগণ সাধারণত দু-ভাবে 'কেস স্টাডি' করে থাকেন। (1) ক্লিনিক্যাল কেস স্টাডি এবং (2) বিকাশমূলক কেস স্টাডি।

ক্লিনিক্যাল কেস স্টাডি প্রস্তুতে নিম্নলিখিত উৎসগুলি থেকে তথ্যসংগ্রহ করা হয়—

(ক) **প্রাথমিক তথ্য (Primary Data) :** নাম, বয়স, লিঙ্গা, পিতা-মাতার বয়স, শিক্ষা, বৃত্তি, আয়, সন্তান সংখ্যা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি।

(খ) **অতীত ইতিহাস (Previous History) :** গর্ভকালীন মাতার অবস্থা (কোনো সমস্যা ছিল কিনা), জন্মাবার পর শিশুর বিকাশ, শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক অসুস্থতা, পিতামাতার এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গো শিশুর সম্পর্ক ইত্যাদি।

(গ) **বর্তমান অবস্থা (Present Conditions) :** নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক আগ্রহ, বিদ্যালয়ে পারদর্শিতা ইত্যাদি।

5. সার্ভে পদ্ধতি (Survey Method) :

শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ের উপর সমীক্ষার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানমূলক সার্ভে পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়। এখানে Sampling বা দল বাছাইকরণ করে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে তথ্যসংগ্রহে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা হয়। যেমন—অভীক্ষা, প্রশ্নগুচ্ছ, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। তথ্য বিশ্লেষণে পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সার্ভে পদ্ধতির তিনটি শ্রেণি আছে—

(a) **ফিল্ড স্টাডি (Field Study) :** এখানে ঘটনা যেখানে ঘটে সেখানে গিয়ে অনিয়ন্ত্রিত চলকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সাধারণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিক্ষন-শিখন পরিস্থিতিতে আচরণ পরিচালিত করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ পরিকল্পিত শিখন উপকরণ প্রস্তুত করতে হয়। যাদের জন্য পরিকল্পিত উপকরণ প্রস্তুত করা হবে তাদের মধ্যে কয়েকজনকে নিয়ে প্রথমে পরীক্ষা করা হয়। এইভাবে পরীক্ষা করে চূড়ান্ত যথার্থতা নির্ণয় করার পর প্রকৃত শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা হয়। একেই Field try out বলে।

(b) **বিকাশমূলক সার্ভে (Development Survey) :** বিকাশমূলক সার্ভে ক্লিনিক্যাল সার্ভের ন্যায়। এই ধরনের সার্ভেও উলম্ব (Longitudinal) ও অনুভূমিক (Cross Sectional) হতে পারে।

(c) **পার্থক্যমূলক সার্ভে (Differential Survey) :** এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বা বিভিন্ন ঐতিহ্যপূর্ণ দেশের মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য নিরূপণে প্রয়োগ মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য।

6. বিজ্ঞানভিত্তিক বা পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি (Experimental Method) :

মানুষের আচরণকে নৈর্ব্যক্তিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক করে তোলার জন্য মনস্তত্ত্ববিদদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির বিকাশ ঘটে। আচরণবাদীদের একটি বড়ো অবদান হল পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির সাহায্যে মানুষের আচরণ বোঝা, নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা। শিক্ষামনোবিজ্ঞানের কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার সঙ্গে অধ্যয়ন করার জন্য পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প নেই। যেমন প্রাণী কীভাবে শেখে, কীভাবে সেই শিখন অন্য কোনো বিষয়ে লিখতে সাহায্য করে ইত্যাদি।

অনেক মনোস্তাত্ত্বিগণের মতে পরীক্ষা হল নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ, উপাদানের বৈচিত্র্য, সঠিকভাবে সংখ্যার মধ্যমে ব্যক্ত করা এবং প্রকল্পগুলিকে (হাইপোথিসিস) কঠোরভাবে বিচার করার ক্ষেত্রে পরীক্ষণই একমাত্র উপায়। পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি যে ধারাবাহিক পদ্ধতি ব্যবহার করে তাকে পরীক্ষণমূলক নকশা (Experimental Design) বলে। পরীক্ষণমূলক নকশা দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমটিতে নিম্নে উল্লিখিত ৬টি স্তর আছে যেমন—

গবেষণার সমস্যা নির্দিষ্টকরণ (Identification of Research problem)

↓

হাইপোথিসিস গঠন (Formulation of Hypothesis)

↓

সঠিক নকশা নির্বাচন (Selection of Research Design)

↓

পরীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ (Data collection through experiment)

↓

প্রাপ্ত ফলকে বিশ্লেষণ এবং মন্তব্যকরণ (Analysis of Data)

↓

আলোচনা এবং মন্তব্যকরণ (Discussion and Commenting)

পরীক্ষণমূলক নকশার দ্বিতীয় অর্থটি আরও নিয়ন্ত্রিত। এটি হল একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের (subjects) পরীক্ষণমূলক শর্তের মধ্যে রাখা এবং সঠিক পরিসংখ্যান পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা। পরীক্ষণমূলক নকশা গবেষককে নির্দিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হতে

সাহায্য করে। পরীক্ষণমূলক নকশার সঠিকতার উপর গবেষণার মান নির্ভর করে। গবেষণ কী ধরনের সমস্যার উপর কাজ করবেন তার উপর নির্ভর করে পরীক্ষণমূলক নকশার রূপরেখা। পাঠকদের বুঝতে হবে কোনো একটি নকশা সব সমস্যা সমাধানে ব্যবহৃত হয় না। শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক সমস্যা আছে যা ল্যাবোরেটরিতে বা পরীক্ষাগারে করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষকেই নির্দিষ্ট করতে হবে। সম্প্রতিকালে গবেষকগণ বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষামূলক নকশার কথা উল্লেখ করেছেন। পাঠককে পরীক্ষণমূলক নকশার মূল কাঠামোর সঙ্গে পরিচিত করার জন্য পরীক্ষাগারে পরীক্ষা এবং কয়েকটি পরীক্ষণমূলক নকশার উল্লেখ করা হল।

(i) পরীক্ষাগারের পরীক্ষা (Laboratory Experiment) : কোনো কোনো সমস্যাকে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা সম্ভব, যেমন—থর্নডাইকের বেড়াল পরীক্ষা, এবিংহসের স্মৃতির উপর পরীক্ষা ইত্যাদি।

(ii) পরীক্ষাগারের বাইরে পরীক্ষণমূলক নকশা (Experimental Design outside the Laboratory) : পরীক্ষণমূলক নকশাকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি এবং আংশিক নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি। পরীক্ষায় কত জন অংশগ্রহণ করছে, কী ধরনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে পরীক্ষার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তার নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা। কী ধরনের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং গবেষক কী প্রকার সমস্যার উত্তর দিতে চলেছে তার গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হল দলের সংখ্যার উপর। দলের সংখ্যা এক হতে পারে, দুই হতে পারে আবার অসংখ্য হতেও পারে। যেমন—এক দলীয় নকশা, দুই দলীয় নকশা ইত্যাদি।

১.৪ শিক্ষা মনোবিদ্যার ভিত্তি (Psychology as the Foundation of Education)

'শিক্ষা' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'শাস' ধাতু থেকে। যার অর্থ হল শাসন করা, শৃঙ্খলিত করা, নিয়ন্ত্রিত করা, নির্দেশনা দেওয়া। শিক্ষাকে 'বিদ্যা' অর্থেও ব্যবহার করা হয়। এই 'বিদ্যা' কথাটি এসেছে 'বিদ' ধাতু থেকে। যার অর্থ হল জ্ঞান। 'শাস্' বা 'বিদ্যা' উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার সঙ্গে জ্ঞানের একটা সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। শিক্ষা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Education'। 'Education' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খুঁজতে গিয়ে ভাষাবিদগণ বিভিন্ন অর্থের সন্ধান করেছেন। ইংরেজি 'Education' শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ 'Educare' থেকে, যার ব্যাপক অর্থ হল পরিচর্যা করা বা শিক্ষার্থীকে জীবনোপযোগী কৌশল ও দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা। আবার কেউ কেউ বলেন, 'Education' শব্দটি এসেছে মূল লাতিন শব্দ

'Educere' থেকে। যার অর্থ অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার সামর্থ্য নিষ্কাশনে সহায়তা করা। অন্য একটি মতবাদ অনুযায়ী Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Educatum থেকে যার মূলগত অর্থগুলো শিক্ষাদানের কাজ।

মনোবিদ্যার সম্পর্কে ধারণা আমরা পূর্বে অধ্যায়ন করেছি। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান একটি ফলিত শাখা, যেখানে মূলত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আচার আচরণ পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঠিক নির্দেশনা ও পরামর্শ দানের মাধ্যমে সফলতা অর্জনে সহায়তা করে। এবার আমরা আলোচনা করব শিক্ষা ও মনোবিদ্যার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক—

শিক্ষা ও মনোবিদ্যার সম্পর্ক (Relationship Between Education and Psychology) :

ব্যক্তির অভিযোজনমূলক আচরণ বা সামগ্রিক আচরণ অনুশীলন করা হয় মনোবিজ্ঞানে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে সহায়তা করা হয় শিক্ষাবিজ্ঞানে। মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু যেমন ব্যক্তি এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু তেমনি ব্যক্তি। এই হিসেবে মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানকে বলা যায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিজ্ঞান। যে ব্যক্তির আচরণ অনুশীলন করা হচ্ছে, তাকেই শিক্ষার মাধ্যমে বিকশিত করে তোলা হচ্ছে। সুতরাং এই দুই বিজ্ঞানের মধ্যে বিষয়বস্তু সাদৃশ্য আছে। স্বাভাবিকভাবেই তারা সম্পর্কযুক্ত হতে বাধ্য। তাই শিক্ষার সঙ্গে মনোবিদ্যার সম্পর্ক সর্বজনস্বীকৃত। তবে, শুধু শিক্ষা-মনোবিদ্যা নয়, সাধারণভাবে মনোবিদ্যার অন্যান্য শাখাও শিক্ষাকে প্রভাবিত করেছে। আধুনিক শিক্ষার দুটি দিক আছে—একটি হল তার তাত্ত্বিক দিক অপরটি হল ব্যবহারিক দিক। মনোবিজ্ঞান তার এই উভয় দিকের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

আধুনিক শিক্ষার সব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বই মনোবিজ্ঞানের নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যেমন—আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যের (Aim of education) কথা ধরা যাক। এখানে বলা হয়েছে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করাই শিক্ষার লক্ষ্য। পরিপূর্ণ বিকাশ বলতে শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক উভয় দিকের বিকাশের কথা বলা হয়েছে। আর এই বিকাশের প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে। অন্যদিকে আমরা জানি, আধুনিক মনোবিজ্ঞানেও মানুষের সামগ্রিক অভিযোজনমূলক আচরণের গতিপ্রকৃতি অনুশীলন করা হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আধুনিক শিক্ষা ও মনোবিদ্যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আধুনিক কালে শিক্ষাবিজ্ঞানীরা শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তোলার জন্য শিশুদের আচরণগুলিকে সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন দিক থেকে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেন এবং মনোবিজ্ঞানের সকল শাখাগুলির সাহায্য নিয়ে থাকেন। মনোবিজ্ঞানের উপর শিক্ষার এই নির্ভরতা তার প্রায়োগিক স্বার্থেই বেশি। কিন্তু তার মানে এই নয় শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের কাজ এক। শিক্ষার সমস্ত স্তরে মনোবিজ্ঞান পৌঁছোতে পারে না। যেমন শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের কোনো ভূমিকা নেই, তবে শিক্ষা-দার্শনিকগণ

যেভাবে লক্ষ্য স্থাপন করবেন সে লক্ষ্যে পৌঁছোনোর উপায়মাত্র মনোবিজ্ঞান ইঙ্গিত দিতে পারে। এ প্রসঙ্গো শিক্ষাবিদ রায়বার্ন (Ryburn)-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "মনোবিজ্ঞান আমাদের চালক নয়, বরং তাকে আমাদের আজ্ঞাবহ বলা যেতে পারে। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে তার কোনো ক্ষমতা নেই। সে কাজ নীতিবিজ্ঞান বা দর্শন করে থাকে।"

A. শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উপর মনোবিজ্ঞানের প্রভাব (Impact of Psychology on Education)

1. শিক্ষার লক্ষ্য ও মনোবিজ্ঞান (Aims of Education and Psychology) :

মনোবিজ্ঞান মানুষের মন বা আচরণ অনুশীলন করে তার সাধারণ নিয়মাবলি নির্ধারণ করে। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী বা শিক্ষার সঙ্গো যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক বিকাশসাধনের জন্য মনোবিজ্ঞানের এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে থাকে। শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিমনের বিকাশসাধন করা যা মনোবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। সুতরাং, শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান।

2. আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান (Modern Child-centric Education and Psychology) :

আধুনিক শিক্ষার মূল কথা হল—শিশুর জন্য শিক্ষা, শিক্ষার জন্য শিশু নয়। আধুনিক এই শিক্ষাকে বলা হয় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা (Child-centric Education)। এই শিক্ষার তাৎপর্য হল—শিক্ষার্থীর চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ প্রবণতা ইত্যাদি সব দিক বিবেচনা করে তাকে শিক্ষা দিতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে শিক্ষার্থীকে ভালোভাবে জানতে হবে। শিক্ষার্থীকে ভালো করে জানার অর্থ হল তাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অনুশীলন করা। একমাত্র মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানই পারে কোনো মানুষকে বৈজ্ঞানিকভাবে অনুশীলন করতে। এই বিষয়ে মনোবিজ্ঞানের শাখা শিশু মনোবিজ্ঞান (Child Psychology) যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। সুতরাং, শিক্ষার আধুনিক ভাবধারা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, মনোবিজ্ঞানের সঙ্গো শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেছে।

3. আধুনিক শিক্ষালয়ের ধারণা ও মনোবিদ্যা (Concept of Modern Educational Institutions and Psychology) :

মনোবিজ্ঞানে বলা হয়েছে, শিশুর আচরণ পরিবর্তনের জন্য স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশ প্রয়োজন। মনোবিজ্ঞানের এই পরীক্ষিত সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আধুনিক শিক্ষার

শিক্ষালয় সংক্রান্ত ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক ধারণা অনুযায়ী প্রত্যেকটি শিক্ষালয় এমন হবে যেন তা সামাজিক পরিবেশে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে তার শিক্ষা প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে পারে। শিক্ষালয় সংক্রান্ত এই ধারণা সামাজিক মনোবিদ্যার (Social Psychology) ধারণার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে।

4. সক্রিয়তার নীতি ও মনোবিদ্যা (Principle of Activity and Psychology) :

মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই সক্রিয়তাপ্রবণ। অর্থাৎ প্রায় প্রতিটি শিশুই চঞ্চল প্রকৃতির, যে কিছু না কিছু করতে চায়। তার এই কিছু করার মধ্যেই সে শিক্ষা তথা অভিজ্ঞতা লাভ করে। শিশুর এই সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই তার আচরণগত প্রবণতাগুলির পরিবর্তন ঘটে। সেগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার কাজে ব্যবহার করতে পারলে শিশুর কাছে শিক্ষা আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। আধুনিক শিক্ষার একটি মূল নীতি হল সক্রিয়তার নীতি (Activity Principle)। অর্থাৎ, প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার আত্ম-সক্রিয়তার মাধ্যমেই শিখবে। আধুনিক শিক্ষার এই সক্রিয়তার নীতি মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

5. শিক্ষণ পদ্ধতি ও মনোবিজ্ঞান (Methods of Teaching and Psychology) :

আধুনিক শিক্ষায় ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলির প্রত্যেকটিই মনোবৈজ্ঞানিক নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞানের যে বৈশিষ্ট্যগুলি প্রয়োগ করা হয় সেগুলি হল—

- জ্ঞানের সামগ্রীকে বহু ইন্দ্রিয়াভিত্তিক উদ্দীপনার (Multisensory stimulation) মাধ্যমে উপস্থাপন করা।
- শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশকে নির্দিষ্ট ধারাবাহিক (Serial Order) অনুযায়ী উপস্থাপন করা।
- পাঠ গ্রহণের সময় শিক্ষার্থীকে দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে সক্রিয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যমুখী কর্ম নির্বাচন করা।

6. পাঠক্রম রচনা ও মনোবিজ্ঞান (Curriculum Construction and Psychology) :

মনোবিজ্ঞানে বলা হয়েছে, শিশুকে বহুমুখী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করতে পারলে তার সামগ্রিক মানসিক বিকাশ ঘটে। মনোবিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষার পাঠক্রম রচনা করা হয় এবং পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের উপযোগী প্রয়োজনীয় সকল রকম অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করে সেটিকে বহুমুখী করে তোলা হয়।

7. সময় তালিকা ও মনোবিজ্ঞান (Time Table and Psychology) :

কাজ ও অবসাদ (Work and Fatigue) সংক্রান্ত মূল মনোবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য সময়তালিকা স্থির করা হয়। এই নীতি অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত জটিল বিষয়গুলি দিনের প্রথম অংশে অথবা বিরতির ঠিক পরেই রাখা হয়। একটানা অনেকক্ষণ সময়ের জন্য বিরতি না দিয়ে মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য বিরতি দেওয়া হয়।

8. শৃঙ্খলা ও মনোবিদ্যা (Discipline and Psychology) :

মনোবিজ্ঞানে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা স্থাপিত হলে, তার মাধ্যমে যে আচরণ ধারার পরিবর্তন ঘটে, সেই পরিবর্তনগুলি স্থায়ী হয় এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যক্তির মধ্যে থাকে। অন্যদিকে, বহির্জাত শৃঙ্খলার মাধ্যমে যে আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলি অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল। অনুশাসন বা চাপের অভাব ঘটলে, সেই আচরণগুলি আবার ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পায়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে শৃঙ্খলা স্থাপনের যে মুক্ত শৃঙ্খলা (Free Discipline) নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, তা এই মনোবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত।

9. ব্যক্তিগত বৈষম্য ও মনোবিজ্ঞান (Individual Difference and Psychology) :

প্রাকৃতিক নিয়মে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই পার্থক্য দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষেভিক, সামাজিক ইত্যাদি নানা দিক থেকে হতে পারে। এই পার্থক্যকে ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলি বিবেচনা করা হয়।

১.৫ শিক্ষাগত মনোবিদ্যা : ধারণা, প্রকৃতি এবং তাৎপর্য (Educational Psychology : Concept, Nature and Significance)

১.৫.১ শিক্ষাগত মনোবিদ্যার ধারণা (Concept of Educational Psychology) :

মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি অন্যতম শাখা হলো শিক্ষা মনোবিদ্যা যা শিক্ষার্থীর শিখন পরিবেশ সম্পর্কে অনুসরণ করে। সুতরাং বলা যায় মনোবিজ্ঞানীর বিভিন্ন তথ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগমূলক দিক হলো শিক্ষা মনোবিদ্যা। যেখানে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন নীতি তথ্যসূত্র তত্ত্ব শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় এবং শিখন পরিবেশে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং তার ব্যাখ্যা করা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত।

মনোবিজ্ঞানের সুদূর বিস্তৃত ক্ষেত্রের যে অংশে মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণকে অনুশীলন করা হয় তাকেই বলা হয় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের মৌলিক সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করে থাকে। এটি একটি ফলিত মনোবিজ্ঞান (Applied Psychology)। মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল মানুষের আচরণ অনুশীলন করা ও তার যথাযোগ্য তাৎপর্য নির্ণয় করা। কিন্তু এই আচরণ সামগ্রিক আচরণ নয়. বিশেষ এক পরিস্থিতির আচরণ। এই পরিস্থিতি হল শিক্ষা পরিস্থিতি। এক্ষেত্রে শিক্ষা বলতে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আচরণ পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া অর্থাৎ বিকাশকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার বিকাশের ধারাকে অনুশীলন করে। বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্নভাবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন—

সংজ্ঞা (Definitions) :

According to Skinner—“Education Psychology is the branch of psychology which deals with teaching-learning an also covers the entire range and behavior of the personality as related to education”.

মনোবিদ বার্নার্ড (Bernard) বলেছেন—“Education Psychology one of the major divisions of the broad study, deals with learning and teaching specially in the schools, which are society’s formal institution of facilitating learning”.

মনোবিদ ক্রো এবং ক্রো (Crow and Crow) বলেছেন—“শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির জন্ম থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা”।

জাড্ (Judd) বলেছেন—“শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হল সেই বিজ্ঞান যা ব্যক্তিজীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিকাশের বিভিন্ন স্তরের যে পরিবর্তন ঘটে তার বর্ণনা ব্যাখ্যা করে”।

মনোবিদ পিল (Peel) মতে,—“Educational Psychology is the Science of Education”.

সুতরাং, মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগমূলক দিকই হল শিক্ষা মনোবিজ্ঞান। তবে মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের একমাত্র কাজ নয়, মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করার সময় শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি হয়, শিখনের যে বিভিন্ন প্রকৃতি ধরা পড়ে তার সমাধান এবং ব্যাখ্যা করাও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজের অন্তর্ভুক্ত।

১.৫.২ শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রকৃতি (Nature of Educational Psychology) :

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি সাধারণ মনোবিজ্ঞান এর মত স্বতন্ত্র নয়, যা মূলত মনোবিদ্যার মৌলিক

সূত্রগুলির বিষয় নির্ভর তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব প্রকৃতি গড়ে উঠেছে। মনোবিদ্যার প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হল—

(a) শিক্ষা মনোবিদ্যা মনোবিজ্ঞানের একটি পৃথক শাখা (Educational psychology is a separate branch of psychology) :

পূর্বে শিক্ষা মনোবিদ্যা বিজ্ঞানের একটি প্রয়োগমূলক শাখা হিসেবে বিবেচিত হত। বর্তমানে শিক্ষা মনোবিদ্যা বিজ্ঞানের একটি পৃথক শাখা হিসেবে স্বীকৃত। কোন জ্ঞান ভাণ্ডারকে পৃথক বিষয় বলে স্বীকৃতি পেতে হলে কতগুলি শর্ত পালন করতে হয়, এই শর্ত গুলির দ্বারা জ্ঞান বিষয়টিকে যথেষ্ট বিস্তৃত করতে পারবে, এর নিজস্ব অনুশীলন পদ্ধতি ও সমস্যা থাকবে যার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করে সমাধানের উপায় নির্দিষ্ট করা সম্ভব। সমাধানের পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিষয়টিকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ থাকবে, যেখানে শিক্ষা মনোবিদ্যা সব শর্ত পূরণ করে।

(b) শিক্ষা মনোবিদ্যার নিজস্ব পদ্ধতি (Educational psychology has its own method) :

শিক্ষা মনোবিদ্যার বিষয়ে অনুশীলনের জন্য নৈব্যক্তিক ও ব্যক্তিভিত্তিক উভয় ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নৈব্যক্তিক পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম হল পরীক্ষণ পদ্ধতি জেনেটিক পদ্ধতি পরিসংখ্যান পদ্ধতি এবং ব্যক্তিভিত্তিক পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম হলো পর্যবেক্ষণ অন্তর্দর্শন পদ্ধতি কেস স্টাডি তুলনামূলক পদ্ধতি।

(c) শিক্ষা মনোবিদ্যা একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান (Educational psychology is an ideal science) :

ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল হয় এমন সব বিষয় নিয়ে শিক্ষা মনোবিদ্যা আলোচনা করে। ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতি হোক এমন কোন বিষয় নিয়ে শিক্ষা মনোবিদ্যা আলোচনা করে না। এই বিষয়টি মূলত সমাজের মঙ্গাল কর এবং শিক্ষার্থীর কল্যাণকর বিষয় নিয়ে সব সময় আলোচনা করে।

(d) শিক্ষা মনোবিদ্যা একটি গতিশীল বিষয় (Educational psychology is a dynamic subject) :

শিক্ষা মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের যেমন—শিক্ষণ, শিখন, প্রেষণা, মনোযোগ স্মৃতি ইত্যাদিরও ওপর ব্যাপক গবেষণা করা হয় এবং তার ওপর ভিত্তি করে নতুন তথ্য তথ্য নীতি ও সূত্র আবিষ্কার হচ্ছে। যার প্রয়োগ শিক্ষা বিজ্ঞানকে আরো উন্নততর অকার্যকর করে তুলছে। এই অর্থে শিক্ষা মনোবিদ্যা একটি গতিশীল বিষয়।

(e) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Individuality) :

শিক্ষা মনোবিদ্যা ব্যক্তি পার্থক্যকে গুরুত্ব দেয়। ব্যক্তিগত পার্থক্য একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। তাই ব্যক্তি পার্থক্যকে ভিত্তি করে শিক্ষা মনোবিদ্যা তার বিষয় সমূহ পর্যালোচনা করে।

(f) শিক্ষা মনোবিদ্যা এবং অন্যান্য বিজ্ঞান (Educational psychology and other science) :

শিক্ষা মনোবিদ্যার শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান এই দুটি আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনা। সমাজবিদ্যা, জীববিদ্যা, নৃবিদ্যা, পরিসংখ্যান, শারীরবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ব্যবহার করে শিক্ষা মনোবিদ্যাকে আরও কার্যকরী করে তুলতে সাহায্য করে।

(g) শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন আচরণ বিশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ এবং তার পূর্বাভাস (Control and predictive analysis of student learning behaviour) :

শিক্ষা মনোবিদ্যা শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করে, নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা পরিকল্পনাও করে থাকে।

শিক্ষা মনোবিদ্যার পরিধি (Scope of Educational Psychology) :

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান মূলত শিখন ও শিক্ষণ নিয়ে আলোচনা করে। শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটানো ও তার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যপুরণের জন্য শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের যেসব বিষয় আলোচনা করার প্রয়োজন তাই হল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধি। আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধি বা বিষয়বস্তুসমূহ নীচে আলোচিত হল।

(i) শিখন প্রক্রিয়া (Learning Process) :

শিখন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, শিখনের নিয়মাবলী, শিখনে প্রেষণার ভূমিকা, বিভিন্ন প্রকারের শিখন, যেমন—তথ্য শিখন, ধারণা শিখন, দক্ষতা শিখন, সমস্যা সমাধান শিখন, শিখনের বিভিন্ন উপাদান, তত্ত্ব ইত্যাদি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

(ii) প্রাথমিক মানসিক উপাদান (Primary mental ability) :

প্রাথমিক মানসিক উপাদান, যেমন মনোযোগ, স্মৃতি, বুদ্ধি, সৃজনশীলতা ইত্যাদি যা শিক্ষা ও শিখনে বিশেষ প্রয়োজনীয় সে সম্পর্কে আলোচনা শিক্ষা-মনোবিদ্যার অন্তর্গত।

(iii) বিকাশের ধারা (Trend of development) :

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর যে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে তার অনুশীলন অর্থাৎ বিকাশের ধারা আলোচনা এবং শিক্ষার উপর তার প্রভাব, বিকাশের ক্ষেত্রে কী কী করণীয় ইত্যাদি সবই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

(iv) ব্যক্তিসত্তার বিকাশ (Development of Personality) :

ব্যক্তিসত্তা কাকে বলে, ব্যক্তিসত্তা বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলি পর্যালোচনা করে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার বিষয়বস্তুকে সুনির্বাচিত করা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ।

(v) শিখন সঞ্চালন (Transfer of Knowledge) :

শিখন সঞ্চালন কাকে বলে, আদৌ শিখন সঞ্চালন ঘটে কিনা, ঘটলে তার ব্যাখ্যা কী, কীভাবে শিখন সঞ্চালনে উৎকর্ষ ঘটানো যায় তারও আলোচনা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

(vi) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Individuality) :

প্রাকৃতিক নিয়মে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই পার্থক্যকে ভিত্তি করে শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেমন—পাঠক্রম, পাঠদান, মূল্যায়ন ইত্যাদি। ব্যক্তিগত পার্থক্য দূর করা নয়, ব্যক্তিগত বৈষম্যকে ভিত্তি করে ব্যক্তির বিকাশ ঘটানোই গণতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য। কাজেই ব্যক্তিগত পার্থক্য কী, ব্যক্তিগত পার্থক্য কেন হয়, ব্যক্তিগত পার্থক্যকে ভিত্তি করে শিক্ষা কীভাবে পরিকল্পিত হবে ইত্যাদি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

(vii) পরীক্ষা ও মূল্যায়ন (Examination and Evaluation) :

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন শিক্ষা প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। শিক্ষার্থী কতটুকু শিখল, তার মধ্যে প্রত্যাশিত আচরণের পরিবর্তন কতটুকু ঘটল, যদি না ঘটে তার কারণ কী, কীভাবে সংশোধন করা যায় সবই শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। মূল্যায়ন কেবল জ্ঞানার্জনে সীমাবদ্ধ নয়, ব্যক্তির বিভিন্ন দিকের বিকাশের সার্বিক মূল্যায়ন যা আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি তার আলোচনা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

(viii) পরিসংখ্যান বা রাশিবিজ্ঞান (Statistics) :

বর্তমান বিজ্ঞানের বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের ব্যবহার হচ্ছে। শিক্ষাবিজ্ঞান যা সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগ ব্যতীত শিক্ষার্থীর অগ্রগতির সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তাই পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিক্ষকের অর্জন করা একান্ত

আবশ্যক। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন প্রস্তুত, নম্বরদান ও তার তাৎপর্য নির্ণয়ে রাশিবিজ্ঞানের ব্যবহার শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

(ix) মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Health) :

সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজন। অন্যথা শিখন বা পাঠদান কোনোটাই সার্থকভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। মানসিক স্বাস্থ্য কী, মানসিক সু-স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলি কী, কীভাবে সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় তা সবই শিক্ষা-মনোবিদ্যায় আলোচিত হয়। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বা বাইরে ছোটোখাটো অপরাধ করে থাকে। এই অপরাধগুলি কেন করে, কীভাবে দূর করা যায়, এ সমস্ত আলোচনা শিক্ষা-মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

(x) অভিযোজন প্রক্রিয়া (Adjustment Process) :

শিক্ষা হল অভিযোজনমূলক প্রক্রিয়া। সার্থক অভিযোজন কাকে বলে, কীভাবে সার্থক অভিযোজন করা যায়; অভিযোজনের অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশ কী; অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং প্রতিকূল পরিবেশকে প্রতিরোধ করা প্রভৃতি শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

(xi) নির্দেশনা ও পরামর্শদান (Guidance and Counselling) :

শিক্ষা-নির্দেশনা আধুনিক শিক্ষাচিন্তার ফল। শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা, শিক্ষা-সংক্রান্ত নানা তথ্য পরিবেশন করা, শিক্ষা-সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা, শিক্ষার্থীর মধ্যে বৃত্তির পছন্দ বিকাশে সাহায্য করা, শিক্ষার্থীকে বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য জানানো সবই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

(xii) ব্যতিক্রমী শিশুদের শিক্ষা (Exceptional children's education) :

ব্যতিক্রমী অর্থাৎ, প্রতিভাসম্পন্ন, পিছিয়ে পড়া এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে এই ধরনের শিশুদের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হয় এবং কীভাবে এদের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়। এদের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করতে হলে এদের বৈশিষ্ট্য, শিক্ষণ-পদ্ধতি, পাঠক্রম ইত্যাদি জানা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানই সঠিক পথ দেখাতে পারে।

(xiii) শিক্ষা-মনোবিদ্যার গবেষণা (Research on Education Psychology) :

শিক্ষা-মনোবিদ্যার উপর বর্তমানে বহু গবেষণা হচ্ছে। এই গবেষণার ফল প্রয়োজনমতো শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো যেতে পারে। তাই শিক্ষা-মনোবিদ্যার উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও তার ফল শিক্ষা-মনোবিদ্যায় আলোচনা হয়।

১.৫.৩ শিক্ষামনোবিদ্যার তাৎপর্য (Significance of Educational Psychology) :

ভূমিকা (Introduction) :

শিক্ষামনোবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্র বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। জ্ঞানের এই শাখার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার সঙ্গো যুক্ত ব্যক্তিদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। সাধারণত শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় সব থেকে বেশি দায়িত্বভার অর্পণ করে থাকে শিক্ষকের উপর। বিশেষত তাঁর পেশাগত সাফল্যের উপর শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে। এইজন্য তাঁর পেশাগত জ্ঞান ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং একইসঙ্গো পেশাগত মনোভাব গঠন করা দরকার। পেশাগত জ্ঞান কর্মপরিবেশে শিক্ষককে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে সাহায্য করবে, আর পেশাগত দক্ষতার জন্য তাঁর কর্মকুশলতা বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে পেশাগত মনোভাব নিজের পেশা সম্পর্কে উপযুক্ত মানসিকতা গঠনে তাঁকে সাহায্য করবে। বস্তুতপক্ষে এই তিনটি দিক সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন করতে পারলেই শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য আসবে। এইজন্য শিক্ষামনোবিদ্যা সম্পর্কীয় জ্ঞান একজন শিক্ষকের কাছে অত্যন্ত অপরিহার্য। নিম্নে বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষামনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হল।

(১) প্রাথমিক উপাদান ও শিক্ষামনোবিদ্যা (Primary element and Educational Psychology) :

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছিত আচরণগত পরিবর্তন আনা। তবেই সে সার্থকভাবে পরিবেশের সঙ্গো অভিযোজন করতে সক্ষম হবে। এইজন্য তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি বৃদ্ধি করা দরকার। তবে তা নির্ভর করে তার জন্মগত-সূত্রে প্রাপ্ত ক্ষমতা, সামর্থ্য ও প্রবণতার উপর। বিশেষভাবে তার সহজাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, মেজাজ, বুদ্ধি ইত্যাদি যেগুলি সে জন্মগত-সূত্রে লাভ করেছে সেইগুলি সম্পর্কে সচেতন হতে না পারলে সমস্ত শিক্ষা-পরিকল্পনা অকেজো হয়ে পড়বে। তাই শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা, সামর্থ্য, প্রণতা ইত্যাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে শিক্ষামনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

(২) আচরণের পরিবর্তন ও শিক্ষামনোবিদ্যা (Behavioural Change and Educational Psychology) :

শিশু জন্মগত-সূত্রে যে সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে আসে সেগুলি চিরকাল একই রকম অবস্থা থাকে না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গো পরিবেশের সংস্পর্শে সেইগুলির পরিবর্তন হয়। এই সমস্ত পরিবর্তিত ক্ষমতা পরিবর্তনশীল পরিবেশে তাকে অভিযোজন করতে সাহায্য করে। ফলশ্রুতি হিসাবে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং চরিত্র গঠিত হয়। শিশুর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষমতার

পরিবর্তনের দিকগুলি লক্ষ রাখতে হলে সেই পরিবর্তনের ধারা অনুশীলন করতে হবে। এইক্ষেত্রে শিক্ষামনোবিদ্যা আমাদেরকে বিশেষভাবে সহায়তা দান করে থাকে। তাই শিশুর আচরণ পরিবর্তনের ধারা অনুশীলনের ক্ষেত্রে শিক্ষা মনোবিদ্যার যথেষ্ট অবদান থাকায় তার প্রয়োজনীয়তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

(৩) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ও শিক্ষামনোবিদ্যা (Child-Centric Education and Educational Psychology) :

গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা ছিল মুখ্য। তিনিই শিক্ষাদান কার্যের মধ্যমণি ছিলেন, আর শিশু নিষ্ক্রিয় শ্রোতা হিসাবে অবস্থান করত। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর চাহিদা স্বীকৃতি পাওয়ায় পরবর্তীকালে শিক্ষা তার গতানুগতিক চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে শিশুকেন্দ্রিকতার রূপ নেয়। এইরূপ শিক্ষায় শিশুই প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে। তবে শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় পরিণত করতে হলে শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোন কোন দিকের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে, কী ধরনের পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে অথবা কী কী বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে শিক্ষামনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিকভাবে অপরিহার্য।

(৪) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর আচরণ ও শিক্ষামনোবিদ্যা (Students behaviour in the Classroom and Educational Psychology) :

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জটিল সম্পর্কের জাল ছড়িয়ে থাকে। এরই উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে উপদল গঠন করে। উপদলগুলির উপর শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া নির্ভর করে। কখনও এই দলগুলি শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকালে পরস্পরের সহযোগী হয়ে ওঠে, আবার কখনও শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক পরিবেশকে নষ্ট করে দিয়ে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বাধাপ্রদান করে। শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখতে হলে শিক্ষার্থীদের দলীয় গতিধর্মীতা (Group Dynamics) সম্বন্ধে শিক্ষককে আবশ্যিকভাবে ওয়াকিবহাল হতে হবে। কারণ শিক্ষার যথোপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া শিখন প্রক্রিয়া কখনোই সার্থক রূপ পেতে পারে না। তাই শিক্ষার্থীদের দলীয় মনের (Group Mind) প্রকৃতি সম্পর্কে অনুশীলন করতে হলে শিক্ষামনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অপরিহার্য।

(৫) শিশুর প্রকৃতি ও শিক্ষামনোবিদ্যা (Child Nature and Educational Psychology) :

শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য পেতে হলে শিশুর প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের পরিপূর্ণ ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। যাকে শিক্ষা দেওয়া হবে তার সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই

প্রসঙ্গো শিক্ষাবিদ অ্যাডমস (Adams)-এর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—"The teacher teaches John Latin" অর্থাৎ শিক্ষক জন (John)-কে ল্যাটিন শিক্ষা দেন। এই বাক্যে দুটি কর্ম-John এবং Latin বাক্যটির তাৎপর্যগত দিক হল এই যে, শিক্ষকের ল্যাটিন অর্থাৎ বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান যেমন থাকা প্রয়োজন, তেমনি জন (John)-এর প্রকৃতি সম্বন্ধেও ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন। আর জন (John)-কে জানার অর্থ হল জন (John)-এর মানসিক সংগঠন, আগ্রহ, মনোযোগ, বুদ্ধি, মেজাজ ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষকের স্বচ্ছ ধারণা গঠন। এই জ্ঞান আহরণে সাহায্য করতে পারে শিক্ষামনোবিদ্যা। তাই শিশুর প্রকৃতি অনুশীলনে শিক্ষামনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিকভাবে এসে পড়ে।

(৬) শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষামনোবিদ্যা (Teaching Method and Educational Psychology) :

শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ভর করে সার্থক শিক্ষা পদ্ধতির উপর। উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি ছাড়া শিক্ষণ প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে পড়ে। শিক্ষণ পদ্ধতি সঠিকভাবে নির্বাচন করা সম্ভব হলে তবেই শিক্ষার্থীর সঙ্গো বিষয়বস্তুর সংযোগ স্থাপিত হবে এবং শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি বৃদ্ধি পাবে। এমনকী শিক্ষার্থী স্বল্পতম প্রয়াসে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে সমর্থ হবে। শিক্ষাকে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে একদিকে যেমন সঠিক পদ্ধতিটি নির্বাচন করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। পদ্ধতি নির্বাচন বা পদ্ধতি উদ্ভাবনের ভিত্তি হল শিক্ষামনোবিদ্যা। তাই আমরা এইদিক থেকে শিক্ষামনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করতে পারি না।

(৭) বিষয়বস্তু নির্বাচন ও শিক্ষামনোবিদ্যা (Subject Selection and Educational Psychology) :

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করলেই শিক্ষার কাজ শেষ হয়ে যায় না। তাকে ফলপ্রসূ করতে হলে সঠিক বিষয়বস্তু নির্বাচন করা দরকার। আবার যে সমস্ত বিষয়সমূহ নির্বাচন করা হল সেইগুলি শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের অনুকূল কিনা তা যাচাই দরকার। সব শিশুই একই ধরনের দক্ষতা, আগ্রহ, সম্ভাবনা ইত্যাদি নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে না। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজস্ব পৃথক সত্তা থাকায় একের সঙ্গো অপরের পার্থক্য বিদ্যমান। তাই প্রত্যেক শিশুর জন্য একই ধরনের পাঠক্রম নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত হবে না। ব্যক্তি-বৈষম্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে শিশুর জন্য কী ধরনের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে সেই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে একমাত্র শিক্ষামনোবিদ্যা। তাই শিক্ষামনোবিদ্যার জ্ঞান শিক্ষকের কাছে অত্যন্ত অপরিহার্য।

উপসংহার (Conclusion) :

মনোবিদ্যা এবং শিক্ষার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। এই দুটি বিষয় একই প্রসঙ্গো দুটি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্থান সর্বাগ্রে। তাই শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যই সমগ্র শিক্ষাপ্রক্রিয়া পরিচালিত হওয়া দরকার। আর এই কাজে শিক্ষককে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি শুধু শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের সাহায্য করবেন না, পাঠের প্রতি উপযুক্ত আগ্রহ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবেন। এইক্ষেত্রে তাদের বিকাশ ধারার প্রকৃতি, প্রক্ষোভ, বুদ্ধি, মানসিক ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। এমনকী শিক্ষাদান কার্যে তিনি কতটা সফল তাও তাঁর জানা দরকার। তাই সব দিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, শিক্ষামনোবিদ্যার জ্ঞান একজন শিক্ষকের কাছে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

১.৬ সারাংশ (Summary)

মনোবিজ্ঞান মূলত মানুষের আচরণের অধ্যয়ন মূলক বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানে অধ্যায়নের মূল বিষয় হল মানুষের আচরণকে বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা আধুনিক সময়ে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে বিভিন্ন আন্তঃসম্পর্ক মূলক বিষয় অধ্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিক্ষা মনোবিদ্যা, সামাজিক মনোবিদ্যা, জ্ঞানমূলক মনোবিদ্যায়। এই অধ্যায়ের শুরুতেই আলোচিত হয়েছে মনোবিদ্যার ধারণা প্রকৃতি এবং পরিধি এর সঙ্গো আলোচনা করা হয়েছে শিক্ষা মনোবিদ্যা, শিক্ষা ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগ এবং শিক্ষা ও মনোবিদ্যার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। এই অধ্যায়ের শেষের দিকে আলোচনা করা হয়েছে শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য, তার সাথে বর্তমান শিক্ষা তথা শিশুদের শিক্ষা জীবনে শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা।

১.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১. মনোবিদ্যা বলতে কি বোঝো?

২. মনোবিদ্যার সংজ্ঞা দাও।

৩. মনোবিদ্যা দুটি পরিধি লেখো।

৪. মনোবিদ্যা দুটি প্রকৃতি লেখো।

৫. শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি বলতে কী বোঝো?

৬. শিক্ষাগত মনোবিদ্যা কি?

৭. শিক্ষাগত মনোবিদ্যার সংজ্ঞা দাও।

৮. শিক্ষাগত মনোবিদ্যার দুটি প্রকৃতি লেখো।

৯. শিক্ষাগত মনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো।

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী (Reference)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008) Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House, Pvt, Lted. New Delhi.

Chauhan, S.S. (1993) Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P., (2001), Educational Psychology", Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3

Mangal, Dr. S. K., (1998) Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana. 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https:/?www.simplypsychology.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College Distric& Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002), Modern Educational Psychology", Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

একক ২ ❑ বৃদ্ধি এবং বিকাশ (Growth & Development)

গঠন (Structure)

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

২.২ ভূমিকা (Introduction)

২.৩ শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ (Growth and Development of a Child)

২.৪ শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি : জৈবিক, আচরণগত এবং প্রজ্ঞামূলক (Perspectives of Educational Psychology : Biological, Behavioral and Cognitive)

  ২.৪.১ শিক্ষাগত মনোবিদ্যায় জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি (Biological Perspectives of Educational Psychology)

  ২.৪.২ শিক্ষাগত মনোবিদ্যায় আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি (Behavioral Perspective of Educational Psychology)

  ২.৪.৩ শিক্ষাগত মনোবিদ্যায় প্রজ্ঞামূলক দৃষ্টিভঙ্গি (Cognitive Perspective of Educational Psychology)

২.৫ বিকাশ গত পর্যায় এবং তার শিক্ষাগত প্রভাব (Developmental Stages and its Impact on Education)

২.৬ সারাংশ (Summary)

২.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

২.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

উক্ত ইউনিটটি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে শিক্ষার্থীরা যে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে, তা হল—

- শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠবে।

- শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হবে : জৈবিক, আচরণগত এবং প্রক্ষামূলক
- বিকাশের পর্যায় এবং শিক্ষার ওপর তার প্রভাব সম্পর্কে ধারণা গঠন হবে।

২.২ ভূমিকা (Introduction)

প্রতি মুহূর্তে শিশুর মধ্যে যে সব পরিবর্তন হচ্ছে, তাদের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তনকেই বলা হয় বিকাশ (Development)। এটি জীবনব্যাপী সামগ্রিক পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া। এই ভূমিকা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর জীবনের বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। প্রতিনিয়ত এইসব গুণগত পরিবর্তনগুলির মধ্যে এক ধরনের সাম্যস্যতা লক্ষ করা যায়। এইগুলি আবার বিশেষ নিয়মও মেনে চলে। তবে বিভিন্ন ধরনের বিকাশগুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য থাকলেও তাদের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান। প্রত্যেকটি বিকাশ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শিশুর জীবনের একটি দিকের বিকাশ যথাযথভাবে সংঘটিত না হলে অন্যান্য দিকের স্বাভাবিক বিকাশের পথ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে বিকাশ বলতে দৈহিক বৃদ্ধি বা দক্ষতার উন্নয়নকে বোঝায় না। এটি এমন একটি জটিল, ধারাবাহিক ও প্রগতিশীল যার মাধ্যমে শিশুর দৈহিক (Physical), সামাজিক (Social), প্রাক্ষোভিক (Emotional), নৈতিক (Moral), জ্ঞানমূলক (Cognitive), ইত্যাদি দিকের পরিবর্তন সূচিত হয়। এমতবস্থায় শিশুর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত কয়েকটি দিকের বিকাশ সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে নিম্ন আলোচনা করা হল।

২.৩ শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ (Growth and Development of a Child)

জীবনে প্রতিমুহূর্তে, ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া মানুষের জীবনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন—বৃদ্ধি (Growth) বিকাশ (Development), পরিণমন (Maturation) ইত্যাদি। তাই 'বিকাশ' বলতে আমরা কি বুঝি, তা প্রথমে পরিষ্কার হওয়া দরকার। অনেকে বৃদ্ধি (Growth) এবং বিকাশকে (Development) একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু তাৎপর্যগত দিক থেকে বৃদ্ধি এবং বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। দুটো প্রক্রিয়াই ব্যক্তিজীবনে পরিবর্তন (Change) আনতে সক্ষম। কিন্তু 'বৃদ্ধি' বলতে আমরা শুধুমাত্র আকার বা আয়তনের পরিবর্তনকে (Change in size and volume) বুঝি আর 'বিকাশ' (Development) বলতে বিশেষভাবে আকৃতির পরিবর্তন (Change in shape) এবং কাজের উন্নতিকে (Improved function) বোঝতে চাই। 'বৃদ্ধি' (Growth) কথাটির দ্বারা আমরা মানুষের জীবনের পরিবর্তনকে খুব তাৎপর্যহীনভাবে (Casual) বোঝাতে চাই। কিন্তু যখন বিকাশ (Development) কথাটি ব্যবহার করি, তখন সেই পরিবর্তনকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বোঝাতে চাই।

যখন বলি শিশুটির দৈহিক বৃদ্ধি হয়েছে, তখন তার হাত, পা, দেহের কাঠামো লম্বায় বেড়েছে, এইটুকুই বোঝাতে চাই। যখন বলি, শিশুদের দৈহিক বিকাশ হয়েছে, তখন শুধুমাত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন বোঝাই না, সেগুলোর পরিবর্তন হওয়ার ফলে তার যে কর্মক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে সেটা বোঝাতে চাই। তা ছাড়া, বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে আর একটি পার্থক্যের দিক হল—বৃদ্ধি (Growth) সাময়িক প্রক্রিয়া, কিন্তু বিকাশ (Development) জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া (Continue throughout life)। বৃদ্ধির প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরেও বিকাশের প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

- **বৃদ্ধি (Growth) :**

বৃদ্ধি বলতে মনোবিজ্ঞানীরা শিশুর দেহের পরিমাণগত (Quantitative) পরিবর্তন অর্থাৎ দেহের আয়তন (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ও ওজনের বৃদ্ধিকে সূচিত করেছেন)। এই প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী Arnold Gessel বলেছেন—"Growth is a function of the organism rather than of the environment as such." অর্থাৎ বৃদ্ধি হল দেহযন্ত্রের ক্রিয়া যা পরিবেশের ক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয় না।

1. প্রাণীদেহের বৃদ্ধির যে বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় তা প্রধানত দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির নিজস্ব নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত।
2. প্রাণীদেহের বৃদ্ধির এই অভ্যন্তরীণ নিয়ামক দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির বৃদ্ধির সামগ্রিক ভারসাম্য বজায় রাখে এবং দৈহিক বৃদ্ধিকে একটি বিশেষ পথে পরিচালনা করে।
3. দৈহিক বৃদ্ধির নিয়ামককেই এককথায় বলা হয় পরিণমন (Maturation), যার দ্বারা দেহের অস্থি, পেশি, শিরা-উপশিরা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দেহকোশ ইত্যাদি পরিণত হয়।

- **বিকাশ (Development) :**

বিকাশ হল ব্যক্তির সেই জাতীয় শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার পরিবর্তন যার দ্বারা ব্যক্তি যে-কোনো জাগতিক ক্রিয়াকলাপকে আরও বেশি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে। অর্থাৎ বিকাশ হল বিশেষভাবে আকৃতির পরিবর্তন এবং কাজের উন্নতি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—শিশু যখন প্রথম হাঁটতে শেখে তখন সে দৌড়োতে পারে না; কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে খুব সহজেই স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে দৌড়োতে পারে। হাঁটতে পারাটা শিশুর বৃদ্ধির ফল কিন্তু দৌড়োবার ক্ষমতা অর্জন হল দৈহিক ক্ষমতার বিকাশ।

বৃদ্ধির সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General Characteristics of Growth) :

বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

1. **বংশধারা ও পরিবেশের মিথষ্ক্রিয়ার ফলেই বৃদ্ধি ঘটে (Growth is due to the interaction of heredity and environment) :**

   অনেক মনোবিদ মনে করেন, বৃদ্ধির উপর বংশধারার প্রভাব অধিক। আবার অনেকের মত হল পরিবেশের কারণেই বৃদ্ধি ঘটে। অধিকাংশ মনোবিদ অবশ্য মনে করেন বৃদ্ধি বংশধারা ও পরিবেশের মিথষ্ক্রিয়ার ফল। কার প্রভাব বেশি বা কম তা অবান্তর প্রশ্ন। শিক্ষকের কাজ হল, এমন পরিবেশ রচনা করা যা মিথষ্ক্রিয়াকে উৎসাহিত করে এবং বৃদ্ধিকে সার্থক করে তোলে।

2. **বিভিন্ন বয়সে বৃদ্ধির হার বিভিন্ন (Growth rates vary at different ages) :**

   HV Meredith বৃদ্ধির হারের উপর Longitudinal অধ্যয়ন করেছেন (Longitudinal বা 'উলম্ব অধ্যয়ন পদ্ধতি' বলতে বোঝায় একই শিশু বা শিশুদলকে দীর্ঘ সময়ব্যাপী অধ্যয়ন করা)। Meredith অধ্যয়ন করে দেখেছেন—

   - জন্ম থেকে 2-2½ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধির হার খুব বেশি।
   - 2½ বছর থেকে বয়ঃসন্ধিক্ষণের 2 বছর পূর্ণ পর্যন্ত বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়।
   - বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিছু পূর্ব থেকেই বৃদ্ধির হার পুনরায় দ্রুত হারে ঘটে।
   - বয়ঃসন্ধিক্ষণের পরে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়।

3. **বৃদ্ধি ও অনুশীলন (Growth and practice) :**

   বৃদ্ধির উপর অনুশীলনের প্রভাব সম্পর্কিত একাধিক পরীক্ষা হয়েছে এবং ধনাত্মক প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া গেছে (হিলগার্ড—1932; ব্রুনার 1963)। উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকগণ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন।

4. **শিশুদের মধ্যে বৃদ্ধির হারে পার্থক্য দেখা যায় (There is a difference in the growth rate of children) :**

   কিছু শিশুর বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে হয় এবং কোনো কোনো শিশুর বৃদ্ধি শ্লথগতিতে হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর বৃদ্ধির হারের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করবেন।

5. **ব্যক্তিভেদে বৃদ্ধির সমাহার সাধারণভাবে বজায় থাকে (The combination of individual growth is generally maintained) :**

   যে শিশু বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকে, সারাজীবনেই সে এগিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনায় বৃদ্ধির এই বৈশিষ্ট্যের উপর শিক্ষক গুরুত্ব দেবেন। সকলের জন্য একই কর্মসূচি সুপারিত করা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়।

6. **একটা স্তর পর্যন্ত বৃদ্ধি নিরবচ্ছিন্ন এবং ধারাবাহিক (The growth up to a level is uninterrupted and continuous) :**

বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আবার একই সঙ্গো অসুবিধাজনক। শিশুর বৃদ্ধি নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে। বয়সভেদে বৃদ্ধির হারের পরিবর্তন ঘটতে পারে, কিন্তু কোনো বয়সে থেমে গিয়ে আবার শুরু হয়—এমনটি ঘটে না। তাই বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকতা একটি অন্যতম শর্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে এটি তাৎপর্যপূর্ণ এই অর্থে যে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। অসুবিধাজনক এই অর্থে যে, বৃদ্ধি নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক হওয়ার জন্য স্তরভিত্তিক ভাগ করা বিজ্ঞানসম্মত হয় না।

বিকাশের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সমূহ (General Characteristics of Development) :

বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে মনোবিদগণ বিকাশের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি করেছেন তা নিম্নরূপ

1. **অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া (Continuous Process) :**

বিকাশ জীবনকালব্যাপী একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ সঞ্চারের মুহূর্ত থেকে আমৃত্যু এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন চোখে পড়ে না। তবে এই পরিবর্তন ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নষ্ট করে না। বিকাশের ধারায় এক পর্যায় থেকে আর এক পর্যায়ে উন্নীত হওয়াটাও কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। বিকাশের প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবেই এগিয়ে চলে।

2. **ক্রমসংযোজনশীল প্রক্রিয়া (Cohesive Process) :**

বিকাশ একটি ক্রমসংযোজনশীল প্রক্রিয়া অর্থাৎ ব্যক্তির বিকাশের যে-কোনো একটি পর্যায় তার পূর্ববর্তী সকল পর্যায়ের বিকাশের সমষ্টির ফল। ব্যক্তিজীবনের বিকাশ কোনো বিশেষ মুহূর্তে হঠাৎ করে আসে না। বিকাশের যে-কোনো পর্যায় তার পূর্ববর্তী পর্যায় থেকেই আসে।

3. **সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়া (Consistent Process) :**

বিকাশের ধারা সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ কোন্ আচরণের পর কোন্ আচরণ হবে তা মোটামুটি নির্দিষ্ট। যেমন—প্রত্যেক মানবশিশু প্রথমে উপুড় হবে, তারপর বসবে, তারপর হামাগুড়ি দেবে, তারপর হাঁটবে। এই নিয়মানুবর্তিতা প্রায় প্রত্যেক শিশুর ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়।

4. **পৃথকীকরণ অভিমুখী প্রক্রিয়া (Separation oriented Process) :**

বিকাশ পৃথকীকরণ অভিমুখী প্রক্রিয়া অর্থাৎ সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে অগ্রসর হয়। যেমন—মানবশিশু জীবনের প্রথম পর্যায়ে যে-কোনো প্রতিক্রিয়া করার জন্য সমগ্র দেহ কাঠামোকে ব্যবহার

করে কিন্তু জীবনবিকাশের পথে সে যতই অগ্রসহ হয়, ততই সে তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারে।

5. শৃঙ্খলিত প্রক্রিয়া (Chained Process) :

মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশের মধ্যে একটি শৃঙ্খলা বজায় থাকে। একদিকের বিকাশ অপর দিকের বিকাশে সহায়তা করে। যেমন, দৈহিক বিকাশ মানসিক বিকাশকে প্রভাবিত করে আবার মানসিক বিকাশ সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সমস্ত ধরনের বিকাশই ব্যক্তিজীবনে একটি শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলে।

6. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অভিমুখী প্রক্রিয়া (Individual oriented Process) :

বিকাশের প্রক্রিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অভিমুখী। সাধারণভাবে বিকাশ বিশেষ বয়সের ক্ষেত্রে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু পরিণত ব্যক্তিজীবনে তা বিশেষ রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি শিশুর ক্ষেত্রে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই বিকাশ ঘটে।

7. জটিল প্রক্রিয়া (Complex Process) :

মানবজীবনের বিকাশ একটি উন্নত জটিল প্রক্রিয়া। বিকাশের ধারায় দেখা যায়, কোনো বিশেষ সময়ে মানসিক বিকাশের তুলনায় দৈহিক বিকাশের হার বেশি হয়। আবার কোনো সময় দৈহিক বিকাশের তুলনায় মানসিক বিকাশ অনেক বেশি হয়। কোনো কোনো সময় বিভিন্ন দিকের বিকাশ বিভিন্ন দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন হারে হয়। এই বিকাশের হার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে না।

8. বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল (The result of the interaction of heredity and environment) :

মানবজীবনে বিকাশের দুটি প্রধান কারণ হল বংশগতি ও পরিবেশ। শিশু জন্মসূত্রে বংশগতির ধারায় যে স্বাভাবিক ক্ষমতা ও সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায় এবং যে পরিবেশে লালিত হয় সেই পরিবেশ তার উপর কীভাবে প্রতিক্রিয়া করছে, তাদের উভয়ের পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর তার বিকাশের ধারা কেমন হবে তা নির্ভর করে। অর্থাৎ ব্যক্তিজীবনের বিকাশ বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল।

বৃদ্ধি ও বিকাশের স্তর এবং পর্যায়ক্রম (Stage and Sequence of Growth and Development):

মাতৃগর্ভে জীবনের শুরু থেকে তার পরবর্তীকালে একটি শিশুর জীবন অসহায় থেকে যায় যদি না সে বৃদ্ধি ও বিকাশ প্রক্রিয়ায় মধ্য দিয়ে পরিণত বয়সের দিকে এগিয়ে যায়। মনোবিদগণ ব্যক্তিজীবনের

বিকাশকে অনুশীলন করার জন্য বয়স ও বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষের জীবনকালকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন। বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্নভাবে এই স্তর বিভাগ করেছেন। কোনো কোনো মনোবিদ বয়স অনুযায়ী ভাগ করেছেন, আবার কোনো কোনো মনোবিদ শিক্ষাস্তর অনুযায়ী জীবনবিকাশের স্তর নির্ণয় করেছেন।

মনোবিদ পিকুনাস (J. Pikunas) বয়স অনুযায়ী মানুষের জীবনকালকে দশটি স্তরে ভাগ করেছেন। যেমন—

(i) **প্রাক্-জন্মস্তর (Pre-natal Stage) :** মাতৃগর্ভে প্রথম গর্ভবস্থার পর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে অবস্থা ও বিকাশ।

(ii) **সদ্যোজাত স্তর (Neo-natal Stage) :** জন্মের পর থেকে প্রথম চার সপ্তাহ।

(iii) **প্রাথমিক শৈশবের স্তর (Early Infancy) :** একমাস বয়স থেকে দেড় বছর বয়স পর্যন্ত।

(iv) **প্রাথমিক বাল্য স্তর (Early Childhood) :** আড়াই বছর বয়স থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত।

(v) **মধ্য বাল্য স্তর (Middle Childhood) :** পাঁচ বছর বয়স থেকে নয় বছর বয়স পর্যন্ত।

(vi) **প্রান্তীয় বাল্য স্তর (Late Childhood) :** নয় থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত।

(vii) **যৌবনাগমের স্তর (Adolescence) :** বারো থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত।

(viii) **প্রাপ্তবয়স্ক স্তর (Adulthood) :** একুশ থেকে সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত।

(ix) **বার্ধক্য (Senescence) :** সত্তর বছরের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।

মনোবিদ আর্নেস্ট জোন্স (Earnest Jones) মানুষের জীবনবিকাশের ধারাকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। যেমন—

A. **শৈশব (Infancy) :** জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত।

B. **বাল্য (Childhood) :** পাঁচ থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত।

C. **কৈশোর (Adolescence) :** বারো থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত।

D. **প্রাপ্তবয়স্ক (Maturity) :** আঠারো বছর বয়স থেকে পরবর্তী কাল।

অনেক মনোবিদ ও শিক্ষাবিদ স্তর অনুযায়ী জীবনবিকাশের স্তর নির্ণয় করেছেন। যেমন—

1. **প্রাক্-বিদ্যালয় স্তর (Pre-school stage) :** জন্ম থেকে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ বিদ্যালয়ে আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত।

2. **প্রাথমিক শিক্ষার স্তর (Stage of Primary grade) :** ছয় থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণি।
3. **উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার স্তর (Stage of Higher Primary grade) :** নয় থেকে এগারো বছর বয়স পর্যন্ত। অর্থাৎ চতুর্থ থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত।
4. **নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর (Stage of Lower Secondary grade) :** বারো থেকে চোদ্দো বছর বয়স পর্যন্ত। অর্থাৎ অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত।
5. **উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার স্তর (Stage of Higher Secondary grade) :** পনেরো থেকে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত। অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি।

বৃদ্ধি ও বিকাশের পার্থক্য (Difference Between Growth and Development) :

বৃদ্ধি	বিকাশ
এটি মানুষের একটি বিশেষ ধরনের পরিবর্তন যার ফলে শারীরবৃত্তীয় ও কাঠামোগত পরিবর্তন হয়।	এটি সামগ্রিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া।
বৃদ্ধি হল বিকাশের একটা অংশ।	বিকাশ লো বৃদ্ধির থেকে বৃহৎ ও সামগ্রিক ধারণা।
বৃদ্ধি হল কারণ।	বিকাশ হল ফল।
বৃদ্ধি স্বতঃস্ফূর্ত তবে অনুশীলনের প্রভাব দেখা যায়।	পরিবেশের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার হলে বিকাশ ঘটে অর্থাৎ ব্যক্তির সক্রিয়তা এবং অনুশীলন এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।
বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত থাকে।	বিকাশ আমৃত্যু ঘটে।
বৃদ্ধি পরিমাপক যোগ্য।	বিকাশ পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ।
বৃদ্ধি পরিমাণগত।	বিকাশ গুণগত।
বৃদ্ধি ‘অনুশীলন’ বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট যেমন হাতের পেশির ব্যায়াম করলে হাতের পেশির বৃদ্ধি হবে পায়ের পেশির ওপর এর প্রভাব নেই।	বিকাশ সামগ্রিক। মানসিক বিকাশের চর্চা করলে তার প্রতিফলন সামাজিক প্রাক্ষেভিক বিকাশের উপরেও দেখা যায়।

বিকাশের বিভিন্ন দিক বা মাত্রা (Dimension of Development) : মনোবিদগণ মানব বিকাশকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল—

দৈহিক বিকাশ (Physical Development)

জন্মের পর থেকে বড়ো হওয়া পর্যন্ত একটি মানবশিশুর শরীরে যা কিছু পরিবর্তন ঘটে, তাকে বলা হয় দৈহিক বিকাশ। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গাপ্রত্যঙ্গোর বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং বিভিন্ন অঙ্গাপ্রত্যঙ্গোর কাজের বিকাশ বা সঞ্চালনমূলক বিকাশ এই দুই ধরনের বিকাশের সাহায্যে শিশুর পরিপূর্ণ শারীরিক বা দৈহিক বিকাশ সাধিত হয়। এই দৈহিক বিকাশের উপর অন্যান্য বিকাশ ও অনেকাংশে নির্ভরশীল। অন্যান্য বিকাশ বলতে মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক বিকাশকে বোঝানো হয়েছে। এইজন্য দৈহিক বিকাশকে মনোসঞ্চালন বিকাশও বলা হয়ে থাকে।

সঞ্চালনমূলক বিকাশ (Motor Development) :

শিশুর সঞ্চালন বিকাশ বলতে বোঝায় তার শক্তি এবং গতির বিকাশ এবং কত নিখুঁতভাবে সে তার হাত, পা ও শরীরের অন্যান্য বেশি ব্যবহার করতে পারছে। শিশুর সামগ্রিক বিকাশে সঞ্চালন বিকাশ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। সঞ্চালনের বিকাশ শিশুর মানসিক বিকাশের সঙ্গো যুক্ত। শিশু তার বৌদ্ধিক কৌতূহল নিবারণের জন্য সঞ্চালমূলক কার্যাবলির সাহায্যে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ এবং আবিষ্কার করার চেষ্টা করে। এছাড়া অপরের সঙ্গো সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করা এবং কীভাবে অন্যদের সঙ্গো সহযোগিতা করতে হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে সঞ্চালনমূলক আচরণ শিশুকে সাহায্যে করে। শিশুর প্রাক্ষোভিক আচরণেও সঞ্চালনমূলক বিকাশের গুরুত্ব দেখা যায়। কারণ শিশুর, শক্তি, গতি, সংযোজন ক্ষমতা এবং দক্ষতা অনেকাংশে তার সাফল্য ও ব্যর্থতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই সাফল্য ও ব্যর্থতা শিশুর সন্তুষ্টি, বিরক্তি, ক্রোধ এবং ভয় ইত্যাদির কারণ হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও সঞ্চালনমূলক বিকাশের বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়। একটি শিশু হয়তো বৌদ্ধিক দিক থেকে খুব অগ্রসহ, কিন্তু সঞ্চালনগত বৈশিষ্ট্যে দুর্বল। অপর একটি শিশু হয়তো বাচনিক বুদ্ধির দিক থেকে দুর্বল, কিন্তু সঞ্চালনসূচক কার্যাবলির ক্ষেত্রে খুব দক্ষ, যার ফলে বৌদ্ধিক শিক্ষা ব্যতীত অন্যান্য শিখনের ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত শিশুটি দ্বিতীয় শিশুটির থেকে অনেক বেশি সফল।

মানষিক বিকাশ (Mental Development) :

নবজাত মানবশিশু জন্মসময়ে অত্যন্ত অসহায় ও পরনির্ভর থাকে। অপরের সহায়তা ছাড়া তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। নবজাত শিশুর মধ্যে হাঁচি, কাশি, চক্ষু বন্ধ করা প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যাবর্তক প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা থাকে। এ ছাড়াও নবজাত শিশুর মধ্যে কতকগুলি আবেগজাত প্রতিক্রিয়ার ও সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণ করার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু এগুলিই শিশুর বেঁচে থাকার বা

বাহ্যজগতের সঙ্গে প্রতিযোজনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তারজন্য দরকার শিশুর নতুন আচরণ শিক্ষা করার নতুন আচরণ করার ক্ষমতা নিয়ে শিশু জন্মায় এবং এই ক্ষমতার ক্রমবিকাশে শিশুকে বাহ্য জগতের সঙ্গে অভিযোজনের সহায়তা করে।

বৌদ্ধিক বিকাশ (Cognitive Development) :

জন্মের পর থেকে শিশুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক ক্ষমতা বিকশিত হতে থাকে। এই ক্ষমতাগুলি মূলত অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা। এই ক্ষমতাগুলিকে প্রয়োগ করে শিশু পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে, কল্পনা করতে পারে ইত্যাদি। এই ক্ষমতাগুলিই হল বৌদ্ধিক ক্ষমতা।

ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতা, যেমন—চিন্তন, কল্পন, স্মৃতি ইত্যাদি যেগুলি ব্যক্তিকে সতত পরিবর্তনশীল পরিবেশে অভিযোজনে সহায়তা করে বা ব্যক্তিকে জটিল কর্মসম্পাদনে সহায়তা করে, সেগুলির বিকাশই হল বৌদ্ধিক বিকাশ।

প্রাক্ষোভিক বিকাশ (Emotional Development) :

প্রক্ষোভের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Emotion'। লাতিন শব্দ 'Emovere' শব্দ থেকে এসেছে 'Emotions' শব্দটি। Emover শব্দটির অর্থ বাইরে থেকে পরিচালিত করা (to move out)।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, প্রক্ষোভ হল এক জটিল মানসিক অনুভূতি যা কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা থেকে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে অঙ্কুরিত হয়। প্রক্ষোভ ব্যক্তির সহজাত ধর্ম। ব্যক্তির মধ্যে আচরণের যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তার মূলে রয়েছে প্রক্ষোভ। সাধারণভাবে ভয়, রাগ, ঘৃণা, আনন্দ ইত্যাদির মতো মানসিক অবস্থাগুলিকে প্রক্ষোভ বলা হয়ে থাকে। মনোবিদগণ মনে করেন, যে কোনো ধরনের বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্যে বিশেষ ধরনের মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে। তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে, বস্তুধর্মী প্রত্যক্ষণের ফলে শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন হয় না, বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্যে এক ধরনের মানসিক অবস্থারও সৃষ্টি করে। এই মানসিক অবস্থাকে বলা হয় অনুভূতি (Feeling)। অর্থাৎ, কোনো বস্তুকে ভালোলাগা, মন্দলাগা ইত্যাদি অবস্থাগুলি এক-একটি মানসিক অনুভূতি। কিন্তু, অনেক সময় মানুষের জীবনে এই অনুভূতিগুলি তীব্রতা লাভ করে এবং বিভিন্ন প্রকার বহিরাচরণের মধ্যে সেগুলি প্রকাশ পায়। যেমন—কোনো জিনিস পছন্দ হলে আমরা আনন্দ করি, মনোমতো জিনিস হাতে না পেলে রাগ বা দুঃখ প্রকাশ করি ইত্যাদি। এই ধরনের তীব্র মানসিক অনুভূতিগুলিকে বলা হয় প্রক্ষোভ (Emotion)। সহজ কথায়, প্রক্ষোভ হল দৈহিক ও মানসিক সক্রিয়তার সহায়ক এক ধরনের মানসিক অবস্থা।

সামাজিক বিকাশ (Social Development) :

একটি শিশু যখন জন্মায়, তখন সেই শিশুটি বলা হয় ইন্দ্রিয়সর্বস্ব একটি প্রাণী (Asocial)। বয়স

বৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গো শিশুর মনে নানাভাবে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ, রীতিনীতি এবং ভাবাদর্শ অনুপ্রবেশ করানো হয়। যে সমাজে শিশু জন্ম হয়, সেই সমাজের আদবকায়দা, আচার-বিচার শেখানো হয়। ভাব প্রকাশ ছাড়াও সে অনেক কিছু শেখে। ভাষা শেখার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক সমাজের ঐতিহ্য সেই সমাজে প্রচলিত ভাষার প্রকাশভঙ্গিতে এবং বিভিন্ন শব্দের আকারে প্রতিফলিত হয়। এইভাবে তাকে নানা উপায়ে গড়েপিঠে সমাজের উপযুক্ত মানবশিশুতে রূপান্তরিত করার নাম সামাজিকীকরণ (Socialization)। অতি শৈশবে শিশু যা ভাবে, সেটা তার বাইরের আচার-আচরণে প্রকাশ পায়। সামাজিকীকরণের এই পর্যায়কে সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে দীক্ষিতকরণ (Social indoctrination) বলা হয়। পরবর্তীকালে দীর্ঘকাল যাবৎ দীক্ষিতকরণ চলার ফলে সমাজে বসবাসকারী লোকদের সামাজিক ভাবাদর্শ এবং আচরণবিধি মেনে চলার অনুকূল মানসিকতা তৈরি হয়ে যায়। সমাজ নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। সামাজিকীকরণের এই পর্যায়কে সামাজিক আচারবিচার ও আচরণ বিষয়ে অভ্যস্তকরণ (Habituation) বলা হয়। সুতরাং সমাজ নির্ধারিত নিয়মকানুন, রীতিনীতির ধারার মধ্যে দিয়ে শৈশব অবস্থা থেকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা ব্যক্তিজীবনে সতত ক্রিয়াশীল, তারই ফলশ্রুতি হিসাবে সামাজিক বিকাশ ঘটে। এককথায়, শিশুর সামাজিক আচার-আচরণের প্রক্রিয়াকেই সামাজিক বিকাশ (Social development) বলে অভিহিত করা হয়।

নৈতিক বিকাশ (Moral Development) :

নৈতিকতা হল ভালোমন্দের বিচারকরণের ক্ষমতা। ভালো বা খারাপ নির্ধারিত হয় সমাজ ও কৃষ্টির মানদণ্ডের উপর। একটি শিশুর জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আচরণ অর্জিত হয় যেগুলির উপর পারিবারিক, সামাজিক তথা কৃষ্টিগত প্রভাব লক্ষ করা যায়। এটাই হল নৈতিক বিকাশ (Moral development)। সামাজিক ও কৃষ্টিগত রীতিনীতি, নিয়ম-কানুনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির যথোপযুক্ত আচরণ প্রক্রিয়ায় হলো নৈতিক বিকাশ।

২.৪ শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি : জৈবিক, আচরণগত এবং প্রজ্ঞামূলক (Perspectives of Educational Psychology : Biological, Behavioral and Cognitive)

২.৪.১ শিক্ষা মনোবিদ্যার জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি (Biological Perspective of Educational Psychology) :

জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি মনোবিদ্যার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অন্যতম, যা মানবদেহের বিভিন্ন দিকের যেমন শারীরবৃত্তীয় শক্তি, মস্তিষ্ক, নিউরোট্রান্সমিটার এবং মানুষের আচরণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ এর

সাহায্য করে। জৈবিক দৃষ্টিকোণ বা বায়ো সাইকোলজি একটি সর্বশেষ বিকাশ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র যা একটি বিশেষ শাখা হিসেবে ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব অর্জন করেছে সাম্প্রতিক সময়ে। মনোবিজ্ঞানের এই শাখাটি দ্বারা বিভিন্ন পরিচিতি বিষয় যেমন মনোজৈবিক, জৈবিক মনোবিদ্যা, আচরণবাদ নিউরো সাইন্স এবং শারীরবৃত্তীয় মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি মনোবিদ্যার শিক্ষার বিভিন্ন দিকে সমৃদ্ধ করেছে। মনোবিদ্যার এই শাখাটি মানুষের আভ্যন্তরীণ আচরণের সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতা ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করে। মানুষের আচার-আচরণ অনুভূতি এবং চিন্তা ভাবনাকে প্রভাবিত করে।

বর্তমানে শিক্ষা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রেও জৈবিক ভিত্তি অন্যতম। এর মাধ্যমে একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন আচার আচরণ, চিন্তা চেতনা ও মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারে। শিক্ষার্থীদের দৈহিক সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক সমস্যা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে এবং তার সমাধানের চেষ্টা করে। বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে দেখা যায় যে শিক্ষার্থীদের শারীরবৃত্তীয় ঠিক তাদের আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় যার ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন আচরণ করে থাকে। জৈব মনোবিদ্যা বিভিন্ন জৈবিক নির্ধারক এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রক্রিয়া অনুভূতি এবং প্রজ্ঞামূলক কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা দেয়।

২.৪.২ শিক্ষা মনোবিদ্যার আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি (Behavioural Perspective of Educational Psychology) :

আচরণবাদী মনোবিদগণের মতে, আচরণবাদী শিখন হল অর্জিত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে আচরণের স্থায়ী পরিবর্তন। প্রাণীর অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় উদ্দীপনার প্রেক্ষিতে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে (S-R) এবং অর্জিত অভিজ্ঞতাই প্রাণীকে নতুন বিষয় আয়ত্ব করতে বা আচরণের পরিবর্তন করতে বা শিখন লাভে সাহায্য করে। বিভিন্ন আচরণবাদী মনোবিদগণের প্রবর্তিত 'আচরণগত শিখন তত্ত্ব' (Behavioural learning theory) সমূহের মাধ্যমে 'কীভাবে আমরা শিখন লাভ করি', তা জানতে পারি।

মনোবিদ্যার বিভিন্ন দিক গুলির মধ্যে একটি অন্যতম দিক হলো আচরণবাদ মনোবিদ্যা যা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির বাহ্যিক দিক পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে তার সম্পর্কে ধারণা গঠনে সহায়তা করে। আচরণবাদীরা মনে করেন যে পরিবেশগত উদ্দীপনার প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া আমাদের ক্রিয়া গুলিকে গঠন করে। আচরণবাদ যা আচরণগত মনোবিদ্যা নামে পরিচিত, এর উপর ভিত্তি করেই শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব গড়ে উঠেছে এবং শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক জ্ঞান লাভের উপায় হিসাবে সাহায্য করেছে। আচরণবাদীরা বিশ্বাস করেন যে আমাদের প্রতিক্রিয়া পরিবেশগত উদ্দীপনা আমাদের কর্মকে রূপ দেয়।

২.৪.৩. শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রজ্ঞামূলক দৃষ্টিভঙ্গি (Cognitive Perspective of Educational Psychology) :

১৮৭৯ মনোবিজ্ঞানী উইলহেম উন্ড দ্বারা মনোবিজ্ঞান এর উপর একটি প্রতিষ্ঠান করা হয়। যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন পরীক্ষাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিদ্যার উপর কাজ শুরু হয়। আচরণবাদ মনোবিদ্যার পরেই প্রজ্ঞামূলক মনোবিদ্যার সাড়া পড়ে সারা বিশ্বজুড়ে। প্রজ্ঞামূলক দিক মানুষের মানসিক প্রক্রিয়ার উপর জোর দেয়। মানসিক প্রক্রিয়া বলতে এখানে স্মৃতি, প্রত্যক্ষণ, মনোযোগ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। প্রজ্ঞামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রক্রিয়াটি হল ইনপুট-প্রক্রিয়া-আউটপুট (Input-process-Output)।

যখন ব্যক্তি কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের “সার্বিক অবস্থাকে” (Whole pattern) অনুধাবনের মাধ্যমে বিষয়কে আয়ত্ত করে বা আচরণের পরিবর্তন করে তখন প্রজ্ঞামূলক শিখন হয়। অর্থাৎ, এই ধরনের শিখনে ব্যক্তি নির্দিষ্ট বিষয়ের আংশিকভাবে প্রত্যক্ষণ না করে, বরং সমগ্র অংশের একটি সম্পূর্ণ ধারণা তৈরি করে। এই সম্পূর্ণ ধারণা তৈরি করতে ব্যক্তি নিজস্ব প্রত্যক্ষণ, চিন্তন, যুক্তি, স্মৃতি, কল্পনা, বুদ্ধি ইত্যাদিকে কাজে লাগায়।

২.৫ বিকাশের বিভিন্ন স্তর এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রভাব (Developmental Stages and its Impact on Education)

A. শৈশবকাল (Infancy)

জন্মের পর থেকে পাঁচ বা ছয় বছর পর্যন্ত এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষাস্তর অনুযায়ী এই স্তরকে প্রাক্-বিদ্যালয় স্তর বলা হয়। এই স্তরে শিশুর বিকাশের হার খুব বেশি থাকে। এই স্তরকে দুটি ভাগে ভাক করা হয়—

(1) প্রাথমিক শৈশবের স্তর (Early Infancy)

(2) প্রান্তীয় শৈশবের স্তর (Late Infancy)

শৈশবের বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্য (Development Characteristics of Infancy) :

শৈশবকাল (জন্মের পর থেকে ২ বছর) : এই স্তরের বয়স সীমা জন্ম থেকে 2 বছর। এই সময় শিশুর দৈহিক বিকাশ খুব দ্রুত হয়। মানসিক, ভাষাগত, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বিকাশও কিছুটা ঘটে। শৈশবের বিভিন্ন ধরনের বিকাশ হল—

(ক) দৈহিক বিকাশ (Physical Development) :

শিশুর জন্মের পর থেকে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে তার বিকাশ সম্পন্ন হয় যেমন—

(১) ওজনগত পরিবর্তন (Weight Change) :

জন্মের মুহূর্তে শিশুর ওজন সাধারণত তিন কেজি হয়। এই ওজন পাঁচ মাসের মধ্যে বেড়ে দ্বিগুণ অর্থাৎ ছয় কেজি হয়। এক বছরের মধ্যে তিন গুণ বা নয় কেজি এবং দুই বছরের মধ্যে চার গুণ বা বারো কেজি হয়।

(২) উচ্চতাগত পরিবর্তন (Height Change) :

শিশুর উচ্চতা বংশগতির উপর নির্ভর করে। তবে শিশুর জন্মের সময় উচ্চতা থাকে তার প্রথম বছরে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি হয় এবং দু'বছরে পঁচাত্তর শতাংশ বৃদ্ধি হয়।

(৩) মাংসপেশির বৃদ্ধি (Muscle growth) :

এই স্তরে শিশুর ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গো মাংসপেশির দ্রুত বৃদ্ধি হয়। এই স্তরে দুই ধরনের বৃদ্ধি দেখা যায়—

1. **Cephalocaudal Tendency :** এই ধররেন বৃদ্ধিতে মাংসপেশি বৃদ্ধি মাথা থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত হয়।
2. **Proximodistal Tendency :** এই ধরনের বৃদ্ধিতে দেহের মধ্যবর্তী স্থান থেকে মাংসপেশির বিকাশ শরীরের শেষ পর্যায়ে পর্যন্ত হতে পারে।

(৪) সম্পূর্ণ কার্যাবলী (Complete functions) :

এই স্তরে শিশুকে কেবল মাথা নাড়াতে, rooting এবং sucking করতে পারে।

(খ) মানসিক বিকাশ (Mental Development) :

শৈশবে শিশুর মধ্যে বিভিন্ন মানসিক বিকাশের স্তর দেখা যায়। পিঁয়াজে-এর মধ্যে বিকাশমূলক দিক হলো—

(১) প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action) :

জন্মের সময় শিশুর কিছু ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকে এবং কিছু তৈরি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। যেমন—আঁকড়ে ধরা (Graspring), চোষা (Sucking) ইত্যাদি। এই স্তরের শেষের দিকে তার স্কিমার বিকাশ ঘটে।

(২) পুনরাবৃত্তিমূলক ক্রিয়া (Repetitive action) :

শৈশবে শিশুদের কোন একটি আচরণ একই ভাবে বারে বারে করতে দেখা যায়। যাকে পুনরাবৃত্তিমূলক ক্রিয়া বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় তিন ধরনের হয়—

1. **প্রথম শ্রেণি (১ থেকে ৪ মাস) :** শিশু নিজের শরীরের কোন অংশ হিসেবেই পুনরাবৃত্তি করে। যেমন—আঙ্গুল চোষা।
2. **দ্বিতীয় শ্রেণি (৪ থেকে ৮ মাস) :** শিশু বাইরের কোনো বস্তু নিয়ে পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ করে। যেমন—ঝুনঝুনি বাজানো।
3. **তৃতীয় শ্রেণি (১২ থেকে ১৮ মাস) :** শিশু চেষ্টা করে নতুন কোন কাজ করতে এবং তার ফলাফল অন্য কাজও একি হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা। যেমন—শিশুর হাত থেকে বাটি পড়ে গেলে তাতে শব্দ হলে শিশু অন্য বস্তুকেও ফেলার চেষ্টা করে শব্দ হচ্ছে কিনা দেখার জন্য।

(৩) বস্তুর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ধারণা (The idea of the stability of an object) :

শিশু জন্মের পর কোন কিছুর স্থায়ী অস্তিত্ব আছে তা বুঝতে পারে না।

(৪) কল্পনার ছলে খেলা (Playing with the trick of imagination) :

এই স্তরে শিশুরা সারাদিনের কার্যকলাপে কল্পনা করে খেলার ছলে সেটাকে অভিনয় করে।

(গ) সামাজিক বিকাশ (Social Development) :

শৈশবে শিশুর মধ্যে সামাজিক বিকাশ খুব একটা দেখা যায় না। তবে মা বাবা পরিবারের সাহচর্য তাদের মধ্যে কিছুটা সামাজিক বিকাশ দেখা যায়। যেমন, এরিকসনের মত অনুযায়ী—

১. শৈশবে শিশুর মধ্যে এক ধরনের বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। উপযুক্ত পরিচর্যা ও ভালোবাসা পেলে তার মধ্যে বিশ্বাস ও নিরাপত্তা বোধ তৈরি হয় যা তাকে পরিবারের বাইরের পরিবেশ ও সামঞ্জস্য বিধানে সাহায্য করে। শিশুর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা হয় যার ফলে সামাজিক অসঙ্গতি দেখা যায়।

২. এক থেকে দুই বছরের শিশুদের মধ্যে লজ্জা ও স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। নিজের মতো করে পরিবেশ পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারলে সে স্বাধীনচেতা ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে। তা না হলে তার মধ্যে সন্দেহ বা লজ্জার অনুভূতি তৈরি হয় এবং শিশু স্বাধীন ভাবে বেড়ে উঠতে পারে না।

এছাড়াও এই স্তরে শিশুরা খুব আত্মকেন্দ্রিক হয় বলে সমবয়সীদের সঙ্গে বেশিক্ষণ মানিয়ে চলতে পারে না। প্রাথমিকভাবে শিশু পরিবারের সমস্যদের প্রতি সামাজিক প্রতিক্রিয়া করে।

(ঘ) ভাষাগত বিকাশ (Language Development) :

শৈশবে শিশুর ভাষার বিকাশ বিভিন্ন স্তরে হয়ে থাকে। যেমন—

- **প্রথমত :** শিশুর জন্মের পর দুই মাসের কাছাকাছি সময় এক ধরনের স্বর বর্ণের মত শব্দ করতে শেখে। একে Cooing বলে।
- **দ্বিতীয়ত :** চার মাস বয়সের কাছাকাছি সময় শিশু স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মিশ্রণে এক ধরনের শব্দ উচ্চারণ করতে শেখে। যেমন—ম্যা-ম্যা। একে Babling বলে।
- **তৃতীয়ত :** দশ থেকে বারো মাস বয়সী শিশু প্রথম শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। শিশু একটি শব্দ তার সাথে ইশারা দিয়ে মনের ভার বোঝাতে পারে যাকে Holophrase বলে।
- **চতুর্থত :** বারো থেকে আঠারো মাস বয়সী শিশুর স্পষ্টভাবে কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। এই বয়সে শিশুর শব্দভাণ্ডার পঞ্চাশের বেশি হয়।
- **পঞ্চমত :** আঠারো থেকে চব্বিশ মাস বয়সী শিশুর শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পেয়ে দুই শত এর কাছাকাছি পৌঁছায় এবং শিশুটির দুটো শব্দ ব্যবহার করতে সক্ষম হয় একে Telegraphic Speech বলে।

(ঙ) প্রাক্ষোভিক বিকাশ (Emotional Development) :

প্রথম অবস্থায় জন্মের দুই বছর পর্যন্ত শিশুর প্রক্ষোভ সাধারণত শিশুর প্রাথমিক চাহিদা এবং প্রবৃত্তির দ্বারা নির্ধারিত হয়। সহজ কথায়, যে সমস্ত বস্তু-সামগ্রী বা উদ্দীপক শিশুর চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেগুলো শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। শৈশবের প্রক্ষোভিক বিকাশ প্রসঙ্গে Watson বলেছেন—

(১) মানুষ জন্মের সময় কেবল তিন ধরনের প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যথা—রাগ, ভয়, ভালোবাসা।

(২) এই স্তরের শেষ পর্যায়ে আরো কিছু প্রক্ষোভ যেমন—হিংসা, ঘৃণা, আনন্দ, খুশি ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে।

শৈশবের চাহিদা (Infancy Needs) :

শৈশবে শিশুর বিকাশের হার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হয়। সাধারণত জন্ম থেকে পাঁচ বা ছয় বছর বয়স পর্যন্ত সময়কালকে শিশুর শৈশব কাল বলে ধরা হয়। জন্ম মুহূর্তে শিশু থাকে সম্পূর্ণ অসহায়।

এই স্তরে শিশু পরিপূর্ণ মানুষের প্রায় সকল রকম বৈশিষ্ট্যই অর্জন করে। তাই এই শৈশব স্তর মানুষের জীবন বিকাশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তর। এই স্তরে শিশুর জীবন বিকাশের কতগুলি চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। যার নিম্নরূপ—

(ক) দৈহিক চাহিদা (Physical Needs) :

শৈশব স্তরে শিশুর দেহের কর্মেন্দ্রিয় পেশি গুলিতে বিকাশের ফলে সঞ্চালনমূলক গতি আসে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে শিশু পৃথকিকরণ ও বিভিন্ন কাজের সাদৃশ্য বজায় রাখতে পারে। দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত চাহিদাগুলি হল দৈহিক চাহিদা। এই চাহিদাগুলি সর্বজনীন ও সহজাত। শিক্ষার উপর এগুলি নির্ভর করে না। শিশুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দৈহিক চাহিদা হল—

(১) খাদ্যের চাহিদা (Needs of food) :

দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির দরুন শিশুর মধ্যে খাদ্যের চাহিদা দেখা দেয়। বয়স যত বাড়তে থাকে শিশুর মধ্যে খাদ্যের চাহিদাও তত বেশি পরিমাণে দেখা দেয়। এমতাবস্থায় শিশু হাতের সামনে যা পায় তাই সে ভক্ষণ করার চেষ্টা করে।

(২) সক্রিয়তার চাহিদা (Needs of activism) :

কর্মেন্দ্রিয় ও পেশিতন্ত্রের বিকাশের ফলে শিশুর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং সে তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে সুসামঞ্জস্যভাবে সঞ্চালিত ও ব্যবহার করতে চায়। এর ফলে তার মধ্যে যে ধরনের চাহিদার উদ্ভব হয় তাকে বলে সক্রিয়তার চাহিদা। এই চাহিদার জন্য শিশুর সব সময় কিছু না কিছু কাজ করতে চায় কিংবা খেলা করতে চায়।

(৩) পুনরাবৃত্তির চাহিদা (Need for repetition) :

দৈহিক সক্রিয়তার জন্য শিশুর মধ্যে আরও এক ধরনের চাহিদা লক্ষ করা যায়। এটি হল পুনরাবৃত্তির চাহিদা। এই চাহিদার দরুন শিশু একই রকমের কাজ বারবার সম্পন্ন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোনও জিনিস ছুঁড়ে দেওয়ার পর সেটি শিশুর হাতে ধরিয়ে দিলে তা আবার সে ছুঁড়ে দেয়। একই ধরনের কাজ বারবার সম্পাদন করার মাধ্যমে সে তার চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটায়।

(৪) ঘুমের চাহিদা (Need for sleep) :

ঘুম মানুষ থেকে শুরু করে সকল প্রাণীর একটি স্বতঃস্ফূর্ত জৈবিক চাহিদা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিশুর মধ্যে এই চাহিদা বর্তমান থাকে।

(খ) মানসিক চাহিদা (Mental Needs) :

শিশুর মানসিক প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত চাহিদাগুলিকে বলা হয় মানসিক চাহিদা। মানসিক চাহিদা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যে সমস্ত মানসিক প্রবণতা আছে সেগুলি যথাযথভাবে পরিতৃপ্ত হতে না পারলে মানসিক চাহিদার সৃষ্টি হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মধ্যে নানা ধরনের মানসিক চাহিদা দেখা দেয়। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মানসিক চাহিদাগুলি হল—

1. আয়ত্তে আনার চাহিদা (Demand for control) :

জন্মানোর পর শিশু শায়িত অবস্থায় থাকে। সে হাত-পা পরিচালনা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। শিশু আত্মকেন্দ্রিক তাই সে যখন কোন জিনিসকে ধরে শক্ত মুঠিতে আবদ্ধ করে মুঠি যত দৃঢ় হয় ততই তার আয়ত্তে আনার ক্ষমতা প্রবল হতে থাকে।

2. অভিজ্ঞতা চাহিদা (Expereince demands) :

শিশুর কৌতূহল প্রবণতা তার বিভিন্ন ধরনের চাহিদা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। তাকে নতুন নতুন বস্তু-সামগ্রীর প্রতি আকৃষ্ট করায় এবং অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে। চাহিদার ফলে শিশু অনেক দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায়। অভিজ্ঞতা অর্জনের তাগিদেই সে আগুনে হাত দেয় না।

3. নিরাপত্তার চাহিদা (Needs for security) :

শিশু সব সময় বয়স্কদের কাছ থেকে নিরাপত্তা আশা করে। নিরাপত্তার অভাব দেখা দিলে কিংবা ব্যাঘাত ঘটলে শিশুর মধ্যে যে চাহিদার সৃষ্টি হয় তাকে বলে নিরাপত্তার চাহিদা। শিশুর মধ্যে নিরাপত্তার চাহিদা বিভিন্ন দিক (যেমন—দৈহিক, মানসিক এবং প্রক্ষোভিক) থেকে সৃষ্টি হতে পারে।

4. ভালোবাসার চাহিদা (Need for Love) :

ভালোবাসার অভাব ঘটলে শিশুর মধ্যে এই ধরনের চাহিদা উদ্ভব ঘটে। এই চাহিদাটি শিশুর কাছে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং প্রবল। একদিকে শিশু যেমন অপরের কাছ থেকে ভালোবাসা আশা করে, অন্যদিকে তেমনি সে অপরকে ভালোবাসতে চায়।

5. আত্মপ্রকাশের চাহিদা (Need for self-expression) :

শিশু সব সময় নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে সে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। এই চাহিদা থেকে শিশুর মধ্যে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা জন্মায়। বিশেষভাবে এই চাহিদার জন্য শিশু ছবি আঁকে এবং মাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে ভালোবাসে।

6. অনুকরণের চাহিদা (Need for imitation) :

শিশু খুব সহজেই অপরের আচরণ অনুকরণ করতে পারে। অনুকরণের মাধ্যমেই তারা বয়স্কদের আচরণ আয়ত্ত করে। এই সময়ে তাদের অনুকরণ করার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল থাকে। এই ধরনের প্রবৃত্তির তাড়নায় শিশুর মধ্যে অনুকরণের চাহিদা দেখা দেয়।

7. কৌতূহলের চাহিদা (Need for Curisoity) :

কৌতূহলের চাহিদা শিশুর মধ্যে থাকার জন্যই শিশু বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। কৌতূহলের প্রবণতা থেকে তার মধ্যে উদ্ভূত হয় কৌতূহলের চাহিদা। এই ধরনের চাহিদা শিশুকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আগ্রহী করে তোলে। এর ফলে তার জ্ঞানভাণ্ডারটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(গ) সামাজিক চাহিদা (Social Needs) :

পারিবারিক পরিবেশে বসবাস করার ফলে শিশুর মধ্যে কিছুটা সামাজিক বোধ গড়ে ওঠে। এই ধরনের অনুভূতি থেকে তাদের মধ্যে সামাজিক চাহিদা উদ্ভূত হয়। তবে এই সময়ে সামাজিক চাহিদাগুলি কোনও সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী চাহিদা নয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সামাজিক চাহিদাগুলি পরিবর্তিত হতে থাকে।

1. সহযোগিতার চাহিদা (Need for Cooperation) :

এই চাহিদার জন্য শিশুরা সমবয়সীদের সঙ্গে একত্রে চলাফেরা করে। তবে এই ধরনের চাহিদা খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। কিছুক্ষণ পরেই তাদের মধ্যে বিরোধিতার মনোভাব লক্ষ করা যায়।

2. সমবেদনার চাহিদা (Need for compassion) :

শৈশবে সংবেদনশীলতার চাহিদা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়। শিশু তার শিক্ষিত সমাজ পরিবেশের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করে। অপরদিকে অন্যের কাছ থেকেও সমবেদনা প্রত্যাশা করে।

3. প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাহিদা (Demand for competition) :

শিশুর আয়ত্তে আনার চাহিদা সামাজিক পরিবেশে সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করে। শিশুরা নিজের জিনিস আয়ত্তে রাখার জন্য অথবা অন্যের জিনিসকে আয়ত্তে আনার জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক আচরণ করতে চায়। যা ভবিষ্যতে শিশুর মধ্যে Competative mind তৈরি করে দেয়।

4. সাহচর্যের চাহিদা (The need for companionship) :

শিশুর আরও এক ধররেন চাহিদা হল সাহচর্যের চাহিদা। এই চাহিদাটির তাড়নায় শিশু অপরের সঙ্গ কামনা করে। বিশেষভাবে সমবয়স্ক শিশুদের সাথে তারা খেলতে বা মিশতে বেশি পছন্দ করে। এর জন্য শিশু সমবয়স্ক অন্য শিশুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় এবং খেলা করতেও চায়।

5. সামাজিক অনুমোদনের চাহিদা (Demand for social approval) :

শিশু তার বিভিন্ন কাজের জন্য বয়স্কদের সমর্থন আশা করে। অর্থাৎ শিশু মনে করে যে, তার কাজটি আর পাঁচজন মেনে নিক। শিশুর এই ধরনের চাহিদাকে বলে সামাজিক অনুমোদনের চাহিদা। এই চাহিদার জন্য শিশুর প্রত্যাশা করে যে তার কাজকে বয়স্করা প্রশংসা করুক।

6. আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা (Need for self-establishment) :

দুই বা তিন বছর বয়সে শিশুর মধ্যে অহংবোধের সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে শিশু নিজেকে অপরের কাছে জাহির করতে চায়। এই সময় নিজের কাজের জন্য শিশু প্রতিষ্ঠা পেতে বা বয়স্কদের স্বীকৃতি পেতে চায়। শিশুর এই ধরনের চাহিদার নাম আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা।

(গ) প্রাক্ষোভিক চাহিদা (Emotional Needs) :

শৈশবে শিশুর জন্মগত প্রাক্ষোভিক বিষয়বস্তুগুলি স্বাধীনভাবে সম্পাদন করতে চায়। বাধা দিলে সে নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হয়। শিশু এক্ষেত্রে বয়স্কদের সমর্থন পেতে চায় এই সমর্থন পাওয়ার মধ্য দিয়ে তার প্রাক্ষোভিক চাহিদা তথা স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালাবাসা তৃপ্ত হয়।

উপসংহার (Conclusion) :

যে সমস্ত চাহিদাগুলি পূর্বে আলোচনা করা হল তার মধ্যেই শিশুর সব চাহিদা সীমাবদ্ধ নয়। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে আরো নানা ধরনের চাহিদার সৃষ্টি হয়। আবার সামাজিক পরিবেশের চাপে চাহিদাগুলি পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করে। তবে এ কথা স্পষ্ট যে, চাহিদাগুলিই আচরণের উৎস। চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত হলে আচরণের মধ্যে কোনও অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয় না। সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন শিশুর চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত হতে পারে না। চাহিদাগুলি অতৃপ্ত থেকে গেলে শিশু নানা ধরনের অবাঞ্ছিত শুরু করে। চাহিদার অতৃপ্তির জন্য যে অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি হয় তার তাড়নায় শিশু এই ধরনের সমস্যামূলক আচরণ সম্পন্ন

করে থাকে। অভিভাবক বা শিক্ষক শিক্ষিকা এই সমস্ত শিশুদের সমস্যামূলক শিশু (Problem Child) হিসাবে অভিহিত করেন। এই অবস্থায় তারা এর যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেন না। এই সমস্ত শিশুরা ধীরে ধীরে সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ সম্পাদন করে। তখন তাদের বলা হয় অপসঙ্গতিপূর্ণ শিশু (Maladjusted Child)। কিন্তু সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিসত্তা গঠনের জন্য শিশুর চাহিদাগুলি একান্তভাবে পরিতৃপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবেই তার মানসিক স্বস্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। সেজন্য অভিভাবক বা শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে লক্ষ রাখতে হবে যেন শিশুর চাহিদাগুলি বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

শৈশবের বিকাশ গত চাহিদা পূরণে পিতা-মাতা, বিদ্যালয়, পরিবারের ভূমিকা (The role of parents, school and family and the developmental needs of Infancy) :

জীবের জীবন বিকাশের প্রথম পর্যায় হলো শৈশব, এই স্তরে জীবন বিকাশটি পরিপূর্ণ হয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে। বর্তমান মনোবিজ্ঞানের উন্নয়ন এবং শিশুর শৈশব কালকে বাস্তব রূপায়নের জন্য গুরুত্ব প্রদান করেছেন এক্ষেত্রে পিতা-মাতা, বিদ্যালয় ও পরিবারের ভূমিকা হল নিম্নরূপ—

প্রথমত : দৈহিক বিকাশের ফলে শিশুর মধ্যে কিছু অভ্যাস গঠিত হয়। পিতা-মাতাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিশুর সু অভ্যাস গঠিত হয় এবং কু অভ্যাস গুলি দূর হয়। পরিবার তথা পিতা-মাতা এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে শিশুর সু অভ্যাস গঠনে সহায়তা করে।

দ্বিতীয়ত : শিশুর কল্পনায় বিকাশ যাতে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয় তার জন্য ছড়া, কবিতা, গল্প, খেলা নির্বাচনের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয়ত : শৈশবে শিশুর ছন্দ ও গানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। এটিকে প্রাথমিক সৌন্দর্যবোধের বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। খেয়াল রাখতে হবে শিশুর মধ্যে যে সৃষ্টি সুলভ মননটি বর্তমান তাকে উৎসাহিত করে সার্থক বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া।

চতুর্থত : পিতা-মাতার শিশুর প্রাক্ষেভিক বিকাশ যথেষ্ট গুরুত্ব দেবেন। কারণ গৃহপরিবেশে শিশু যে সমস্ত আচরণ আয়ত্ত করবে সে পরবর্তী সমাজ পরিবেশে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

পঞ্চমত : শিশু সামাজিকভাবে দল গঠন করতে গিয়ে অনেক সময় খারাপ সঙ্গের সাথী এদের সংস্পর্শে এসে কু অভ্যাস আয়ত্ত করে। পিতা-মাতাকে লক্ষ্য রাখতে হবে কু অভ্যাস গুলো শিশুর জীবনে হানি না ঘটায় সেটিকে নজর দেওয়া। বিদ্যালয় শিশুর মধ্যে সুঅভ্যাস ও সামাজীকিকরণে সাহায্য করে।

ভারতবর্ষের ন্যায় সকল দেশের শিশুর প্রতি পিতা-মাতার ভূমিকা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। যত্নের সাথে প্রতিপালন, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন পিতা-মাতার কর্তব্য বিশেষ। এটা অন্য দেশে বিরল। বর্তমানে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় শুধুমাত্র প্রক্ষোভ জনিত কারণে শিশুর দায়িত্ব পালন এবং শিশু যাতে ভবিষ্যতে

সুসভ্য নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সমাজে সে দিকেও পিতা-মাতাকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। পরিবারের পরেই বিদ্যালয় শিশুর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

বাল্যকালের বিকাশগত বৈশিষ্ট্য (Development Characteristics of Chilhood) :

এই স্তরের সম্পূর্ণ বয়সসীমা দুই থেকে এগারো বছর পর্যন্ত। দুই থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত আদি বাল্যকাল এবং পাঁচ থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত সময়কালকে উত্তর বাল্যকাল বলে। এই স্তরের কিছু বিকাশগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যথা—

(ক) দৈহিক বিকাশ (Physical Development) :

(১) ওজনগত পরিবর্তন (Weight changes) :

আদি বাল্যকাল (Early Chilhood) : দুই থেকে তিন বছর বয়সী একটি স্বাভাবিক শিশুর ওজন তেত্রিশ পাউন্ড হয় এবং পাঁচ বছরে তা বেড়ে তেতাল্লিশ পাউন্ড হয়।

উত্তর বাল্যকাল (Early Childhood) : এই স্তরে শিশুর বৃদ্ধি খুব ধীরে সম্পন্ন হয় এবং বৃদ্ধি কিছুটা স্থিমিত হয়ে পড়ে।

(২) উচ্চতার পরিবর্তন (Height Change) :

আদি বাল্যকাল (Early Childhool) : আদি বাল্যকালে শিশুর উচ্চতা স্বাভাবিকভাবে আটত্রিশ ইঞ্চি থেকে প্রায় তেতাল্লিশ ইঞ্চি বেড়ে যায়।

উত্তর বাল্যকাল (Late Childhood) : উত্তর বাল্যকালে শিশুর উচ্চতা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত ধীর গতিতে সম্পন্ন হয়।

(৩) অঙ্গা সঞ্চালন মূলক দক্ষতা (Psychomotor Skill) :

এই স্তরে শিশু যে সমস্ত অঙ্গা সঞ্চালন মূলক কাজ করতে সক্ষম হয় সেগুলি হল—

বয়স	অঙ্গা সঞ্চালন মূলক দক্ষতা
২-৩ বছর	● এই বয়সে শিশু ছন্দে হাঁটতে দ্রুত হাঁটতে দ্রুত এবং দৌড়াতে পারে।
	● শিশু শরীরের উপরের অংশ অনমনীয় রেখে লাফাতে, কোন বস্তু ছুড়তে পারে।
	● শিশু পায়ের সঞ্চালন করে খেলনা গাড়ি চালাতে পারে।

বয়স	অঙ্গ সঞ্চালন মূলক দক্ষতা
৩-৪ বছর	● এই বয়সে শিশু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বা নামতে পারে।
	● লাফাতে দৌড়াতে ও শরীরের উপরের অংশের নাড়াচাড়া করতে পারে।
৪-৫ বছর	● দ্রুত দৌড়াতে পারে।
	● সাইকেল চালাতে পারে।
	● জোরে হাঁটতে পারে।
৫-৬ বছর	● এই বয়সে দৌড়ের গতি আরো বৃদ্ধি পায়।
	● সমস্ত শরীরকে উপরে ছুড়তে পারে।
	● বাই সাইকেল চালাতে পারে।
৭-১১/১২ বছর	● এই সময়ে দৌড়ের গতি আরো বৃদ্ধি পায়।
	● ফুটবল, ক্রিকেট এই সমস্ত খেলা খেলতে পারে।
	● নিজের ইচ্ছানুযায়ী শরীরকে সঞ্চালন করতে পারে।

(৪) অন্যান্য শারীরিক পরিবর্তন (Other Physical Changes) :

দুই (২) থেকে এগারো (১১) বছর পর্যন্ত বয়সে শিশুর দীর্ঘ পেশী গুলি দ্রুত ও সুষম ভাবে বৃদ্ধি পায়। কিছু জৈবিক পরিবর্তন যেমন—শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎযন্ত্রের গতি হ্রাস পেতে থাকে।

(খ) ভাষাগত বিকাশ (Language Development) :

(১) দুই থেকে তিন বছর বয়সে শিশুদের শব্দভাণ্ডার বাড়তে থাকে এবং ভাষাগত বিকাশ দ্রুত হয়।

(২) পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুর শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পেয়ে দশ হাজারের কাছাকাছি হয়। এই সময় শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিদিন প্রায় বাইশটি শব্দ শিখতে পারে।

(৩) ছয় থেকে আট বছর বয়সের শিশুর সামাজিক বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথোপকথনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(৪) নয় থেকে এগারো বছর বয়সের শিশুর সংজ্ঞা নিরূপণ, সমার্থক শব্দ, বিপরীত শব্দ ইত্যাদির দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(গ) মানসিক বিকাশ (Mental Development) :

পিঁয়াজে-এর মানসিক বিকাশ তত্ত্বে আদি বাল্যকাল এবং প্রান্তীয় বাল্যকাল অনুযায়ী শিশুর মানসিক বিকাশ গত বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

আদি বাল্যকাল (Early Chilhood) :

- **সাংকেতিক চিন্তন (Symbolic Thinking) :** এই স্তরে শিশু সংকেতের ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। সংকেতের মাধ্যমে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করে।
- **আত্মকেন্দ্রিক চিন্তন (Ego-centric Thinking) :** এই বয়সে শিশুর মধ্যে 'আমি' মনোভাব অধিক পরিমাণে কাজ করে এবং সবকিছুর কেন্দ্রস্থলে সে নিজেকে প্রাধান্য দেয়।
- **সর্বপ্রাণবাদ (Animistic Thinking) :** আদি বাল্যকালের শিশু জীব ও জড় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। সে ভাবে সবকিছুর প্রাণ আছে।

প্রান্তীয় বাল্যকাল (Late Childhood) :

- **শ্রেণিকরণ ক্ষমতা (Classification Ability) :** প্রান্তীয় বাল্যকালে শিশুর সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বস্তু বা বিষয়কে পৃথক করতে পারে।
- **ক্রমপর্যায় ক্ষমতা (Periodic Ability) :** শিশু এই স্তরে ওজন বা উচ্চতার ভিত্তিতে ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট, ভারী থেকে হালকা, হালকা থেকে ভারী এই পর্যায়ে সাজাতে পারে।
- **আরোহী চিন্তিন (Inductive Thinking) :** শিশু একই ধরনের অনেক বিষয়বস্তু দেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে বা সামান্যীকরণ করতে পারে।
- **মূর্ত চিন্তন (Concrete Thinking) :** শিশুরা এই পর্যায়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের উপর ভাব শক্তি করতে পারে।

(ঘ) সামাজিক বিকাশ (Social Development) :

এরিকসনের মত অনুযায়ী বাল্যকালের শিশুর সামাজিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য হলো—

(১) তিন থেকে পাঁচ বা ছয় বছর বয়সের শিশুর মধ্যে উৎসাহ-অপরাধ বোধের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। শিশুরা কাজে সাফল্য পেলে উৎসাহ বেড়ে যায় এবং শেষ করতে না পারলে তারা অপরাধবোধে ভোগে।

(২) ছয় থেকে এগারো বছর বয়সে শিশুর মধ্যে উদ্যম ও হীনমন্যতা তৈরি হয়। তারা প্রথাগত

শিক্ষার আওতায় এসে নিজের কাজ করতে উদ্যোগী হয় ফলে তাদের কর্ম ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। নতুবা তাদের মধ্যে হীনমন্যতা দেখা দেয়।

(ঙ) প্রাক্ষোভিক বিকাশ (Emotional Development) :

আদি বাল্যকাল (Early Childhood) : এই বয়সে শিশুর মধ্যে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের মতো প্রায় সব ধরনের প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয় কিন্তু সেটি নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা তৈরি হয় না।

প্রান্তীয় বাল্যকাল (Late Childhood) : এই বয়সে শিশু অন্যদের প্রক্ষোভ বুঝতে সমর্থ হয় এবং শিশু প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

বাল্যকালের বিকাশের মৌলিক চাহিদা (Fundamental Needs of Childhood) :

A. প্রারম্ভিক বাল্যকাল (Early Childhood) :

সাধারণত দুই থেকে ছয় বছরের বয়স কালকে প্রারম্ভিক বাল্যকাল বলা হয়। এই স্তরে শিশুর মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু চাহিদা অনুভূত হয় সেগুলি হল—

(ক) দৈহিক চাহিদা (Physical Need) :

দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত চাহিদাগুলি হল দৈহিক চাহিদা। এই চাহিদাগুলো সর্বজনীন ও সহজাত, যা শিশুর ওপর নির্ভর করে না। এই দৈহিক চাহিদাগুলি হল—

(১) খাদ্যের চাহিদা (Need for food) :

দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধির দরুণ শিশুর মধ্যে খাদ্যের চহিদা দেখা যায়। বয়স যত বাড়তে থাকে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এমন অবস্থায় শিশু হাতের সামনে যা পায় তাই ভক্ষণ করার চেষ্টা করে।

(২) সক্রিয়তার চাহিদা (Demand for activism) :

সক্রিয়তা চাহিদার তাড়নায় শিশু সামাজিক উদ্দেশ্য মূলক কাজ সম্পাদন করতে চায়। তারা বাবা-মায়ের কাজের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। এই সময় শিশুদের দায়িত্ববোধ উদ্‌বুদ্ধ হয়।

(৩) চলনের চাহিদা (Need for movement) :

প্রারম্ভিক বাল্যস্তরে শিশুর মধ্যে চলন এর চাহিদার তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়। এরা কোথাও স্থির ভাবে বসে থাকতে পারে না। দৌড়ানো, লাফানো, কোন কিছু টেনে ফেলে দেওয়া ইত্যাদি নানা ধরনের সঞ্চালনমূলক কাজে শিশু নিজেকে যুক্ত রাখতে চায়।

(৪) পুনরাবৃত্তির চাহিদা (Need for repetition) :

এই প্রকার চাহিদার দরুণ শিশু একই রকমের কাজ বারবার সম্পন্ন করে। যেমন—কোন জিনিস শিশুকে দিলে তা ছুঁড়ে দেয়, তা আবার দিলে আবার পুনরায় ছুড়ে দেয়। এর মাধ্যমে শিশু চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটায়।

(খ) মানষিক চাহিদা (Mental Need) :

শিশুর বিভিন্ন ধরনের উন্নত মানসিক প্রক্রিয়া গুলি এই স্তরে এসে বিকশিত হয়। যেমন—যুক্তি শক্তি, চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি। তবে এই আচরণগুলোর উদ্দেশ্য মুখি এবং বাস্তব চাহিদার সঙ্গো সম্পর্কিত। চাহিদাগুলি হল—

(১) নিরাপত্তার চাহিদা (Need for Security) :

এই সময় শিশুর সকলের কাছে থেকে নিরাপত্তা প্রত্যাশা করে। এই পর্যায়ে নিরাপত্তা বলতে প্রক্ষোভ গত দিকের নিরাপত্তা কে বোঝানো হয়।

(২) অনুসন্ধানের চাহিদা (Need for Inquiry) :

এই স্তরে শিশুর মধ্যে অনুসন্ধানের চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। এই চাহিদার জন্য বাল্যকালের শিশুরা যে কোন বস্তুকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই।

(৩) আয়ত্তে আনার চাহিদা (Need to control) :

জীবন বিকাশের এই স্তরে আয়ত্তে আনার চাহিদার একটু পরিবর্তন ঘটে। শিশুরা অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের সাথে নিজেদের জিনিসগুলো নিয়ে খেলতে ভালোবাসে তবে তা খুব বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

(গ) সামাজিক চাহিদা (Social Need) :

শিশুর সামাজিক বিকাশের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে তার সামাজিক চাহিদাগুলি পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় এবং চাহিদাগুলো জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে। চাহিদা গুলি হল—

(১) সহযোগিতার চাহিদা (Need for Cooperation) :

এই বয়সের শিশুদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক কেটে যায় বলে তারা পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন ধরনের কাজ সমাধানে অগ্রসর হয়।

(২) সমবেদনার চাহিদা (Need for compassion) :

এই স্তরে শিশুর মধ্যে সমবেদনার চাহিদাটি শক্তিশালী রূপ ধারণ করে। যেমন—শিশু স্কুলের টিফিন নিয়ে এলে বন্ধুদের সাথে ভাগ করে খায়।

(৩) প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাহিদা (Need for competition) :

প্রারম্ভিক বাল্যকাল প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাহিদা শৈশবের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পায়। তবে একেবারে থাকে না তা নয়। নিজের সফলতা আনার প্রয়োজনে শিশুরা পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করে।

(৪) সমর্থনের চাহিদা (Need for support) :

এই সময় শিশুরা কোন কাজের জন্য বয়স্ক বা তার সমবয়সীদের সমর্থন বেশি প্রত্যাশা করে। বড়দের সমর্থন পেলে তারা কাজ করতে উৎসাহী হয়।

(ঘ) নৈতিক চাহিদা (Ethical Need) :

বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ শিশুদের মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত হয়। তারা এইসব নৈতিক শিক্ষামূলক গল্প-কাহিনী পড়তে ও শুনতে ভালোবাসে। কাহিনীতে বর্ণিত ঘটনাগুলি বিশ্বাস করে এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে পারে।

মনোবিজ্ঞানীদের মত অনুসারে প্রারম্ভিক বাল্যকালে শিশুদের প্রত্যেক আচরণের পেছনে তাদের বিচার বিবেচনা কাজ করে যে চাহিদাগুলি জীবন বিকাশের সহায়ক। সুতরাং, এই বয়সে শিশুদের আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা দিয়ে তাদের সঠিকভাবে গড়ে তোলা যাবে এবং জীবনকে সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যাবে।

প্রান্তীয় বাল্যকাল (Late Childhood) :

সাধারণত ছয় (৬) থেকে এগারো (১১) বছর বয়স কালকে প্রান্তীয় বাল্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই স্তরে শিশুর বিকাশের হার অব্যাহত থাকে। অনেক মনোবিদ এই স্তরকে ‘নকল পরিপক্বতার স্তর’ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এই স্তরের চাহিদাগুলি হল—

(ক) দৈহিক চাহিদা (Physical Need) :

(১) খাদ্যের চাহিদা (Need for food) :

এই বয়সে শিশু পূর্ববর্তী খাদ্যের চাহিদার মতো বিক্ষিপ্ত আচরণ না করে বরং নিয়ন্ত্রিত আচরণ করে। ফলে খাদ্য পাওয়ার জন্য সে অনেক মার্জিত থাকে।

(২) চলনের চাহিদা (Need for movement) :

প্রান্তীয় বাল্য স্তরে শিশুর দৈহিক পরিণমন বেশি হওয়ার জন্য ব্যাপক ও বিস্তারিত পরিবেশে শিশু ঘোরাফেরা পছন্দ করে।

(৩) সক্রিয়তার চাহিদা (Need for activism) :

এই স্তরে সক্রিয়তা দলগত কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। শিশু এককভাবে কাজ করতে উৎসাহ না দেখালেও কোন কাজের দায়িত্ব পেলে সক্রিয় হয়ে ওঠে অর্থাৎ সক্রিয়তার চাহিদা দলগত চাহিদা নিবৃত হয়।

(৪) পুনরাবৃত্তির চাহিদা (Demand for Repetition) :

এই স্তরের পুনরাবৃত্তির চাহিদা অনেকটাই হ্রাস পায়। কোন কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি উদ্দেশ্যে শিশুরা পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করে। যেমন—কোন বিষয়ে পাঠ মুখস্থ করার মধ্য দিয়ে পুনরাবৃত্তির প্রচেস্টা।

(খ) মানসিক চাহিদা (Mental Need) :

(১) আয়ত্তে আনার চেস্টা (Need to control) :

প্রান্তীয় বাল্যে শিশুদের নিজস্ব আত্মনির্ভরশীলতার দরুণ সে অপরকে নিজের বশে রূপান্তরিত করতে চাই। যদিও এই চাহিদাটি পরবর্তীকালে আত্মনির্ভরতার চাহিদা থেকে সফলতার চাহিদায় পরিণত হয়।

(২) অভিজ্ঞতা চাহিদা (Need for Experience) :

এই বয়সে ছেলেমেয়েরা স্বাধীনভাবে জীবন যাবন করতে ভালোবাসে। কাজের দায়িত্ব পেলে খুশি হয় এবং পরিণতির সঙ্গো সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের পরিচালনা করে।

(৩) নিরাপত্তার চাহিদা (Need for Security) :

শিশুরা এই সময়ে সহপাঠীরা বয়স্কদের কাছ থেকে প্রাক্ষোভিক নিরাপত্তা প্রত্যাশা করে। নিরাপত্তার চাহিদা তাদের অন্যান্য চাহিদাগুলি পূরণে সহায়তা করে।

(৪) অনুসন্ধানের চাহিদা (Need for Inquiry) :

অনুসন্ধানের প্রাথমিক চাহিদা প্রান্তীয় বাল্যে পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে। অজানা কোন বিষয় বা ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য শিশুদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় এবং অনুসন্ধানের চাহিদার মধ্য দিয়ে দুঃসাহসিক কাজে অংশ গ্রহণে সক্ষম হয়।

(গ) সামাজিক চাহিদা (Social Need) :

সামজিক চাহিদাগুলি প্রান্তীয় বাল্যে এসে আরো দৃঢ়তা লাভ করে।

(১) সমবেদনার চাহিদা (Need for Compassion) :

এই স্তরে কোন বন্ধু অসুবিধায় পড়লে শিশু তৎক্ষণাৎ সমবেদনা প্রকাশ করে এবং অসুবিধা দূর করার জন্য এগিয়ে আসে।

(২) দলভুক্তির চাহিদা (Demand for team Membership) :

প্রান্তীয় বাল্যে শিশুরা তার পরিবারের বাইরেও দলভুক্তি থাকতে ভালোবাসে। এই চাহিদা সমাজ জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

(৩) প্রতিদ্বন্দ্বীতার চাহিদা (Demand for Competition) :

শিশুরা এই সময় নিজেদের সফলতা আনার জন্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। যেমন—শ্রেণিকক্ষে প্রথম হওয়া।

(ঘ) জ্ঞানের চাহিদা (Need for Knowledge) :

এই চাহিদাটি পূর্ববর্তী স্তরের থেকে অনেক বেশি বিস্তৃত। চাহিদার তাড়নায় শিশু লেখাপড়া, গণনা করা ইত্যাদি কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে করে থাকে এবং কাজের মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণ করে।

(ঙ) পেশাগত চাহিদা (Professional need) :

এই স্তরে পিতা-মাতা ও অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ থেকেই তাদের পেশার প্রতি বিশেষ আগ্রহ বোধ দেখা যায়।

(চ) অনুকরণের চাহিদা (Imitation Need) :

প্রান্তীয় বাল্যে শিশুরা অপরকে সম্মান করে, ভালোবাসে এবং তাদেরকে অনুকরণ করে ব্যক্তিগত সম্ভাবনাগুলোকে প্রকাশ করতে চাই।

বাল্যকালের বিকাশগত চাহিদা পূরণে পিতা-মাতা এবং বিদ্যালয়ের ভূমিকা (The Role of Parents and Schools in the Developmental Needs of Childhood) :

জীবন বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায় হলো বাল্যকাল। এই সময়কালে শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন চাহিদা গত পরিবর্তন দেখা দেয় এবং এই চাহিদা পূরণের মধ্য দিয়েই শিশু ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়। এক্ষেত্রে পরিবার তথা বিদ্যালয় শিশুর চাহিদা পূরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(১) বাল্যকালের শিশুর দৈহিক বিকাশ ঘটে যেখানে পরিবার তথা বিদ্যালয় শিশুর মধ্যে বিভিন্ন সক্রিয় কার্যাবলীর দ্বারা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

(২) শিশুদের নৈতিক বিকাশ ঘটানোর জন্য বিদ্যালয় শিশুদের নীতি শিক্ষা দান করে।

(৩) বাল্যকালে শিশুরা পরিবার ছেড়ে এক বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করে। সেই বৃহত্তর জীবনের সঙ্গো সঠিকভাবে মানিয়ে চলার জন্য পরিবার তথা বিদ্যালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(৪) শিশুদের এই সময় ব্যক্তিত্বের গঠন কার্য শুরু হয়। বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্যাবলীর দ্বারা, শিক্ষকের সাথে সহপাঠীদের নানা কাজে অংশগ্রহণ ও শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে থাকে।

(৫) এই বয়সের শিশুদের আত্মবিকাশের স্বাধীনতার দরকার হয় তাই বিভিন্ন সৃজনাত্মক কার্যাবলীর স্বাধীনতার দ্বারা বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যেকার নানা প্রতিভাকে বিকশিত করতে সাহায্য করে।

(৬) এই সময়ে শিশুদের মধ্যে নানা মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। যার ফলস্বরূপ শিশু নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে যেখানে পরিবার ও বিদ্যালয় শিশুকে নিরাপত্তা প্রদান করে।

কৈশোর কালের বিকাশগত বৈশিষ্ট্য (Developmental Characteristics of Adolescence)

ভূমিকা (Introduction) :

শিক্ষাকাল অনুযায়ী তেরো (১৩) থেকে আঠেরো (১৮) বা উনিশ (১৯) বছর পর্যন্ত বয়সকাল হলো কৈশোর। শিক্ষার্থীর জীবন এই কালটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর। Baron বলেছেন, “Period beginning with the onest of poverty and ending when individuals assume adult roles and responsibility.

এই স্তরের বিকাশ গত বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(ক) দৈহিক বৈশিষ্ট্য (Physical Characteristics) :

কৈশোরের দৈহিক বিকাশ খুব দ্রুত হারে ঘটতে থাকে। এই বয়সে তাদের মধ্যে যৌন চেতনার বিকাশ ঘটে যা এই স্তরের শেষ পরিণতি লাভ করে। এই স্তরের দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) উচ্চতা ও ওজন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়।

(২) শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা এই বয়সে শক্তি প্রদর্শন করতে চাই।

(৩) কোন কাজে ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা বাড়ে।

(৪) স্বরতন্ত্রের প্রসারণের ফলে গলার স্বর মোটা হয়।

(৫) যৌন গ্রন্থির পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং যৌনাঙ্গগুলি পরিপূর্ণতা লাভ করে।

(খ) মানসিক/প্রজ্ঞামূলক বৈশিষ্ট্য (Mental or Cognitive Characteristics) :

দৈহিক বিকাশ এর মত এই স্তরে মানসিক বিকাশ ও অতি দ্রুত হয়। এই স্তরের বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) বিমূর্ত চিন্তন (Abstract Thinking) :

এই স্তরে একে ব্যক্তি বিমূর্ত চিন্তন করতে সক্ষম হয়। যেমন—স্বাধীনতা, ভালোবাসা প্রভৃতি সম্পর্কে চিন্তা করা।

(২) অবরোহ চিন্তন (Deductive Thinking) :

এই বয়সে শিশুর সাধারণ (General) থেকে বিশেষ (Specific) বিষয়ে চিন্তা করতে পারে একে অবরোহী চিন্তন বলে।

(৩) সমস্যা সমাধানের চিন্তন (Problem-Solving Thinking) :

এই স্তরে ব্যক্তি নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পারে।

(৪) প্রতিফলিত চিন্তন (Reflective Thinking) :

এই বয়সে ব্যক্তি নিজের চিন্তা বা যুক্তিকরণকে মূল্যায়ন করতে পারে, এই ধরনের চিন্তন কে বলা হয় প্রতিফলিত চিন্তন।

(গ) সামাজিক বৈশিষ্ট্য (Social Characteristics) :

কৈশোরের সামাজিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) বন্ধুত্ব স্থাপন (Establishing friendships) :

এই বয়সে ব্যক্তির বন্ধুত্ব তৈরীর প্রবণতা দেখা যায়। কৈশোরে ব্যক্তি সামাজিক পরিমণ্ডলে তৈরি করে এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সদস্য হতে ভালোবাসে।

(২) সামাজিক স্বীকৃতি লাভের প্রচেষ্টা (Attempts to gain social recognition) :

এই স্তরের ব্যক্তি সামাজিক স্বীকৃতি প্রত্যাশা করে। সেজন্য তার বিদ্যালয়ের কোনো অনুষ্ঠান বা সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে চাই।

(৩) বন্ধু দলের প্রভাব বৃদ্ধি (Increase the influence of friend group) :

এই স্তরের ছেলেমেয়েদের আত্ম সংকট সৃষ্টি হয় বলে তারা বন্ধু দলের সঙ্গো বেশি সময় কাটায় এবং ওই দলের প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য (Emotional Characteristics) :

এই স্তরের প্রাক্ষোভিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) প্রাক্ষোভিক অস্থায়িত্ব (Emotional instability) :

কৈশোরের প্রথম অবস্থায় ব্যক্তির প্রক্ষোভ সংবেদনশীল হয় এবং সে সহজেই দুঃখিত হয়। অর্থাৎ এই বয়সে প্রক্ষোভের স্থায়িত্বতা লাভ করে না।

(২) বিমূর্ত প্রক্ষোভ (Abstract agitation) :

ব্যক্তি কোন বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করে।

(৩) প্রাক্ষোভিক পরিণমন (Peripheral outcome) :

কৈশোরের শেষে ব্যক্তির প্রাক্ষোভিক নিয়ন্ত্রণ আসে।

কৈশোরের মৌলিক চাহিদা (Fundamental Needs of Adolescence) :

মানুষের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো কৈশোরকাল। যেহেতু এই স্তরে ছেলেমেয়েরা পরিপক্বতার স্তরে উন্নীত হয়, তাই অনেক সময় নতুন নতুন চাহিদা উদ্ভব হয়। কৈশোর কালের চাহিদাগুলো হলো—

(ক) দৈহিক চাহিদা (Physical Need) :

(১) খাদ্যের চাহিদা (Need for food) :

কৈশোর কালের দৈহিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে। বিশেষ করে আভ্যন্তরীণ অঙ্গানুনের ক্রিয়া এই সময় বেড়ে যায় ফলে খাদ্যের চাহিদা এই সময় প্রবল হয়।

(২) যৌন চাহিদা (Sexual Need) :

কৈশোরের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল যৌন চাহিদা। এই সময় যৌন গ্রন্থি এর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে এই চাহিদার তাড়নায় তারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে।

(৩) সক্রিয়তার চাহিদা (Demand for activism) :

এই সময়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সক্রিয়তা বেশি লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের সক্রিয়তা থেকে তাদের মধ্যে স্বাধীন চেতনা বোধ জাগ্রত হয়।

(খ) মানসিক চাহিদা (Mental Need) :

(১) নিরাপত্তার চাহিদা (Need for Security) :

কৈশোরের একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল নিরাপত্তা চাহিদা। এই সময় নানা চাহিদার

পরিতৃপ্তি করতে গিয়ে ব্যক্তি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তা থেকে তাদের মধ্যে নিরাপত্তা চাহিদা সৃষ্টি হয়।

(২) আত্মপ্রকাশের চাহিদা (Need for Self-Expression) :

কৈশোরে ছেলেমেয়েরা আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই রূপ মানসিকতার তাড়নায় তারা নিজেদেরকে অন্যের সামনে প্রকাশ করতে চায়।

(৩) স্বাধীনতার চাহিদা (Need for Freedom) :

শৈশব থেকে শুরু করে ব্যক্তি পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের উপর নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু কৈশোরে এসে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

(৪) জ্ঞানের চাহিদা (Need for Knowledge) :

এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশ হওয়ার দরুন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কৌতূহল জন্মায়। এর ফলে জানার ইচ্ছা প্রবল হয়। বিজ্ঞান, সাহিত্য, বিশ্বপ্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি ঝোঁক দেখা যায়।

(গ) সামাজিক চাহিদা (Social Need) :

(১) সামাজিক স্বীকৃতির চাহিদা (Need for social recognition) :

এই সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক স্বীকৃতি চাহিদা দেখা যায়। তারা বিভিন্ন রকম সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এই চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটায়।

(২) দুঃসাহসিক অভিযানের চাহিদা (Demand of adventure) :

সাধারণত এই স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুক্তিহীন বিষয় মেনে না নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। যার দরুন তাদের মধ্যে দুঃসাহসিক অভিযানের চাহিদা সৃষ্টি হয়।

(ঘ) নৈতিক চাহিদা (Ethical Need) :

এই সময় সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নৈতিক চেতনাবোধ সৃষ্টি হয়। সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক মানের ভিত্তিতে সমাজে সে তার নিজের অবস্থান মূল্যায়ন করতে থাকে।

কৈশোরের সমস্যাসমূহ (Problems of Adolescence) :

জীব বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে দৈহিক পরিবর্তন এবং হরমোন ক্ষরণ এই বয়সের ছেলেমেয়েদের

মধ্যে নানা জটিলতার সৃষ্টি করে। এছাড়াও যুগের হাওয়া, সময়ের পরিবর্তন, পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা, যৌনবোধ এবং বিভিন্ন সামাজিক ও মানসিক চাপ ব্যক্তির জীবনে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই স্তরের বিভিন্ন সমস্যা নিম্নে আলোচিত হলো—

(ক) যৌন সমস্যা (Sexual problem) :

যৌনগ্রন্থির বিকাশের ফলে এই সময় তাদের যৌন চেতনা ও যৌন চাহিদা বেড়ে যায়। এই চাহিদার তুলনায় তারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য বিভিন্ন উপায় খোঁজার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে সামাজিক বিধি নিয়ম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে, এ কারণে তারা বিভিন্ন মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে।

(খ) স্বাধীনতার চাহিদার দরুণ সমস্যা (Problems due ro the demand for independence):

স্বাধীনতার চাহিদার কারণে এই সময় শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে চাই। কিন্তু অভিভাবকদের বাধা দানে এই চাহিদা অপূর্ণ থেকে যায়। ফলে তাদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ জাগ্রত হয়।

(গ) নিরাপত্তা ও চাহিদার দরুণ সমস্যা (Problems due to security and demand) :

অভিভাবকদের আচরণে তারা অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হয়। নিজেদের দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে। ফলে তারা নানারকম অপসংগতিমূলক আচরণ করে থাকে, যেমন—বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া, মিথ্যে কথা বলা।

(ঘ) জ্ঞানের চাহিদার দরুন সমস্যা (Problems with the need for knowledges) :

এই সময় শিশুদের মধ্যে জ্ঞানের আকাঙ্খা দেখা যায়। তারা সমস্ত কিছু জানতে চাই। কিন্তু এই চাহিদার পরিতৃপ্তির না ঘটলে তাদের মধ্যে মানসিক উদ্বিগ্নতা দেখা যায়।

(ঙ) আত্মপ্রকাশের চাহিদার দরুন সমস্যা (Problems with the demand for self-expression) :

গৃহ পরিবেশ যথাযথ না হওয়ার কারণে অনেক সময় আত্মপ্রকাশের চাহিদা পরিতৃপ্ত হয় না। স্বাধীনতার অভাব হেতু অনেক সময়ই তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে না। যার ফলে তারা আড়ালে আবডালে অবাঞ্ছনীয় কাজকর্ম করে ফেলে।

(চ) দুঃসাহসিক চাহিদার দরুন সমস্যা (Problems due to adventurous demand) :

শিশুদের মধ্যে এই সময় নানা দুঃসাহসিক অভিযানের আকাঙ্ক্ষা থাকে। ফলে তারা কোন কিছু বিবেচনা না করেই অনেক সময় ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে নানা কাজ করে ফেলে যার প্রভাব তাদের সারাজীবন বহন করে চলতে হয়।

কৈশোরের এই সকল সমস্যা কোন না কোন চাহিদা কে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়। দৈহিক, সামাজিক, মানসিক নানা চাহিদা শিক্ষার্থীকে আলোড়িত করে। তাই এই সময়কালকে ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল বলা হয়।

কৈশোরকে ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল বলার কারণ (Reason for called adolescence Stress and stroms) :

ভূমিকা (Introduction) :

কৈশোরে শিশুর দেহ ও মনে যে দ্রুত পরিবর্তন আসে, তা উল্লেখ করতে গিয়ে মনোবিদ স্ট্যানলি হল (Stanley Hall) তাঁর ‘Adolescence’ বইতে এই কালকে ‘ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই সময়ে তার আচরণের ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। পরিবেশের সঙ্গে এতদিনের সহজ সম্পর্ক ভেঙে গিয়ে কৈশোরে সেই সম্পর্ক নতুন রূপে ও নতুন সমস্যা নিয়ে তার সামনে হাজির হয়। পুরাতনকে ভেঙে দিয়ে নতুন কিছু করার একটি তাড়না সে অনুভব করে। পূর্বের দৈহিক ও মানসিক কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন আসার জন্য সে নিজেকে অসহায় বলে ভাবতে শুরু করে এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। তার ফলে আত্মকেন্দ্রিকতা ও আবেগপ্রবণতা তাকে এই সময়ে গ্রাস করে ফেলে। তার মনে হয় যে, পরিবার বা সমাজ তার প্রাপ্য সম্মান বা মর্যাদা থেকে তাকে বঞ্চিত করার চেস্টা করছে এবং একই সঙ্গে নিপীড়নমূলক মনোভাব প্রদর্শন করছে। ফলে সমাজের প্রচলিত প্রথা, অনুশাসন, রীতি-নীতি ইত্যাদির প্রতি তার মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে। প্রকৃতিপক্ষে এইরূপ আচরণ হল ভাবের ক্ষেত্রে এক নতুন উন্মাদনা।

কৈশোরে যে চিত্ত-বিক্ষোভ ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায় তা মূলত দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে দ্রুত পরিবর্তনের জন্যই সৃষ্টি হয়। এইরূপ আকস্মিক পরিবর্তন তার জীবন পরিবেশে আলাদাভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাকে বিপর্যস্ত করে তোলে এবং প্রক্ষোভগত আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফলশ্রুতি হিসাবে তাকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এমনকী নানাবিধ চাহিদা তার মধ্যে দেখা দেয়। সবসময় সে এক ধরনের অভাববোধ বা অতৃপ্তি অনুভব করে। আর এর স্বরূপ কখনোই তার কাছে বোধগম্য তার জন্য সে খেয়ালি, উদাসীন ও অতিমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়ে। এই সময়ে সে মনে করে যে পরিবেশের প্রতিকূলতার সাধে খাপ খাইয়ে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। এইরূপ কল্পনা থেকেই হীনম্মন্যতাবোধ তার মধ্যে ধীরে ধীরে জন্মাতে থাকে। এমতাবস্থায় তার মধ্যে দেখা দেয় আত্মস্বীকৃতি লাভের চাহিদা। কিন্তু সমাজ তার প্রতি ততটা মনোযোগী হয় না। তখন সে নিজেকে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত বলে মনে করে। এইরূপ মানসিক অবস্থার জন্য সমাজের প্রতি তার মধ্যে এক ধরনের বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং সে বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করে। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়ার ফলে যে সমস্ত সমস্যামূলক আচরণ তার মধ্যে দেখা দেয়, তা হল—নেতিমূলক মনোভাব, নিপীড়নমূলক মনোভাব, আক্রমণধর্মিতা ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন যে,

কৈশোরের হঠাৎ দৈহিক পরিবর্তন তাদেরকে এইরূপ আচরণ সম্পন্ন করতে বাধ্য করে। আবার সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত হল এই যে পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা, পরিবর্তিত সামাজিক মূল্যবোধ, যৌন চেতনা ইত্যাদির মতো জটিল পরিস্থিতির আবর্তে সে দিশাহারা হয়ে পড়ে। এছাড়া চাহিদা নিবৃত্তির ক্ষেত্রে বাধাও তাকে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ সম্পাদনে বাধ্য করে। এই সময়ে সে সমস্যার ভারে জর্জরিত হয়ে পড়ে। তাই এই সময়কে পীড়ন ও কষ্টের কাল বা ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল বলা হয়।

কৈশোরের ঝড়-ঝাপটার স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে এই সময়ের বৈশিষ্ট্যগুলিকে গোচরে আনতে হবে।

(১) আকস্মিক দৈহিক বৃদ্ধির ফলে আচরণগত ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং তার বৈশিষ্ট্য মনে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। এর ফলে সে অতিমাত্রায় আত্মসচেতন, ভাবপ্রবণ ও অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে।

(২) দৈহিক পরিবর্তনের সাথে সাথে তার ভাবাবেগও বৃদ্ধি পায়। একসময়ে সে নিজেকে শক্তিমান হিসাবে মনে করে। তার মনে হয়, যে কোনও কিছুই তার কাছে অসাধ্য নয়। আবার পরক্ষণেই বাস্তবের রূঢ় আঘাতে কৈশোর কালে মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সে নিজেকে অপাঙ্গতেয় হিসাবে মনে করে।

(৩) কৈশোরের চিত্তবৃত্তির উদ্দীপনার জন্য সে কল্পনাপ্রবণ হয়ে পড়ে। এর প্রভাবে সে আবেগতাড়িত হয়ে কল্পলোকে বিচরণ করে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি কল্পলোকে বিচরণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অপূর্ণ বাসনা পরিতৃপ্তির অভাবে সে অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে।

(৪) কৈশোরের যৌন চেতনা কৈশোর কালে এক ধরনের মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। যৌন চেতনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সে তৎপর হয়ে ওঠে। যৌন চেতনা সম্পর্কে সমাজের প্রচলিত মনোভাব সম্পূর্ণ বিরূপ অভিপ্রায় পোষণ করায় তার মনের মধ্যে নীতিবোধের ক্ষেত্রে এক প্রবল দ্বন্দ্বের করে। এর ফলে সে মানসিক বিক্ষোভ তার মধ্যে সৃষ্টি হয়, তা লক্ষ করে মনোবিদ্‌গণ এই সময়কে পীড়ন ও কষ্টের কাল বলে বর্ণনা করেছেন।

কৈশোরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয় এবং পরিবারের ভূমিকা (The role of school and family in solving various problems of adolescence) :

কৈশোরকালীন সমস্যাগুলির সমাধানে এবং উপযুক্ত নির্দেশনা ও পরামর্শদান সরবরাহে বিদ্যালয় পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যেমন—

(ক) সক্রিয়তার সঞ্চালন (Performance of activation) :

বিদ্যালয়ে সক্রিয় কার্যাবলীর সঞ্চালন ঘটলে তার দরুণ শিক্ষার্থীদের নানা চাহিদার ফলে সৃষ্ট

সমস্যার সমাধান হবে। বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর বা প্রতিযোগিতার আয়োজন দ্বারা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সহজসাধ্য হয়।

(খ) জীবনধারণের প্রশিক্ষণ (Lifetime training) :

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যাবলী ও জ্ঞানের প্রসার দ্বারা শিক্ষার্থীদের জীবনধারণের প্রশিক্ষণ দান করা যায়।

(গ) উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি (Creating the right environment) :

বিদ্যালয়ের প্রাথমিক কাজ হল উপযুক্ত শান্ত পরিবেশ প্রদান করা যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে।

(ঘ) শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Development of holistic personality of students) :

বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্যাবলীর দ্বারা শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গো নানান কাজে অংশগ্রহণের দ্বারা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভবপর হয়।

(ঙ) কিশোরদের সম্পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দান (Giving Adolescence the opportunity for full development) :

বর্তমান শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক সুতরাং বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদের দৈহিক মানসিক ও আত্মিক উন্নতি। এক্ষেত্রে পরিবার ও শিশুর সম্পূর্ণ বিকাশ সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

(চ) ব্যক্তি বৈষম্য চিহ্নিতকরণ (Identifying individual inequalities) :

প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থীর থেকে আলাদা, এই বিষয়টি পরিবার এবং বিদ্যালয়কে বুঝতে হবে। তাদের পৃথক আগ্রহ চাহিদা বা সামর্থ্য কে চিহ্নিত করে তাদের বিকাশে সাহায্য করতে হবে।

(ছ) নৈতিক শিক্ষার দায়িত্ব (Responsibility for moral education) :

শিক্ষার্থীদের নৈতিক গল্প বলে নৈতিক শিক্ষার দায়িত্ব পরিবার এবং বিদ্যালয়ের। এই নৈতিক শিক্ষার দরুণ শিক্ষার্থীরা আচরণ গঠনের শিক্ষা লাভ করবে।

(জ) আত্মবিকাশের স্বাধীনতা (Freedom of self-development) :

সৃজনাত্মক মন, আত্মবিকাশের স্বাধীনতা এবং কার্যাবলী স্বাধীনতার দ্বারা একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যেকার নানা প্রতিভাকে বিকশিত করতে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রে পরিবার ও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(ঝ) ব্যবহারিক কার্যাবলীর সুযোগ (Opportunities for practical functions) :

বিদ্যালয় এবং পরিবার বাস্তব পরিবেশের উন্মুক্ত ব্যবহারিক কার্যাবলীর সুযোগ প্রদান করে শিক্ষার্থীদের বাস্তব জগৎ ও জীবনের উপযোগী করে তুলবে।

উপরিউক্ত সমস্ত ক্ষেত্রে পরিবার এবং বিদ্যালয় যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে কৈশোরকালীন সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

২.৬ সারাংশ (Summary)

মানুষের বৃদ্ধি এবং বিকাশ শুধুমাত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য নয়, মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। এই ইউনিটে ব্যক্তির বৃদ্ধি ও বিকাশের সমগ্র বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের বৃদ্ধি এবং বিকাশ এর পাশাপাশি জীববিজ্ঞান আচরণগত এবং প্রজ্ঞামূলক মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণও এই ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে। ইউনিটের শেষে বিকাশের পর্যায় এবং শিক্ষার ওপর এর প্রভাব যেমন আলোচনা করা হয়েছে তেমনি বিকাশের সঠিক দিক নির্দেশনা এবং শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

১. বৃদ্ধি এবং বিকাশ এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি কি?

২. শারীরিক বিকাশ কি?

৩. প্রজ্ঞামূলক বিকাশ বলতে কী বোঝো?

৪. মানসিক বিকাশের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

৫. বিকাশের অন্তত দুটি নীতি আলোকপাত করো।

৬. শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি বলতে বোঝো।

৭. শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানের প্রজ্ঞামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কী বোঝো?

৮. শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব আলোচনা করো।

২.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008) Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House, Pvt, Lted. New Delhi.

Chauhan, S.S. (1993) Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P., (2001), Educational Psychology", Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3

Mangal, Dr. S. K., (1998) Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana. 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College Distric & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002), Modern Educational Psychology", Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

স. বি (২০০৮) শিক্ষা মনোবিদ্যা, আহেলি পাবলিশার্স, কলকাতা।

একক - ৩ ❑ বিকাশের তত্ত্ব (Theories of Development)

গঠন (Structure)

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
৩.২ ভূমিকা (Introduction)
৩.৩ পিঁয়াজের প্রজ্ঞামূলক বিকাশ তত্ত্ব (Plaget's Cognitive Development Theory)
৩.৪ এরিকসনের মনো-সামাজিক বিকাশ তত্ত্ব (Erikson's Psycho-social Development Theory)
৩.৫ কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব (Kohlberg's Moral Development Theory)
৩.৬ সারাংশ (Summary)
৩.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)
৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

কোর্স শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা আশা করা হচ্ছে যা শিখবে—

- পিঁয়াজের প্রজ্ঞামূলক বিকাশ এর তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে।
- এরিকসনের মনোসামাজিক বিকাশ তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা তৈরি হবে।
- কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৩.২ ভূমিকা (Introduction)

মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ হল শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত ব্যক্তির প্রজ্ঞামূলক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তি ও সামাজিক দক্ষতা এবং স্বাভাবিক জীবন কালের সময় কার্যকারিতার বিকাশ। এটি বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান নামে পরিচিত শৃংখলার বিষয়বস্তু। ঐতিহ্যগতভাবে শিশু মনোবিজ্ঞান দীর্ঘদিন ধরে গবেষণার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল। প্রায় বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শৈশব এবং প্রাপ্তবয়স্ক তাও এর বিকাশের পর্যায়গুলি সম্পর্কে

অনেক কিছু শেখা হয়েছে। শিক্ষাগত অধ্যায়নে মানুষ কিভাবে শেখে, পরিপক্ক হয় এবং মানিয়ে নেয় তা বোঝার জন্য বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানের অধ্যায়ন অপরিহার্য। শিক্ষাবিদরা মানুষকে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে সাহায্য করার জন্য গবেষণা পরিচালনা করে।

বিকাশমূলক তথ্যগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে মানব উন্নয়নের বিভিন্ন দিক বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নলিখিত বিভাগে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আলোচনা করা হল, যথা—(1) পিঁয়াজের প্রজ্ঞামূলক বিকাশেত তত্ত্ব (2) এরিকসনের মনোসামাজিক বিকাশ তত্ত্ব (3) কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব।

৩.৩ পিঁয়াজের প্রজ্ঞামূলক বিকাশ তত্ত্ব (Piaget's Cognitive Development Theory)

ভূমিকা (Introduction) :

প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ Jean Piaget (1896) সালে সুইজারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। প্রজ্ঞামূলক বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা এবং অবদান অবিস্মরণীয়। পিঁয়াজে মূলত একজন জৈব বিশারদ। এই বিষয়ে তাঁর দক্ষতা প্রজ্ঞামূলক বিকাশে নতুন ধারণা প্রণয়নে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। পিঁয়াজে নিজেকে Generic Epistemologist হিসাবে মনে করতেন। ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে প্রজ্ঞার বিকাশের সম্পর্ক অনুসন্ধানে যাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করেন তাঁদেরকে Generic Epistemologist বলা হয়। যুক্তি নির্ণয় অভীক্ষার প্রশ্নে শিক্ষার্থীর ভুল উত্তরের কারণ অনুসন্ধানে তিনি উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনোযোগ বৌদ্ধিক বিকাশের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আজীবন তিনি প্রজ্ঞামূলক বিকাশের ওপর গবেষণায় নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন।

পিঁয়াজের তত্ত্বের মৌলিক ধারণাসমূহ (Basic Assumption of Piaget's Theory) :

বিভিন্ন বয়সের শিশুদের প্রজ্ঞামূলক বিকাশের ওপর দীর্ঘদিন গবেষণা করে পিঁয়াজে মন্তব্য করেন যে, প্রজ্ঞামূলক বিকাশের চারটি স্তর আছে। প্রতিটি স্তরেই তার পূর্ববর্তী স্তরের ওপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়। শিশুর প্রজ্ঞামূলক বিকাশের সূচনা হয়—স্পর্শ, দর্শন, স্বাদ ইত্যাদি প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত সংকেতের ব্যবহার এবং বিমূর্ত চিন্তনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে পরিণত বয়স পর্যন্ত। এই সময় ব্যক্তি বিমূর্ত ধারণা এবং বিকল্প সম্ভাবনাগুলিকে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয় যার ফলে প্রজ্ঞার বিকাশ হতে থাকে। পিঁয়াজে তাঁর প্রজ্ঞামূলক তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কয়েকটি ধারণার উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—

স্কিমা (Schema) :

স্কিমার ধারণাটির উদ্ভাবক হলেন মনোবিজ্ঞানী Art Burlett (1932), স্কিমা হল কোনো মুহূর্তে অর্জিত তথ্যসমূহের একক সংগঠন। পরমুহূর্তে শিশু যখন নতুন তথ্য আয়ত্ত করে তার স্কিমা সম্প্রসারিত হতে থাকে। এইভাবে সমগ্র জীবন ব্যাপী ব্যক্তির স্কিমা সম্প্রসারিত হতে থাকে। স্কিমা সম্প্রসারণে দুটি প্রক্রিয়া সক্রিয় হয় যথা—অভিযোজন (Adaptation) এবং সাংগঠনিকীকরণ (Organisation)।

অভিযোজন (Adaptation) :

মানুষের এই সহজাত বৈশিষ্ট্যের ওপর পিঁয়াজে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পিঁয়াজের মতে, অভিযোজন দুটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়। এই দুটি প্রক্রিয়া হল আত্তীকরণ (Assimilation) এবং সহযোজন (Accommodation)। আত্তীকরণ হল কোনো স্কিমা বা প্রজ্ঞামূলক সংগঠনের মধ্যে নতুন তথ্য, চিন্তা-ধারণা বা ভাবের সংযোজন, যার ফলে স্কিমা পরিবর্তন তথা সম্প্রসারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, এই মুহূর্তে আমরা পিঁয়াজের প্রজ্ঞামূলক তত্ত্ব পড়েছি। এই জ্ঞান ইতিমধ্যে অর্জিত জ্ঞানের যে স্কিমা বা প্রজ্ঞামূলক সংগঠন হয়েছে তার মধ্যে যুক্ত হয়ে স্কিমা সম্প্রসারিত হয়েছে। সহযোজন হল নতুন তথ্য, চিন্তা, ভাব ইত্যাদি প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করে স্কিমার মধ্যে যুক্ত করা। পরিবেশের নতুন তথ্য, চিন্তা বিষয় ইত্যাদি যদি বর্তমান স্কিমার পক্ষে সরাসরি গ্রহণ করতে অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে উক্ত তথ্য, চিন্তা বিষয় ইত্যাদিকে প্রয়োজন মতো পরিবর্তন বা বিন্যস্ত করে স্কিমা বা প্রজ্ঞামূলক সংগঠনের মধ্যে যুক্ত করা হয়, একেই সহযোজন বলে। যেমন—কঠিন কোনো ধারণা যদি বুঝতে অসুবিধা হয় উদাহরণের সাহায্যে সহজে বুঝে নিতে পারি।

সাংগঠনিকীকরণ (Organisation) :

স্কিমা বা প্রজ্ঞামূলক সংগঠনসমূহ সংগঠিত হয়ে আরও জটিল চিন্তামূলক কাজ করতে সক্ষম হয়। একেই সাংগঠনিকীকরণ বলে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বই পাঠ করতে গেলে ঠিকমতো বই ধরতে হবে, পাতা উলটাতে হবে এবং চোখ সঞ্চালন করতে হবে। এই তিনটি সংবেদন চালকমূলক প্রক্রিয়াকে সংগঠিত করেই বই পড়ার কাজটি করা সম্ভব।

প্রজ্ঞামূলক বিকাশের স্তর (Stages of Cognitive Development)

Jean Piaget প্রজ্ঞামূলক বিকাশের চারটি স্তরের কথা বলেছেন—

প্রথম স্তর	সংবেদন-চালকমূলক স্তর (Sensori Motor Stage) জন্ম থেকে 18–24 মাস।
দ্বিতীয় স্তর	প্রাক্‌সক্রিয়তার স্তর (Pre-operational Stage) 2 বৎসর থেকে 7 বৎসর।
তৃতীয় স্তর	মূর্ত-সক্রিয়তার স্তর (Concrete-operational Stage) 7 বৎসর থেকে 11 বৎসর।
চতুর্থ স্তর	যৌক্তিক সক্রিয়তার স্তর (Formal operational Stage) 11 বৎসর থেকে 18 বৎসর।

প্রথম স্তর : সংবেদন-সঞ্চালনমূলক স্তর (Sensorimotor stage) :

শিশুর জন্ম থেকে প্রথম দু'বছর পর্যন্ত এই স্তরটি বিস্তৃত। এই সময়ে প্রজ্ঞার ক্রিয়াকলাপ সীমিত। এই স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

1. **প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action) :**

   জন্মমুহূর্তে শিশুর কিছু ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয় এবং কিছু সাধারণ দৈহিক ক্রিয়াকলাপ করতে পারে। কিছু নির্দিষ্ট প্রতিবর্ত ক্রিয়া তারা করতে পারে, যেমন—আঁকড়ে ধরা (Grasping), চোষা (Sucking) ইত্যাদি। যেহেতু শিশু জন্মের পর এই দুটি ক্রিয়া করতে পারে, তাই সে কোনো বস্তু হাতের সামনে পেলে সেটিকে আঁকড়ে ধরে মুখে দিয়ে চোষণ করতে শুরু করে। এই ধরনের আচরণ করতে করতে তার কোনো বস্তুর প্রতি ধারণা তৈরি হয়। তার সামনে চকলেট থাকলে যেমন সে সেটাকে মুখে দেবে, আবার সামনে লঙ্কা থাকলে সেটাকেও মুখে দিয়ে চুষতে শুরু করবে। লঙ্কা মুখে দেবার পর স্বাভাবিকভাবেই তার ঝাল লাগবে এবং পরবর্তীতে লঙ্কা সামনে দেখলে আর মুখে দেবে না। এইভাবে তার স্কিমার পরিবর্তন শুরু হয়।

2. **পুনরাবৃত্তিমূলক ক্রিয়া (Circular action) :**

   এই বয়সে শিশুরা কোনো একটি আচরণ একইভাবে বারে বারে করতে থাকে। এই ধরনের আচরণকেই বলে Circular action বা পুনরাবৃত্তিমূলক ক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া তিন ধরনের হয়—

   প্রথম শ্রেণির (14) মাস : এখানে শিশু নিজের শরীরের কোনো অংশের সাথে এই পুনরাবৃত্তি করে থাকে, যেমন—আঙুল চোষা (thumb sucking)।

   দ্বিতীয় শ্রেণির (4–8) মাস : এখানে শিশু বাইরের কোনো বস্তু নিয়ে পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ করে থাকে। যেমন—ঝুনঝুনি বাজানো (Shaking a rattle)।

   তৃতীয় শ্রেণির (12–18) মাস : এখানে শিশু চেষ্টা করে নতুন কিছু করার ও ফলস্বরূপ কী হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করার। যেমন ধরা যাক কোনো শিশুর হাত থেকে একদিন হঠাৎ খাবার সময় বাটি পড়ে যাওয়াতে শব্দ হল। এবার শিশুটি অন্য কিছু হাত থেকে ফেলে দিয়ে দেখতে চায় কী ধরনের শব্দ হচ্ছে।

3. **বস্তুর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ধারণা (Object permanence) :**

   শিশু জন্মের পরে কোনো কিছুর স্থায়ী অস্তিত্ব আছে এটা বুঝতে পারে না। সে ভাবে, যা তার সামনে নেই তার অস্তিত্বও নেই। এই স্তরের শেষে সে বুঝতে শেখে কোনো কিছু তার চোখের সামনে না থাকলেও সেটি আছে। সেজন্য বাবা বা মা যখন তাকে বাড়িতে রেখে

অন্যত্র যায়, তখন বাবা-মা কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করে অর্থাৎ বুঝতে পারে কোনো কিছুর স্থায়ী অস্তিত্ব রয়েছে, যদিও সেটি তার সামনে নেই। এর ধারণাকে বলে Object permanence।

4. **কল্পনাচ্ছলে খেলা (Make believe play) :**

এই স্তরে শিশুরা সারাদিনের কার্যকলাপকে কল্পনা করে খেলাচ্ছলে সেটিকে অভিনয় করে। একে বলে 'Make believe play'। যেমন, হাতে একটি খেলনা গাড়ি নিয়ে সোফার উপর দিয়ে নিয়ে যাবার সময় বলে গাড়িটি ব্রিজে উঠছে আবার ব্রিজ থেকে নামছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় শিশুরা এই স্তরের শেষে মানসিক-কল্প (Mental Representation) তৈরি করতে পারে এবং উদ্দেশ্যমুখী কিছু আচরণ করতে পারে।

দ্বিতীয় স্তর : প্রাক্-ধারণামূলক স্তর (Pre-operational stage) :

এই স্তরের বিস্তৃতি 2 থেকে 7 বছর বয়স। এই স্তরে শিশু ধারণা গঠন করতে পারে এবং চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সামগ্রিক চিন্তা করতে অসুবিধে হয়। এইজন্য এই স্তরকে প্রাক্-ধারণামূলক স্তর বলে। এই স্তরের প্রজ্ঞামূলক বৈশিষ্ট্য নীচে আলোচিত হল—

1. **সাংকেতিক চিন্তন (Symbolic thought) :**

এই বয়সে সংকেতের ব্যবহার করতে শেখে এবং ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

2. **বিলম্বিত অনুকরণ (Deferred imitation) :**

এই স্তরে শিশুরা কোনো কিছু পর্যবেক্ষণ করে কিছু সময় পরে সেটিকে অনুকরণ করে।

3. **সর্বপ্রাণবাদ (Animistic thinking) :**

এই স্তরে শিশুরা জীব ও জড় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, তারা ভাবে পৃথিবীর সমস্ত কিছুরই প্রাণ রয়েছে। এই ধরনের চিন্তনকে বলে Animistic thinking বা সর্বপ্রাণবাদ চিন্তন।

4. **আত্মকেন্দ্রিক চিন্তন (Egocentric thinking) :**

এই স্তরে শিশুরা অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি (Others viewpoint) বুঝতে পারে না। তারা ভাবে তারা যেভাবে কোনো কিছুকে বুঝছে বা দেখছে সবাই একইভাবে সেটিকে দেখছে বা বুঝছে। এই ধরনের চিন্তনকে বলে Egocentric thinking বা আত্মকেন্দ্রিক চিন্তন। একটু খেয়াল করলে এই ঘটনা আমরা বাস্তবেও দেখতে পাই।

5. একমুখী চিন্তন (Centration) :

এই বয়সে শিশুরা একইসঙ্গো দুটি দিক দিয়ে কোনো বিষয়কে ভাবতে বা চিন্তা করতে পারে না। একে বলে Centration বা একমুখী চিন্তন।

উভমুখী চিন্তনের সীমাবদ্ধতা। আর এক ধরনের একমুখী চিন্তন এই বয়সে দেখা যায়, তা হল Irreversible thinking'। এই বয়সে শিশু উভমুখী চিন্তন (reversible thinking) করতে পারে না।

উপরের দু'ধরনের (Centration & irreversible thinking) চিন্তনের ফলে এই বয়সে শিশুদের সংরক্ষণের নীতি (Principle of conservation) বোঝার ক্ষমতা আসে না। অর্থাৎ কোনো বস্তুর আকার পাল্টালেও বস্তুটি যে একই থাকে সেটা তারা বুঝতে পারে না।

এই বয়সে তারা বন্ধুদের সাথে একসাথে কল্পনা দ্বারা সৃষ্ট কোনো খেলা খেলে। এই ধরনের খেলাকে বলে Sociodramatic play, যেমন—পুতুল খেলা।

তৃতীয় স্তর ঃ মূর্ত সক্রিয়তার স্তর (Concrete Operational stage) :

এই স্তরে প্রথমেই পূর্বের স্তরের সীমাবদ্ধতাগুলো দূর হয়। প্রথমত, তাদের Animistic thinking থাকে না অর্থাৎ জড় ও জীবকে পার্থক্য করতে পারে। দ্বিতীয়ত, তাদের Egocentric thinking দূরীভুত হয় অর্থাৎ তারা অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি যে তার থেকে আলাদা হতে পারে সেটা বুঝতে পারে। তৃতীয়ত, তাদের Centration দূর হয় অর্থাৎ একইসঙ্গো একের বেশি দিক (Dimension) দিয়ে ভাবতে পারে। চতুর্থত, তাদের চিন্তন উভমুখী (reversible) হয়। পঞ্চমত, তারা পদার্থের সংরক্ষণ নীতি বুঝতে পারে। এছাড়াও এই বয়সে নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়—

A. শ্রেণিকরণ ক্ষমতা (Classification ability) :

এই স্তরে তারা বিভিন্ন বস্তু বা বিষয়কে পৃথক করতে পারে ও নির্দিষ্ট শ্রেণিতে ভাগ করতে পারে। সেজন্য এই বয়সের শিশুরা Stamp, coin, card প্রভৃতি collection বা সংগ্রহ করতে ভালোবাসে। কোনো কোনো শিশু এই শ্রেণিকরণে অনেক সময়ও ব্যয় করে।

B. ক্রমপর্যায় ক্ষমতা (Seriation ability) :

ওজন বা উচ্চতার ভিত্তিতে এই বয়সের শিশুরা একাধিক বস্তুকে বড়ো থেকে ছোটো বা ভারী থেকে হালকা অথবা উল্টোভাবে সাজাতে পারে।

C. আরোহী চিন্তন (Inductive thinking) :

এই বয়সে শিশুদের মধ্যে আরোহী চিন্তন (Inductive thinking) ক্ষমতা তৈরি হয়। তারা একই ধরনের অনেক বিষয়বস্তু দেখে সামান্যীকরণে বা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে। যেমন—বিভিন্ন ধরনের পাখি দেখে তাদের পাখির ধারণা তৈরি হয়।

কিন্তু এই বয়সে শিশুদের বিমূর্ত চিন্তন (Abstract thinking) ক্ষমতা ভালোভাবে গড়ে ওঠে না, অর্থাৎ তাদের বিমূর্ত চিন্তনে অসুবিধে হয়। এই বয়সে মূর্ত চিন্তন (Concrete thinking) তাদের কাছে সহজ। এজন্যই এই স্তরকে মূর্ত ধারণামূলক স্তর বলে।

চতুর্থ স্তর : নিয়মতান্ত্রিক সক্রিয়তার স্তর (Formal Operational stage) :

পিয়াজের তত্ত্ব অনুসারে মানুষের প্রজ্ঞামূলক বিকাশের এটিই শেষ ও সর্বোচ্চ স্তর। এই স্তরের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ—

- বিমূর্ত চিন্তন (Abstract thinking) ক্ষমতা তৈরি হয়।
- অবরোহী চিন্তন (Deductive thinking) করতে পারে।

মূর্ত ও বিমূর্ত ধারণা (Concrete and Abstract concept) : যে ধারণা মূর্ত বস্তু অর্থাৎ পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা প্রত্যক্ষণ করতে পারি সেগুলো হল মূর্ত ধারণা। যেমন—চেয়ার, টেবিল, বই, বাড়ি ইত্যাদি। এই ধারণার জন্য যে চিন্তন কাজ করে তাকে বলে মূর্ত চিন্তন (Concrete thinking)। কিন্তু সমস্ত ধারণা মূর্ত নয় যেমন—স্বাধীনতা (freedom), সততা (honesty), ভালোবাসা (love)। এই ধারণাগুলি কিন্তু মূর্তভাবে প্রত্যক্ষণ করতে পারি না—এগুলিকে বলে বিমূর্ত ধারণা। এই ধারণার জন্য চিন্তনকে বলে বিমূর্ত চিন্তন (Abstract thinking)।

সমস্যা সমাধান করার চিন্তন (Problem solving thinking) :

এই স্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চিন্তন ক্ষমতা হল—সমস্যা সমাধান করার চিন্তন (Problem solving thinking)। অর্থাৎ এই সময়ে কেউ সমস্যায় পড়লে সে একা একাই সমস্যাটি সমাধান করতে পারে বা করার চেষ্টা করে। প্রথমে সে সমস্যাটিকে সংজ্ঞায়িত (define) করে। এরপর এই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান কী হতে পারে তা চিন্তা করে (hypothesis formation)। এরপরে ওই hypothesis-কে পরীক্ষা করে দেখে যে, তার অনুমান ঠিক কিনা। এভাবে প্রথমবারে সমস্যার সমাধান না হলে পরে সে জন্য hypothesis গ্রহণ করে, আবার একইরকমভাবে পরীক্ষা করে সেটি ঠিক কিনা। এভাবেই সে সমস্যার সমাধান করে। নিম্নে সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াটি দেখানো হলো—

সমস্যার সংজ্ঞায়ন
↓
সম্ভাব্য সমাধানের অনুমান
↓
সম্ভাব্য সমাধান এর জন্য পরীক্ষা
↓
সিদ্ধান্ত কারণ

অবদান (Contribution) :

(i) শিশু সম্পর্কে যে বদ্ধমূল ধারণা প্রচলিত ছিল পিঁয়াজে তার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তিনি শিশুকে পরিপূর্ণ জ্ঞানের আধার বলেছেন এবং শিশুকে একই সঙ্গে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

(ii) শিশু আত্মপ্রচেষ্টার পরিবেশ থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাই তার জ্ঞানমূলক বিকাশে সহায়তা করে।

(iii) পিঁয়াজে শিশুর জীবনবিকাশ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, কারণ তিনিই প্রথম তাঁর প্রস্তাবিত বিকাশের স্তরগুলিতে শিশু কীভাবে প্রকৃতি থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা বর্ণনা করেছেন।

(iv) পিঁয়াজে শিশুকে অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষণ করে বেশিরভাগ তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি ছাড়াও যে মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলি অনুশীলন করা যায়, এ কথা তিনি প্রমাণ করেন।

(v) পিঁয়াজে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের জীবনবিকাশ অনুশীলন পদ্ধতির মধ্যে প্রথম পরিবর্তন ঘটান।

(vi) তিনি আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে চিকিৎসামূলক সাক্ষাৎকার পদ্ধতির (Clinical Interview) প্রবর্তন করেন।

(vii) তিনি আধুনিক শিক্ষণ কৌশল হিসেবে যুক্তিনির্ভর গাণিতিক কৌশলের (Logico-mathematical technique) প্রবর্তন করেন।

সীমাবদ্ধতা (Limitations) :

(i) পিঁয়াজে তাঁর জ্ঞানমূলক বিকাশের তত্ত্বে 'অপারেশনের' উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এই 'অপারেশন' গুলির বিজ্ঞানসম্মত অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেননি। কাজেই কেবল 'অপারেশন' নামক একটা অনুমানের ভিত্তিতে কোনো বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা গড়ে তোলা ঠিক নয়।

(ii) পিঁয়াজে তাঁর তত্ত্বে জীবনবিকাশের চারটি স্তরের কথা বলেছেন। পরবর্তীকালে অনেক মনোবিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন যে, ব্যক্তিজীবনের বিকাশ সংগঠিত সক্রিয়তার স্তরের পরেও হয়। সুতরাং, পিঁয়াজে বর্ণিত জীবনবিকাশের স্তরগুলি সম্পূর্ণ নয়।

(iii) পিঁয়াজে জ্ঞানমূলক সংগঠনের গুণগত দিকের কথা বললেও পরিমাণগত দিকের কথা কিছুই বলেননি। সুতরাং, পিঁয়াজের তত্ত্বকে সম্পূর্ণ বলা যায় না।

(iv) Gibson নানা পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা দেখিয়েছেন যে, সংগঠিত সক্রিয়তার স্তরেও শিক্ষার্থীকে মূর্ত বস্তুর সাহায্যে শিক্ষা দিলে তার ধারণা আরও সমৃদ্ধ ও দৃঢ় হয়। তাঁর মতে, "We do not consive more when we persive less."।

পিঁয়াজের তত্ত্বের শিক্ষামূলক তাৎপর্য (Educational Significance to Piaget's Theory) :

বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে, এ কথা অনেক মনোবিজ্ঞানীই বলেছেন। কিন্তু পিঁয়াজে সর্বপ্রথম চিন্তন জগতের বিকাশ কিভাবে সংগঠিত হয়, সে সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দেন তাঁর জ্ঞানমূলক বিকাশের তত্ত্বে। তিনিই প্রথম বলেন যে, মানসিক পুষ্টি ও সমৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে, নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই বিকাশ একটি আনুপাতিক গাণিতিক এবং বিশ্লেষণাত্মক সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট বয়সে মানসিক পুষ্টিও নির্দিষ্ট। সুতরাং, শিশু বিকাশের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্নভাবে সমস্যার সমাধান করে থাকে। আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্যই হল শিশুর মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো এবং শিশু যাতে যুক্তির দ্বারা সমস্যাসমাধান করতে পারে, সে বিষয়ে সহায়তা করা। পিঁয়াজের তত্ত্ব আধুনিক শিক্ষণের নীতি নির্ধারণে নানাদিক থেকে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং শিক্ষার প্রগতিশীল আদর্শকে কার্যকরী করে তুলতে সহায়তা করেছে। পিঁয়াজের তত্ত্ব আধুনিক শিক্ষণের যে নীতিগুলি নির্ধারণ করেছে সেগুলি নিম্নরূপ—

শিক্ষামূলক প্রদীপনের ব্যবহার (Use of Teaching Aids) :

পিঁয়াজে বলেছেন, প্রত্যক্ষণ যদি অর্থপূর্ণ হয়, তবেই ধারণা সুস্পষ্ট হয়। সুতরাং, শিখন প্রক্রিয়ার শুরুতেই শিশুকে বিভিন্ন রকম প্রদীপন ব্যবহার করে শিক্ষা দিতে হবে। যে-কোনো বিমূর্ত ধারণার ভিত্তিভূমি হল কোনো-না-কোনো মূর্ত বস্তুর উপস্থাপনা। তাই শিক্ষক পাঠদানের সময় যেমন মূর্ত বস্তু উপস্থাপন করবেন, তেমনভাবেই একই বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনধর্মী, চেনা-পরিচিত উদাহরণ উপস্থিত করবেন।

সরল থেকে জটিল ধারণা (Simple to Complex concept) :

শিক্ষক সর্বদা শিক্ষার্থীর মানসিক স্তরের কথা মনে রেখে পাঠদান করবেন। তাই পাঠদানের শুরুতে কোনো বিষয়ে প্রবেশের মুহূর্তে তিনি কোনো জটিল ধারণার আশ্রয় নেবেন না। তাহলে শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়তে পারে। শিক্ষক তাই সরল ধারণা দিয়ে শুরু করবেন এবং ক্রমশ তার স্তর উন্নয়ন ঘটিয়ে। জটিল ধারণার দিকে নিয়ে যাবেন। তবেই শিক্ষার্থীর মানসিক ভারসাম্য বজায় থাকবে এবং সুষ্ঠু শিখনের ফলে মনন ও চিন্তন জগৎ সমৃদ্ধ হবে।

কাজের মাধ্যমে শিক্ষা (Education through Activity) :

শিক্ষককে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে শুধুমাত্র চার দেয়ালের ঘেরাটোপে শিক্ষার্থীকে আবদ্ধ

রেখে শিখন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার্থীকে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা' দিতে হবে। সে শুধু বই পড়েই নয়, দেখেশুনে, নেড়েচেপে ও পরীক্ষার মাধ্যমেও কিছু শিখবে এবং যাচাই করে নেবে। তাই শিক্ষার্থীকে নিয়ে যেতে হবে শিক্ষামূলক ভ্রমণে। এর মাধ্যমে ঐতিহাসিক নিদর্শন, ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক রীতিনীতি, বিভিন্ন প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ, ক্ষুদ্র ও ভারী শিল্প ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব ধারণা দেওয়া যায়।

সামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠক্রম (Consistent curriculum) :

শিক্ষক শিশুর শিখনকে কার্যকরী করে তোলার জন্য তার জীবনবিকাশের স্তরের সঙ্গো সামঞ্জস্য রেখে পাঠক্রম নির্বাচন করবেন। কারণ প্রত্যেক স্তরের বৌদ্ধিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাস ঘটাতে না পারলে শিক্ষা ফলপ্রসূ হবে না। পিঁয়াজের জ্ঞানমূলক বিকাশের তত্ত্ব আধুনিক শিক্ষায় পাঠক্রম নির্ধারণের নীতি নির্বাচনে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

শিক্ষণ মডেল (Teaching Model) :

পিঁয়াজে তাঁর জ্ঞানমূলক বিকাশের তত্ত্বের জৈবিক ভিত্তি হিসেবে কতকগুলি প্রাথমিক প্রক্রিয়া, যেমন—সহযোজন, আত্তীকরণ ইত্যাদির কথা বলেছেন, যেগুলি শিশুকে সক্রিয় করে উঠতে সাহায্য করে। এই নীতিকে প্রয়োগ করে বর্তমানে বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষণের অনেক 'শিক্ষণ মডেল' তৈরি হয়েছে। এই 'শিক্ষণ মডেল'গুলি শিক্ষককে বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়তা করে এবং শিক্ষার্থীদেরও উৎসাহী করে তোলে। তারা সক্রিয়ভাবে এই বিষয়গুলি শিখনে অংশগ্রহণ করে।

মন্তব্য (Conclusion) :

পিঁয়াজের তত্ত্ব আধুনিক শিক্ষণের যে নীতিগুলি নির্ধারণ করেছে, তা শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকারীভাবে প্রয়োগ করতে হলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজন। তাই পিঁয়াজে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মানুষের জ্ঞানমূলক বিকাশ কীভাবে হয় তা বিশদ আলোচনার কথা বলেছেন এবং এই জ্ঞানকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা যাতে বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারেন তার জন্য উপযুক্ত সুযোগ, পরিবেশ ও শিক্ষামূলক প্রদীপন ব্যবহারের কথা বলেছেন।

৩.৪ মনো-সামাজিক বিকাশ (Psycho-Social Development)

মনো-সামাজিক বিকাশ তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন এরিক এরিকসন (Erik Erikson)। তিনি ফ্রয়েডের ছাত্র হওয়ায় ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের দ্বারা প্রথমদিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তিনি ফ্রয়েডের মনোসমীকরণবাদকে আরও বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের কিছু কিছু নীতির বিরোধিতা করেন। তিনি জীবনবিকাশের ক্ষেত্রে ইদ (Id)-এর অতি যৌনতার ভূমিকাকে

প্রাধান্য না দিয়ে সামাজিক পরিবেশের প্রাধান্যকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তাঁর তত্ত্বকে মনো-সামাজিক তত্ত্ব (Psycho-social Theory) বলা হয়।

এরিকসনের মনো-সামাজিক বিকাশের তত্ত্ব (Erikson's Theory of Psycho-Social Development)

ফ্রয়েড বলেছিলেন—জন্মাবস্থায় মানুষের অবচেতন মনে ইদ (Id) অবস্থান করে। এই ইদ থেকেই মানুষের সমস্ত আচরণ এবং ইগো (Ego) সৃষ্টি হয়। এই ইদ্ ইগো এবং সুপার ইগোর (super ego) দ্বন্দ্বের ফলেই ব্যক্তিজীবনের বিকাশ ঘটে। কিন্তু এরিকসনের মতে

- জন্মাবস্থায় মানুষের মধ্যে ইগো বর্তমান থাকে এবং ইদ-এর প্রভাব ছাড়াই তা স্বাধীনভাবে অবস্থান করে, সুতরাং, ইগো একটি স্বাধীন সত্তা।
- ইগো (Ego) যেহেতু ইদ (Id)-এর শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, তাই ইদ এবং ইগোর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। অর্থাৎ ইগো জন্মাবস্থা থেকেই দ্বন্দ্বমুক্ত অবস্থায় থাকে।
- সামাজিক পরিবেশে অভিযোজনের ফলে ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশের অর্থ হল ইগোর বিকাশ। সুতরাং, ইগোর বিকাশের মৌলিক উপাদান হল সমাজ।
- ফলে, চাহিদা পূরণের জন্য ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বকে এরিকসন বলেছেন মনো-সামাজিক দ্বন্দ্ব (Psycho-social conflict)। এই মনো-সামাজিক দ্বন্দ্বের ফলেই ইগোর বিকাশ ঘটে।
- সুতরাং, ইগো বিকাশের মূল কারণ হল মনো-সামাজিক দ্বন্দ্ব, যৌনশক্তির দ্বন্দ্ব নয়।
- ইগোর বিকাশে ব্যক্তিগত পার্থক্য দেখা যায়।
- ইগোর বিকাশে যে ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায় তা জন্মগত এবং শক্তিও অন্তজ।
- এই ইগোর বিকাশের ফলেই ব্যক্তিজীবনের বিকাশ ঘটে।

বিকাশ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা (Discuss Development Process) :

ফ্রয়েড তাঁর মনোসমীক্ষণ তত্ত্বে 'লিবিডো'-কেই আত্মগত শক্তির মূল উৎস বলেছেন। সেই কারণে লিবিডোকে তিনি ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রাথমিক শক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ব্যক্তির ইগো কীভাবে বিকশিত হয় তা ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু এরিকসন তাঁর তত্ত্বে ইগো বিকাশের মাধ্যমে কীভাবে ব্যক্তিজীবনে বহুমুখী ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে তা বর্ণনা করেছেন।

(i) ইগো ব্যক্তিকে অভিযোজনে সহায়তা করে। বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তি যে অভিজ্ঞতাগুলি অর্জন করে সেগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে ইগো।

(ii) ইগো, ইদ ও সুপার ইগোর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। ইদের চরম জৈবিক চাহিদা এবং সুপার ইগোর চরম নৈতিক চাহিদার মধ্যে সাম্যাবস্থা বজায় রাখে ইগো।

(iii) এই সাম্যাবস্থা বজায় রাখার জন্য ইগো বাস্তব পরিস্থিতি, পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং আনুষঙ্গিক পটভূমি ইত্যাদি বিচার করে, ব্যক্তি কোন পরিস্থিতিতে কী ধরনের আচরণ করবে তার প্রকৃতি নির্দেশ করে। এই কাজ করার জন্য ইগো প্রয়োজনে আত্মরক্ষার কৌশল (Defence Mechanism) অবলম্বন করে।

(iv) ব্যক্তির ইগো যখন বাহ্যিক জগতের সংস্পর্শে আসে তখনই বাহ্যিক জগতের সঙ্গে ইগোর সংঘাত ঘটে এবং ব্যক্তি সেই সংকটজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করে। প্রত্যেক পরিস্থিতি ইগোর কাছে নতুন। সাধারণত একইরকম পরিস্থিতি দ্বিতীয়বার আসে না। যদি কোনো পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হয়, তাহলে সেই পরিস্থিতি পূর্ব পরিচিতির প্রভাবেই বদলে যায়। অর্থাৎ একবার ইগোর যে সাংগঠনিক পরিবর্তন হয়, তা কোনোভাবেই পরিবর্তন করা যায় না। এইভাবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্তরে ইগোর বিকাশ ঘটে।

(v) ব্যক্তির ইগোর বিকাশ পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ঊর্ধ্ব ক্রমানুসারে পৃথকীকরণ ও বিশেষীকরণ (Increasing Differentiation and Specilization) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে।

(vi) ব্যক্তির জীবনবিকাশ তার জন্মগতভাবে প্রাপ্ত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা ব্যক্তি তার সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করে। এর ফলে তার ইগোর বিস্তৃতি ঘটে, নিত্যনতুন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনে সক্ষম হয়।

(vii) যখন ব্যক্তির ইগোর চাহিদা এবং সমাজের চাহিদার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তখনই সৃষ্টি হয় মনোসামাজিক দ্বন্দ্ব, যা ব্যক্তিকে অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি প্রদান করে। এই বিরোধকে এরিকসন বলেছেন সংকটকাল (Crisis)।

(viii) এই সংকটের উৎস দুটি। একটি ব্যক্তি নিজে এবং অপরটি হল একটি সামাজিক বাধা যার সৃষ্টি সমাজ থেকে। ব্যক্তি এই সংকটমূলক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই অভিযোজন করে এবং এর ফলেই ব্যক্তিজীবনের বিকাশ ঘটে।

(ix) জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এই সংকটগুলি বিভিন্ন রকম হয়। ব্যক্তি বিভিন্ন স্তরে কীভাবে এই সংকটগুলির মোকাবিলা করে তার উপরই নির্ভর করে তার ব্যক্তিত্ব কেমন হবে। ব্যক্তির আচরণে এর প্রভাব ধনাত্মক বা ঋণাত্মক দু-প্রকারই হতে পারে।

(x) এরিকসন এই জাতীয় আটটি সংকটের কথা বলেছেন এবং এই সংকটগুলিকে জীবনবিকাশের এক-একটি স্তর হিসেবে বর্ণনা করে ব্যক্তির সম্পূর্ণ জীবনে। কীভাবে মনো-সামাজিক বিকাশ ঘটে তা বর্ণনা করেছেন।

(xi) এরিকসন প্রস্তাবিত মনো-সামাজিক জীবনবিকাশের স্তর (Stages of Eriksons Psycho-social Development)। এরিকসন প্রস্তাবিত মনোসামাজিক জীবনবিকাশের স্তরগুলি হল—

স্তর (Stage)	**জীবন বিকাশের স্তর (Phycho Social Development)**
প্রথম স্তর	বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব (Trust vs Mistrust) 0-1/2 বছর
দ্বিতীয় স্তর	স্বাধীনতা, লজ্জা ও সন্দেহের দ্বন্দ্ব (Autonomys vs Shame and Doubt) 11-2/3 বছর
তৃতীয় স্তর	উদ্যোগ ও অপরাধবোধের দ্বন্দ্ব (Initiatives vs Guilt) 3–12 বছর
চতুর্থ স্তর	উদ্যম ও হীনম্মন্যতার দ্বন্দ্ব (Industry vs Inferiority) 6–12 বছর
পঞ্চম স্তর	আত্মপরিচয় ও আত্মপরিচয় বিভ্রান্তির দ্বন্দ্ব (Identity vs Identity Confusion) 12-20 বছর
ষষ্ঠ স্তর	হৃদ্যতা ও একাকিত্বের দ্বন্দ্ব (Intimancy vs Isolation) 20–45 বছর
সপ্তম স্তর	অগ্রমুখিতা ও স্থবিরতার দ্বন্দ্ব (Gene rativity vs Stagnation) 45–65 বছর
অষ্টম স্তর	সামঞ্জস্যপূর্ণতা ও হতাশার দ্বন্দ্ব (Integrity vs Despair) 65 বছরের ঊর্ধ্বে

(i) প্রথম স্তর (First Stage) : বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব 0-1/2 বছর (Trust vs Mistrust) :

জন্মের পর দেড় বছর বয়স পর্যন্ত শিশু যে মনো-সামজিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় তা হল বিশ্বাস-অবিশ্বাস বা আস্থা-অনাস্থা। স্বাভাবিক বিকাশের জন্য এই সময় শিশুর পারিপার্শ্বিকের প্রতি বিশ্বাস বা আস্থা অর্জন প্রয়োজন। এই সময় শিশু তার চাহিদা পূরণের জন্য সম্পূর্ণভাবে পিতামাতা বা পরিবারের কোনো বয়স্ক সদস্যের উপর নির্ভর করে। পিতামাতার যত্ন এবং তাদের সঙ্গে বিশেষ করে মায়ের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক শিশুকে তাদের উপর আস্থা অর্জনে সাহায্য করে। অপরদিকে পিতামাতার অবহেলা শিশুর অনাস্থা ও অবিশ্বাসের কারণ হয়, যা পরবর্তীকালে তার ব্যক্তিত্বের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

(ii) দ্বিতীয় স্তর (Second Stage) : স্বাধীনতা, লজ্জা ও সন্দেহের দ্বন্দ্ব : 1/2-3 বছর (Autonomy's vs Shame and Doubt) :

এই স্তরে শিশুদের মধ্যে যে মনো-সামাজিক দ্বন্দ্ব দেখা যায় তা হল স্বাধীনতা এবং লজ্জা ও

সন্দেহের দ্বন্দ্ব। এই বয়সের শিশুকে প্রাত-কৃত্য সম্পন্ন করা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই সময় শিশুর মধ্যে এই জাতীয় কাজ নিজে নিজে করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু অভিভাবকদের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের ফলে শিশুর মধ্যে লজ্জা, সন্দেহ দেখা দেয়। অভিভাবকদের এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যদি শিশুর প্রতি কোনোরূপ অবহেলা প্রকাশ না পায় তাহলেই শিশুর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ এমন হবে যাতে শিশুর স্বাধীনতা কোনোভাবে ক্ষুণ্ণ না হয়।

(iii) তৃতীয় স্তর (Third Stage) : উদ্যোগ ও অপরাধবোধের দ্বন্দ্ব : 3-6 বছর (Initiative vs Guilt) :

এই স্তরের দ্বন্দ্বকে এরিকসন বলেছেন উদ্যোগ ও অপরাধের দ্বন্দ্ব। এই সময় শিশুরা শারীরিক দিক থেকে অনেক পারদর্শী হয়ে ওঠে। ফলে তারা চলাফেরায় অনেক স্বাধীনতা অর্জন করে। ভাষার বিকাশ সম্পূর্ণ হওয়ায় কল্পনার বিকাশ ঘটে। এই সময় শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন কাজে উৎসাহ দেখা যায়। এই উদ্যোগী মানসিকতার জন্য তারা বিভিন্ন কাজ, যেমন—পড়া, লেখা, ছবি আঁকা, বিদ্যালয়ে যাওয়া, নিজে নিজে পোশাক-পরিচ্ছদ পরা ইত্যাদি করতে পারে। এই সময় খেলার ভূমিকা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরে শিশুর মধ্যে 'সুপার ইগো' (Super Ego) গঠিত হয় এবং সে নৈতিক বিভেদ বোঝে, ফলে সামাজিক বিধিনিষেধ অমান্য করলে তাদের মধ্যে পাপবোধও দেখা দেয়।

(iv) চতুর্থ স্তর (Forth Stage) : উদ্যম ও হীনম্মন্যতার দ্বন্দ্ব : 6-12 বছর (Industry vs Inferiority) :

এই স্তরে শিশুর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তা হল উদ্যম ও হীনম্মন্যতার দ্বন্দ্ব। এই সময় শিশু কোনোকাজ করে তার স্বীকৃতি প্রত্যাশা করে। কোনো কাজে সফল হয়ে স্বীকৃতি পেলে তারা উদ্দীপিত হয়। অপরদিকে কোনো কাজে অসফল হলে এবং স্বীকৃতি না পেলে সে হীনম্মন্যতায় ভোগে। এই কারণে এই স্তরে শিশুর ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ দিতে হবে যাতে সে সেই কাজে সফল হয়। কারণ সামান্যতম সাফল্যও শিশুকে অভিযোজনে সাহায্য করে।

(v) পঞ্চম স্তর (Fifth Stage) : আত্মপরিচয় ও আত্মপরিচয় বিভ্রান্তির দ্বন্দ্ব : 12-20 বছর (Identity vs Identity Confusion) :

মনোসামাজিক তত্ত্বের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর বয়ঃসন্ধিক্ষণের এই স্তরে যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তা হল আত্মপরিচয় ও আত্মপরিচয় বিভ্রান্তির সংকট। এই সময়ে বাল্যকাল শেষ হয়ে শিশু কৈশোরে প্রবেশ করে। প্রারম্ভিক কৈশোরে হঠাৎ শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ফলে কিশোরদের নিজের সম্পর্কেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। সে কী করবে বুঝতে পারে না। আবার এই

সময় কিশোররা অন্যের চোখে নিজে কেমন তা দেখতে চেষ্টা করে, আত্মমূল্যায়ন করে এবং নিজেকে প্রাপ্তবয়স্কদের সমতুল্য ভাবতে শুরু করে। একেই এরিকসন বলেছেন আত্মপরিচয় ও আত্মপরিচয় বিভ্রান্তির দ্বন্দ্ব।

(vi) ষষ্ঠ স্তর (Sixth Stage) : হৃদ্যতা ও একাকিত্বের দ্বন্দ্ব : 20-45 বছর (Intimacy vs Isolation) :

এই স্তরের দ্বন্দ্বকে এরিকসন বলেছেন হৃদ্যতা ও একাকিত্বের দ্বন্দ্ব। বয়সের দিক থেকে এই সময়কাল হল প্রারম্ভিক যৌবনের স্তর। এই সময় দলের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে, স্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এই সময় বন্ধুদের প্রতি যে হৃদ্যতা প্রকাশ পায় তা অনুভূতিপ্রবণ। আবার এই স্তরে অন্যের সামাজিক আচরণ অনুকরণ করে দলগত মনোভাবের প্রাবল্য লক্ষ করা যায়। এই সময় অন্যদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারলে এদের মধ্যে একাকিত্ব বোধ দেখা দেয় এবং কারও প্রতি দায়বদ্ধতা গড়ে ওঠে না।

(vii) সপ্তম স্তর (Seventh Stage) : অগ্রমুখিতা ও স্থবিরতার দ্বন্দ্ব : 46-65 বছর (Generativity vs Stagnation) :

মধ্যবয়সে ব্যক্তি নিজের সন্তান ও সমাজের কীভাবে উন্নতি হবে সেই চেষ্টা করে। পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে যাতে সামাজিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত হয় তার ব্যবস্থা করে। একেই এরিকসন বলেছেন অগ্রমুখিতা। কোনো কারণে এই কাজে ব্যর্থ হলে সেইসব ব্যক্তি অত্যন্ত স্বার্থপর হয়। তারা নিজের মঙ্গল ছাড়া অন্য কারও মঙ্গলের কথা ভাবতে পারে না। ফলে তাদের মধ্যে স্থবিরতা (Stagnation) আসে।

(viii) অষ্টম স্তর (Eighth Stage) : সামঞ্জস্যপূর্ণতা ও হতাশার দ্বন্দ্ব : 65 বছরের ঊর্ধ্বে (Ego integrity vs Despair) :

মনো-সামাজিক বিকাশের এই স্তর হল বার্থক্যের স্তর। এই স্তরের দ্বন্দ্বকে এরিকসন বলেছেন সামঞ্জস্যপূর্ণতা ও হতাশার দ্বন্দ্ব। যে সমস্ত ব্যক্তি পূর্ববর্তী স্তরগুলির দ্বন্দ্বগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন তাঁরা এই সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করেন। তাঁরা জীবনকে আনন্দের দৃষ্টিতে দেখেন। জীবনের ওঠাপড়া, লাভক্ষতিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেন। তাঁরা যখন পূর্ববর্তী জীবনের স্মৃতিচারণ করেন তখন তৃপ্তি বোধ করেন এবং নিজের জীবন ও পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে ইতিবাচক অর্থ খুঁজে পান। অপরদিকে, যাঁরা পূর্ববর্তী বিকাশের স্তরগুলিতে সংকটগুলির সঙ্গে উপযুক্ত মোকাবিলা করতে পারেন না। তাঁদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। জীবন সম্পর্কে তাঁদের নেতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে। বার্থক্য, ব্যর্থতা এবং সুযোগের অপচয় বোধ থেকে প্রচণ্ড মৃত্যুভয় গড়ে ওঠে।

এরিকসনের তত্ত্বের মূল্যায়ন (Evaluation of Erikson's Theory)

(i) এরিকসনের তত্ত্বে জীবনবিকাশকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়েছে।

(ii) এই তত্ত্বে ইগোকে দ্বন্দ্বমুক্ত স্বাধীন সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে জীবনবিকাশকে মানসিক সুস্থতার দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(iii) এই তত্ত্বে জীবনবিকাশের ক্ষেত্রে লিবিডোর অত্যধিক যৌনতাকে গুরুত্ব না দিয়ে সামাজিক পরিবেশের গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়েছে।

(iv) জীবনবিকাশের অন্যান্য তত্ত্বগুলিতে কৈশোরকাল পর্যন্তই বিকাশকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু এরিকসন তাঁর তত্ত্বে বিকাশকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কীভাবে বিভিন্ন সংকটের সমাধানের মধ্য দিয়ে বিকাশ ঘটে তা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন।

সীমাবদ্ধতা (Limitations) :

(i) মনো-সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলিতে নির্দিষ্ট সময়ে কী পরিমাণ বিকাশ ঘটে, তা এরিকসন তাঁর তত্ত্বে ব্যাখ্যা করেননি।

(ii) পরবর্তীকালে কিছু কিছু পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, এরিকসন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে স্তরগুলির কথা বলেছেন তা সবার ক্ষেত্রে ওই একই ক্রম অনুসরণ করে না।

(iii) এরিকসন বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলিতে যে দ্বন্দ্বগুলির উল্লেখ করেছেন যদি কোন কারণে কোনো স্তরে দ্বন্দ্বের পরিবর্তন ঘটে তাহলে বিকাশের রূপ কেমন হবে তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি।

(iv) এরিকসনের তত্ত্বে অনেক অভিনবত্ব ও সম্ভাবনা থাকলেও এর দ্বারা ব্যক্তিজীবনের বিকাশের সমস্ত দিকগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

এরিকসনের তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Significance of Erikson's Theory) :

এরিকসনের মতে, মনো-সামাজিক বিকাশের স্তরগুলি ব্যক্তির জীবনে পর্যায়ক্রমে ঘটে এবং একটি স্তরের সংকট কাটিয়ে ওঠার পরই ব্যক্তি তার পরবর্তী স্তরের সংকটগুলির অভিযোজনে প্রস্তুত হয়। প্রত্যেকটি স্তরে অভিযোজনে তাকে সাহায্য করে শিক্ষা। তাই তিনি প্রত্যেকটি স্তরের শিক্ষাগত তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথম স্তর যেহেতু বিশ্বাস-অবিশ্বাস বা আস্থা-অনাস্থার দ্বন্দ্বের স্তর, তাই এই স্তরে শিশুর নিরাপত্তা যাতে কোনো কারণেই বিঘ্নিত না হয়, সে বিষয়ে নজর দিতে হবে। তারা যেন কোনোভাবেই অবহেলিত না হয় সে বিষয়েও সচেতন প্রয়োজন। পিতামাতা বা শিক্ষকের

আচরণে যাতে শিশুরা বিভ্রান্ত না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। শিশুর কোনো আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তা এমনভাবে করতে হবে যাতে শিশু দৈহিক বা মানসিকভাবে অবহেলিত বোধ না করে।

দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ স্বাধীনতা, লজ্জা ও সন্দেহের দ্বন্দ্বের স্তরে শিশুদের এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে তাদের স্বাধীনতা কোনোভাবে ক্ষুণ্ণ না হয়। এই স্তরে তাদের এমন কাজ দিতে হবে যাতে তারা স্বাধীনভাবে সেই কাজ সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে তাদের দক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা এবং আদর্শ চরিত্র গঠন করতে পারে। এই বয়সের শিশুরা যেহেতু অনুকরণপ্রিয় হয় তাই পিতামাতা ও শিক্ষকের আচরণ হতে হবে আদর্শস্থানীয়।

তৃতীয় স্তর যেহেতু উদ্যোগ ও অপরাধবোধের দ্বন্দ্বের স্তর তাই এই স্তরে খেলার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ খেলা শিশুর উদ্যোগী মনোভাবকে উৎসাহিত করে এবং আনন্দদান করে। খেলার মধ্য দিয়ে শিশু জ্ঞান অর্জন করে, পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে শেখে, প্রক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে, সামাজিক বিকাশ ঘটে এবং সৃজনশীল কাজে যুক্ত হতে পারে। সুতরাং এই স্তরে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত শিখনের প্রবণতাকে ভিত্তি করে পাঠক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি রচনা করতে হবে। পাঠক্রমের পাশাপাশি খেলা ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে তারা মানসিক ও দৈহিক চাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। তাহলেই তারা আর অপরাধপ্রবণ হয়ে জীবনের মূল স্রোত থেকে দূরে সরে যাবে না।

চতুর্থ স্তর অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার স্তরটি হল উদ্যম ও হীনম্মন্যতার দ্বন্দ্বের দ্বন্দ্ব। এই স্তরের প্রথম দিকে শিশুরা যে ক্ষমতা বা দক্ষতা অর্জন করে তার ব্যবহারের খুব আগ্রহ বোধ করে। এই আগ্রহের ফলেই তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়। কাজেই এই স্তরে শিক্ষক শিশুর প্রতিভাকে এমনভাবে পরিচালনা করবেন যাতে সে তার নিজের ক্ষমতা ও চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করতে পারে। শিশু যদি তার প্রত্যাশা অনুযায়ী পারদর্শিতা দেখাতে পারে তাহলেই তার মধ্যে কর্মক্ষমতা গড়ে উঠবে।

পঞ্চম স্তর অর্থাৎ কৈশোরকাল হল আত্মপরিচয় ও আত্মপরিচয় বিভ্রান্তির দ্বন্দ্বের স্তর। এই স্তরের শিক্ষায় সামাজিক বিকাশের গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বয়ঃসন্ধিক্ষণের এই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বয়স্কদের মতোই আচরণ করতে হবে এবং স্বাধীনতা ও মর্যাদা দিতে হবে। এই স্তরের পাঠক্রম এমন হবে যা তাদের বাস্তব লক্ষ্য অর্জনে উৎসাহিত করবে, ভবিষ্যতে বৃহত্তর জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকবে। বিষয়গুলি চ্যালেঞ্জিং হলেও তা তাদের ক্ষমতার বাইরে হবে না। তাই এই স্তরে শিক্ষক বিদ্যালয়ে বিতর্কসভা, আলোচনা

সভা এবং তাৎক্ষণিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করবেন। তাহলেই কিশোর কিশোরীরা তাদের আত্মপরিচয় খুঁজে পাবে এবং পরিচয় বিভ্রান্তির জন্য অসামাজিক পথে প্রতিরক্ষণ কৌশলের সাহায্য নেবে না।

৩.৫ কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব (Kohlberg's Moral Development theory) :

লরেন্স কোহলবার্গে মানবজীবনের বিকাশ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানুষের নৈতিক বিকাশ কীভাবে হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। তাই তাঁর তত্ত্বকে নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব বলা হয়। কোহলবার্গের জীবনে দার্শনিক চার্লস মরিস এবং মনোবিজ্ঞানী রবার্ট হ্যাভিগৃহার্স্টের প্রভাব অপরিসীম। তাঁর জীবনদর্শনেও এই দুই মনীষীর প্রভাব দেখা যায়। তাই তাঁর নৈতিক বিকাশের তত্ত্বও একই সঙ্গে দর্শন এবং মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশুর যুক্তির বিচারবিশ্লেষণ করে কোহলবার্গ নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, বিকাশ হল একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রমসমন্বয়মূলক প্রক্রিয়া। বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে তার পূর্ববর্তী স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলির পুনর্বিন্যাস ঘটে।

কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব (Kohlberg's Theory of Moral Development) :

কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব মানুষের আচরণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এগুলি হল—

A. শৈশবে শিশুর যেটুকু জ্ঞানমূলক বিকাশ হয় তার দ্বারা সে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। উভয় পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের জন্য শিশু নানাপ্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। সামাজিক পরিবেশে শিশু ও সমাজের মধ্যে যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়, তাই হল নৈতিক বিকাশের মূল ভিত্তি।

B. নৈতিক বিকাশ হল একপ্রকার জ্ঞানমূলক বিকাশ, কারণ নৈতিক আচরণের উৎস কোনো প্রাক্ষোভিক কেন্দ্র নয়। নীতিবোধ সম্পূর্ণভাবে যুক্তিনির্ভর, যা জ্ঞানমূলক বিকাশের ফলেই সম্ভব।

C. মানুষের তিনটি ক্ষমতা তার নৈতিক বিকাশে সহায়তা করে। এগুলি হল—তার বাহ্যিক আচরণ, সে কেন ওই আচরণ করছে এবং ওই আচরণের ফলে তার অভ্যন্তরীণ কী পরিবর্তন ঘটবে—এই তিনটির মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে পারে।

বিকাশ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা (Description of Development Process) :

কোহলবার্গ মানুষের নৈতিক বিকাশের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ব্যক্তির নৈতিক বিকাশের মূল উপাদান হল 3টি। এগুলি হল—

(i) জ্ঞানমূলক বিকাশ (Cognitive Development) :

কোহলবার্গ পিঁয়াজের জ্ঞানমূলক বিকাশের নীতি অনুযায়ী বলেছেন যে, জ্ঞানমূলক বিকাশ ব্যক্তির সামাজিক-নৈতিক মান নির্ণয়ে সহায়তা করে। অর্থাৎ ব্যক্তির নীতিবোধ তার জ্ঞানমূলক বিকাশের উপর করে গড়ে ওঠে। তবে জ্ঞানমূলক বিকাশ ছাড়াও অন্য যে উপাদানগুলি নৈতিক বিকাশে সহায়তা করে, সেগুলি হল—জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব ও ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা।

(ii) জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব (Cognitive Conflict) :

বিভিন্ন কারণে ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। যেমন—

(i) যদি ব্যক্তির মধ্যে দুটি বিপরীতধর্মী বিশ্বাস আবির্ভূত হয়,

(ii) যদি ব্যক্তির বিশ্বাসের সঙ্গে বাহ্যিক পরিবেশের সংঘাত হয়। অথবা

(iii) কোহলবার্গের মতে—ব্যক্তির নীতিবোধ তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে জ্ঞানমূলক স্তরে সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনে। অর্থাৎ ব্যক্তি ও তার সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। ব্যক্তি যখন জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্বের মোকাবিলা করে তখনই তার নৈতিক ধারণাগুলির পৃথকীকরণ ঘটে এবং ক্রমোচ্চ স্তরে সমন্বয়িত হয়। এইভাবেই ব্যক্তি যুক্তিনির্ভর হয় এবং তার নীতিবোধ জাগ্রত হয়। সুতরাং, জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার যে প্রচেষ্টা তার থেকেই ব্যক্তির নৈতিক জীবনের বিকাশ ঘটে।

(iii) নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা (Role taking ability)

কোহলবার্গ বলেছেন—ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা হল, কোনো পরিস্থিতিকে অন্যের মতো করে দেখে মূল্যায়ন করা বা মর্যাদা দেওয়া। এই ক্ষমতার দ্বারাই ব্যক্তি তার নিজের কোনো বিশ্বাসকে অন্যের বিশ্বাসের সঙ্গে তুলনা করে নৈতিক বিচারকরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। যে ব্যক্তির ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা বেশি অর্থাৎ যে অন্যের মতামতকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে, তার নৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা বেশি।

উপরোক্ত তিনটি উপাদান পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, কারণ জ্ঞানমূলক বিকাশ, জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্বের কারণ, আর এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোর জন্য ব্যক্তির ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজন। নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে তিনটি উপাদানেরই গুরুত্ব থাকলেও জ্ঞানমূলক বিকাশ নৈতিক বিকাশের মূল নিয়ন্ত্রক।

কোহলবার্গ পিঁয়াজের গবেষণাকে আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন ও বলে নৈতিক বিকাশের তিনটি লেভেলে আছে এবং প্রত্যেকটি লেভেলে আবার দুটি করে স্টেজ আছে সেগুলি হল—

লেভেল (Level)	স্টেজ (Stage)
প্রাক-সংস্কারমূলক পর্যায় (Pre-conventional Level)	**প্রথম স্তর (First Stage) :** শাস্তি বাধ্য নীতিবোধ (Punishment obedience orientation)
	দ্বিতীয় স্তর (Second Stage) : ব্যক্তিকেন্দ্রিক নীতিবোধ (Personal reward orientation)
সংস্কার প্রভাবিত পর্যায় (Conventional Level)	**তৃতীয় স্তর (First Stage) :** প্রত্যাশামূলক নীতিবোধ (Good boy Nice girl orientation)
	চতুর্থ স্তর (Forth Stage) : সমাজ নিয়ন্ত্রিত নীতিবোধ (Law and order orientation)
সংস্কারমুক্ত পর্যায় (Post-(conventional Level)	**পঞ্চম স্তর (Fifth Stage) :** সামাজিক চুক্তি নিয়ন্ত্রিত নীতিবোধ (Social contract orientation)
	ষষ্ঠ স্তর (Six Stage) : সার্বজনীন নীতিবোধ (Universal ethical principle orientation)

A. প্রথম পর্যায় : প্রাক্-সংস্কারমূলক পর্যায় (Pre-conventional Level)

এই পর্যায়ে মানুষ ভালো-মন্দ বিচার করে তার নিজের চাহিদা ও প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভর করে। এই সময়ে সমাজস্বীকৃত নিয়মনীতি সে বোঝে না। এই পর্যায়ের দুটি স্তর—

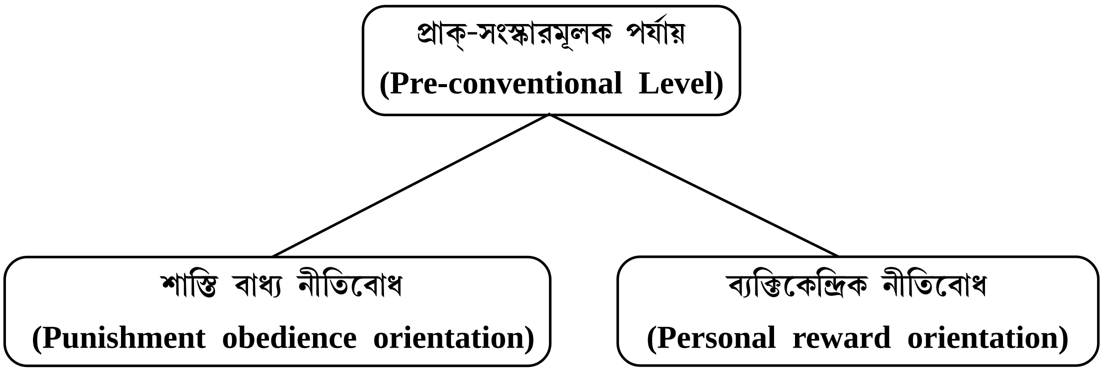
প্রাক্-সংস্কারমূলক পর্যায়
(Pre-conventional Level)
শাস্তি বাধ্য নীতিবোধ
(Punishment obedience orientation)
ব্যক্তিকেন্দ্রিক নীতিবোধ
(Personal reward orientation)

1. প্রথম স্তর : শাস্তি বাধ্য নীতিবোধ (Punishment obedience orientation) :

এই স্তরে মানুষের প্রকৃত নৈতিকতা সৃষ্টি হয় না। যে কাজ করলে শাস্তি হয়, সেই কাজ করা উচিত নয়—এটাই তার নীতিবোধ।

2. দ্বিতীয় স্তর : ব্যক্তিকেন্দ্রিক নীতিবোধ (Personal reward orientation) :

নিজের স্বার্থের ভিত্তিতেই সে কোনো কাজকে ঠিক-ভুল বিচার করে। যে কাজ করলে তার নিজের স্বার্থ বা চাহিদার পরিতৃপ্তি হয়, সেই কাজকেই সে ঠিক বলে ধরে নেয়।

B. দ্বিতীয় পর্যায় : সংস্কার প্রভাবিত পর্যায় (Conventional Level)

পরিবারের সদস্য, সমাজের মানুষ, ঐতিহ্য, সামাজিক নিয়মনীতি, রাষ্ট্রের আনুগত্য প্রভৃতির ভিত্তিতে মানুষ এই পর্যায়ে ঠিক-ভুল বিচার করে। এই পর্যায়ের প্রথমে সে ছোটো দলের মতামতকে গুরুত্ব দেয় ও ধীরে ধীরে তার ভাবনার পরিধি বিস্তৃত হয়। এই পর্যায়ের দুটি স্তর হল—

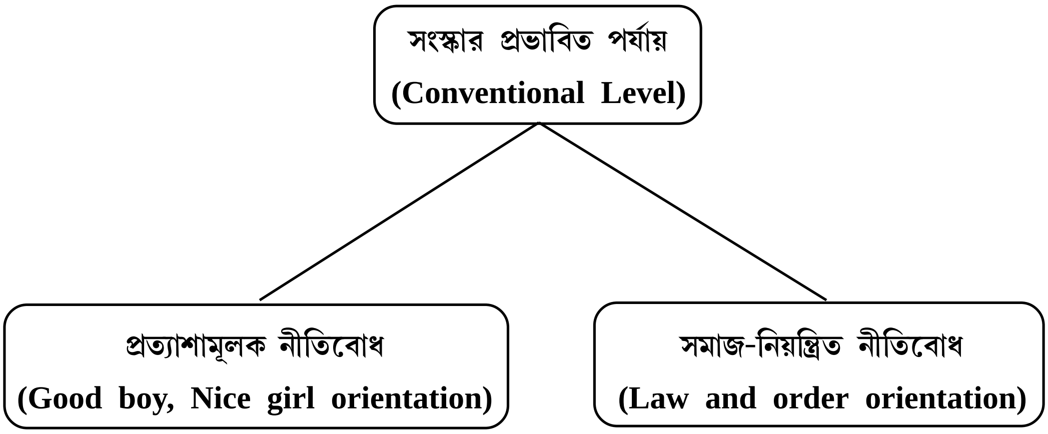
সংস্কার প্রভাবিত পর্যায়
(Conventional Level)
প্রত্যাশামূলক নীতিবোধ
(Good boy, Nice girl orientation)
সমাজ-নিয়ন্ত্রিত নীতিবোধ
(Law and order orientation)

3. তৃতীয় স্তর : প্রত্যাশামূলক নীতিবোধ (Good boy, Nice girl orientation) :

এখানে কোনো কাজ ঠিক না ভুল সেটা ঠিক হয় অন্যরা সেই কাজকে ঠিক না ভুল বলছে তার উপর। যে কাজ করলে অন্যের প্রশংসা পাওয়া যায়, সেই কাজকেই মে ঠিক বলে মনে করে।

4. চতুর্থ স্তর : সমাজ-নিয়ন্ত্রিত নীতিবোধ (Law and order orientation) :

সমাজের বা রাষ্ট্রের নিয়মনীতি মেনে যে কাজ করা হয় সেই কাজকেই সে ঠিক বলে মনে করে। সে সামাজিক নিয়মনীতিকে মান্য করে এবং সেগুলিকে মেনেই কাজ করতে চায়।

C. তৃতীয় পর্যায় : সংস্কারমুক্ত পর্যায় (Post-conventional Level) :

এই পর্যায়ে মানুষ নিজের ব্যক্তিগত নীতি দ্বারা ভালো-মন্দ বিচার করে। সেই বিচার সবসময় সমাজস্বীকৃত নাও হতে পারে এবং তা জেনেও সে কোনো কাজকে ভালো বলতেও পারে। এখানে দুটি পর্যায় রয়েছে—

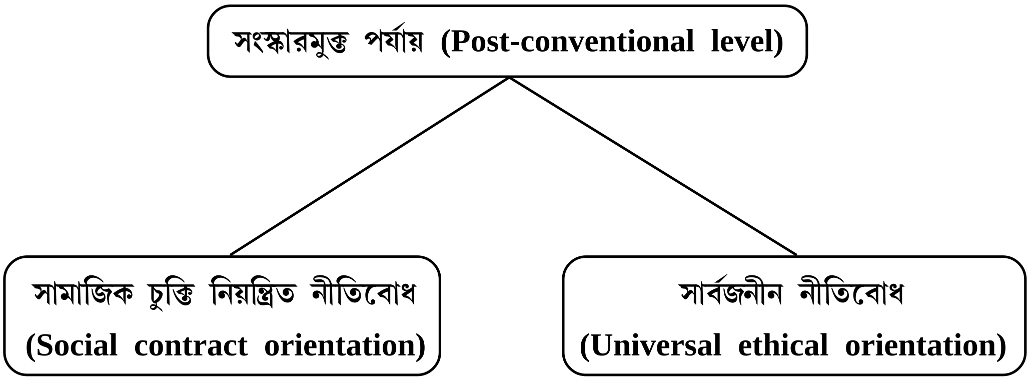
সংস্কারমুক্ত পর্যায় (Post-conventional level)
সামাজিক চুক্তি নিয়ন্ত্রিত নীতিবোধ (Social contract orientation)
সার্বজনীন নীতিবোধ (Universal ethical orientation)

5. পঞ্চম স্তর : সামাজিক চুক্তি নিয়ন্ত্রিত নীতিবোধ (Social contract orientation) :

সমাজস্বীকৃত মানুষের যে অধিকার রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে এই স্তরে ভালো-মন্দ বিচার করা হয় এবং সে মনে করে সমাজের ভালোর জন্য আইনও পাল্টানো যেতে পারে।

6. ষষ্ঠ স্তর : সার্বজনীন নীতিবোধ (Universal ethical principal orientation) :

এখানে ভালোমন্দের বিচার পুরোপুরি মানুষের বিবেকবোধের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কিছু যুক্তিকরণের ক্ষমতা রয়েছে, তার উপর নির্ভর করেই সে বিচার করে। এখানে সমাজস্বীকৃত বা রাষ্ট্রস্বীকৃত নীতিসমূহ সে জানলেও তার ঊর্ধ্বে গিয়ে সে বিচার করে।

কোহলবার্গের তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational implications of Kohlberg's Theory) :

কোহলবার্গের মত অনুসারে মানুষের নৈতিক বিকাশ নির্দিষ্ট ধাপ অতিক্রম করে আসে এবং সে কোনো স্তর বা পর্যায় বাদ দিয়ে উচ্চস্তরে পৌঁছাতে পারে না। তিনি আরও বলেন বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবে পৌঁছায় না। এই পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব (Cognitive dissonance)। তিনি আরও বলেন এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন দলগত আলোচনা (group discussion)। উক্ত দলটির সদস্যরা বিষম প্রকৃতির হলে এই ধরনের নীতিশিক্ষা ভালো হয়। শিক্ষক এই ধরনের আলোচনাতে পরোক্ষভাবে যোগদান করবেন এবং শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আলোচনাকে বেশি গুরুত্ব দেবেন। উপরের আলোচনাকে যদি আমরা কতকগুলি নির্দিষ্ট ধাপে ভাগ করি, তাহলে সেগুলি হলে—

- প্রথমে শিক্ষক একটি দল তৈরি করবেন যেখানে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীরা থাকবে যাতে তাদের মধ্যে যেন ব্যক্তি বৈষম্য থাকে।
- শিক্ষার্থীদের সামনে শিক্ষক/শিক্ষিকা একটি দ্বন্দ্ব (dilemma) উত্থাপন করবেন। দ্বন্দটি বাস্তবসম্মত এবং শিক্ষার্থীদের জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে ভালো হয়।

- ❖ শিক্ষক/শিক্ষিকা এই দ্বন্দ্বের উপর শিক্ষার্থীদের আলোচনা করতে উদ্‌বুদ্ধ করবেন। শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আলোচনাকেও গুরুত্ব দেবেন। শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেবেন।
- ❖ শিক্ষক/শিক্ষিকা নিজে প্রত্যক্ষভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন না। তিনি এমনভাবে পরিচালনা করবেন যেন সবাই নিজের মতামত জানাতে পারে।
- ❖ শিক্ষার্থীরা যখন একে অপরের মতামত শুনবে তখন তাদের নীতিবোধের বিকাশ ঘটবে।

কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশ তত্ত্বের সমালোচনা (Criticism of Kohlberg Moral development theory) :

কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের বিভিন্ন সমালোচনা করেছেন। তার তত্ত্বের সমালোচনা অংশগুলি হল—

(১) কোহলবার্গের তত্ত্বে কিছু নির্দিষ্ট বয়স সীমা নির্ধারণ করে আচরণ বা বিচার করুন ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সর্বদা এই হিসেবে মানুষের নৈতিক বিকাশ ঘটে না। তার তত্ত্বে বলা হয়েছে কুড়ি বছরের পরে মানুষ পোস্ট কনভেনশনাল স্টেজে পৌঁছায়। কিন্তু বাস্তবিক ভাবে লক্ষ্য করা যায় এই স্তরের মানুষ পৌঁছেও পূর্বের স্থানে গিয়ে নৈতিক বিচার করেন করতে পারেন।

(২) কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের পরীক্ষা তত্ত্বে যে ডিলেমা (Dilema) সৃষ্টি করেছেন তাতে মানবিক সম্পর্ককে গুরুত্ব আরোপ করেনি।

(৩) কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব আর একটি সীমাবদ্ধতা হলো তিনি পুরুষদের নৈতিক বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার তত্ত্বে নারীদের নৈতিক বিকাশের কোন পার্থক্য আলোচনা করা হয়নি।

(৪) কোহলবার্গ পোস্ট কনভেনশনাল স্টেজ (Conventional Stage) এর মাধ্যমে যে দুটি স্তরের কথা বলেছিলেন প্রকৃতপক্ষে এই স্তর দুটি পৃথক নয় একই।

কোহলবার্গের তত্ত্ব নিয়ে গিল্লিগান্স (Carol Gilligans) এর সমালোচনা :

Carol Gillgans হলেন কোহলবার্গের শিক্ষার্থী এবং সহকর্মী। যখন গিল্লিগান্স তার নৈতিক বিকাশ তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছিলেন তখন সেই তত্ত্বের ওপর অর্থাৎ Heinz এর moral dilema এর উপর কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন গিল্লিগান। তিনি কোহলবার্গের male centred approach কে সমালোচনা করেছেন। কারণ কোহলবার্গ যে তথ্য প্রকাশ করেছেন সেখানে মেয়েদের নৈতিক বিকাশের দিকটি আলোচনা করা হয়নি।

৩.৬ সারাংশ (Summary)

প্রথম সাব ইউনিটে পিঁয়াজের প্রজ্ঞামূলক বিকাশ এর তথ্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পিঁয়াজে ১৮০০ এর দশকের শেষের দিকে সুইজারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি একজন গুণী ছাত্র ছিলেন, যখন তিনি মাত্র ১১ বছর বয়সে তার প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন তখনই তিনি নিজের পরিচিতি লাভ করেছিলেন। আলফ্রেড বিঁনে ও সাইমনের সঙ্গো কাজ করা কালীন তিনি তার প্রজ্ঞামূলক বিকাশের তত্ত্ব সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি প্রজ্ঞামূলক বিকাশের তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

এরি এরিকসন শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। এরি এরিকসন (১৯০২-১৯৯৪) ছিলেন একজন মনস্তাত্ত্বিক যিনি ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করে বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে মনোসামাজিক বিকাশের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন।

এই অধ্যায়ের শেষ সাব ইউনিটে লরেন্স কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। লরেন্স কোহলবার্গ ছিলেন বিংশ শতকের একজন মনোবিজ্ঞানী যিনি প্রাথমিকভাবে নৈতিক মনোবিজ্ঞান এবং বিকাশের গবেষণার জন্য পরিচিত।

৩.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-assessment Question)

১. পিঁয়াজের প্রজ্ঞামূলক বিকাশের তথ্য অনুযায়ী স্কিমা কি?

২. আত্তীকরণ বলতে কী বোঝো?

৩. সংবেদনশীল মোটর পর্যায় এর দুটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

৪. বস্তুনিষ্ঠ স্থায়িত্ব বলতে কী বোঝো।

৫. এরিকসনের মনোসামাজিক তত্ত্বের কয়টি পর্যায় রয়েছে?

৬. স্বায়ত্তশাসন বনাম অপরাধবোধ বলতে কী বোঝায়?

৭. নৈতিক বিকাশ কি?

৮. কোহলবার্গের মতে নৈতিক শিক্ষা কি?

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008) Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House, Pvt, Lted. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993) Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P., (2001), Educational Psychology”, Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3

Mangal, Dr. S. K., (1998) Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana. 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College Distric & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002), Modern Educational Psychology”, Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

একক - ৪ ❑ ব্যক্তিত্বের মনোবিজ্ঞান (Psychology of Personality)

গঠন (Structure)

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৪.২ ভূমিকা (Introduction)

৪.৩ ব্যক্তিত্বের মনোবিজ্ঞান (Psychology of Personality)

  ৪.৩.১ ব্যক্তিত্বের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য (Concept & Characteristics of Personality)

  ৪.৩.২ ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ভাগ এবং মানব জীবনে তার তাৎপর্য (Types & Significance in Human Life)

৪.৪ ব্যক্তিত্ব বিকাশের মূল তত্ত্ব (Basic Theories of Personality Development)

  ৪.৪.১ আলপোর্ট (Allport)

  ৪.৪.২ আইজ্যাঙ্ক (Eysenck)

৪.৫ ব্যক্তিত্ব পরিমাপ এবং শিক্ষার ওপর এর প্রভাব (Personality Measurement Types only and its Impact on Education)

৪.৬ সারাংশ (Summary)

৪.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

কোর্সটি শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের যে বিষয়গুলো জানতে সক্ষম হবে—

- ব্যক্তিত্বের অর্থ ও ধারণা এবং বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ।
- মানুষের জীবনে ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব বা প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবে।

- আলপোর্ট এবং আইজ্যাঙ্কের দ্বারা প্রস্তাবিত ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব গুলি সম্পর্কে ধারণা করতে এবং তার শিক্ষাগত গুরুত্ব বলতে পারবে।
- প্রকারভেদ অনুযায়ী ব্যক্তিত্বকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং তার শিক্ষাগত প্রভাব বলতে পারবে।

৪.২ ভূমিকা (Introduction)

আপনি যদি কোন ব্যাক্তিকে 'ব্যাক্তিত্ব' শব্দটির অর্থ জিজ্ঞাসা করেন সম্ভবত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সহজ উত্তর দিতে সক্ষম হবে না। ব্যাক্তিত্বের সংজ্ঞা নিয়ে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যদিও বর্তমানে ব্যাক্তিত্ব (personality) একটি অন্যতম বিষয় শিক্ষা এবং মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে। মানুষের ব্যাক্তিত্ব এতটাই জটিল যা একটি ঘটনা বা বিষয়ের মাধ্যমে বোঝানো সম্ভব নয়। ব্যক্তিত্ব হল ব্যাক্তির অর্জিত ও সহজাত সকল রকম জৈবিক প্রেরণাএবং আকাঙ্খার সমষ্টি।

এই অধ্যায়ে আমরা ব্যাক্তিত্ব এবং ব্যাক্তিত্বের বিভিন্ন তত্ত্ব (অ্যালাপার্ট এবং অ্যাইজাক এর তত্ত্ব) সম্পর্কে ধারনা অর্জন করবো। এই তত্ত্বগুলির মধ্যমে ব্যাক্তির ব্যাক্তিত্বের বিভিন্ন জটিল দিকের বিশ্বেষণ সম্পর্কে অবগত হবো। এছাড়াও এই অধ্যায়ে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের নানা পরিমাপক পদ্ধতি সম্পর্কে ধারনা অর্জন করতে পারবেন।

মূলত এই ইউনিটে ব্যক্তিত্বের ধারনা এবং এর তাৎপর্য ব্যাক্তিত্বের মৌলিক তত্ত্ব, ব্যক্তিত্বের পরিমাপ ও শিক্ষার উপর এর প্রভাব বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪.৩ ব্যক্তিত্বের মনোবিজ্ঞান (Psychology of Personality)

ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিত্ব (Personality) একটি বিমূর্ত ধারণা। তাই এই শব্দটিকে আমরা সাধারণ জীবনে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এমন বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকি যে, তার থেকে ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মনোবিদ আলপোর্ট (Allport) বলেছেন—"Its connoting significance is very broad, its denotaing significance negligible. থর্নডাইক (Thorndike) এই ব্যক্তিত্ব (personality) কথাটির প্রায় আট হাজার রকমের ব্যবহার খুঁজে পেয়েছেন। সাধারণ অর্থে, খুব রাগভারি লোককে আমরা বলি—"ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্ব আছে। আবার কোন সময় বলি—"লোকটির একেবারেই ব্যক্তিত্ব নেই"। কিন্তু মনোবিদ্যাসম্মত অর্থে, ব্যক্তিত্ব প্রত্যেকেরই আছে। তাই সাধারণ প্রচলিত'ব্যক্তিত্ব শব্দটির পরিবর্তে আমরা ব্যক্তিসত্তা কথাটির ব্যবহার করব। ইংরাজী 'পারসোন্যালিটি (personality) কথাটি গ্রীক প্রতিশব্দ 'পারসোনা' (persona) থেকে এসেছে।কথাটি থিয়েটারে ব্যবহৃত মুখোশকে (mask) বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হত। যুগের পরিবর্তনে শব্দটির যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তার তাৎপর্যেরও পরিবর্তন

হয়েছে। তাই ব্যক্তিসত্তার প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হলে এই শব্দের তাৎপর্যের বিবর্তন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

৪.৩.১ ব্যক্তিত্বের ধারণা (Concept of Personality)

ব্যক্তিত্ব একটি জটিল বিষয়। তাই ব্যক্তিত্বের নিখুঁত সংজ্ঞা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। বিভিন্ন দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং মনোবিদ ব্যক্তিসত্তার সংজ্ঞা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দিয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে ব্যক্তিসত্তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। এই সমস্ত সংজ্ঞাগুলির সব এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। মনোবিদ **আলপোর্ট (G. W. Allport)** এ রকম 50টি সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করে দেখে তার থেকে একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, বিভিন্ন চিন্তাবিদ ব্যক্তিসত্তা কথাটিকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে ধর্মযাজকরা ব্যক্তিসত্তা এবং আন্তরিক অহংবোধকে (Inner-self) একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। ব্যক্তির অহংবোধই হল তার ব্যক্তিসত্তা। আলপোর্ট একে বলেছেন, ব্যক্তিসত্তার ঐশ্বরিক অর্থ (Theological meaning)। আবার অনেক দার্শনিক আত্মসচেতনতাকেই ব্যক্তিসত্তা হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

লক (Lock) এর মতে, যে ব্যক্তি চিন্তন, বিচারকরণ ও বুদ্ধির দ্বারা নিজের অহংসত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে, সেই ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। দার্শনিক উইন্ডেলবান্ড বলেছেন ব্যক্তি তার অহংসত্তার যে অংশ নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, তাই হল তার ব্যক্তিসত্তা। আবার, অনেক দার্শনিক সরাসরিভাবে ব্যক্তিসত্তাকে জীবনের মূল্য (supreme value) হিসাবে বিবেচনা করেছেন। **বউনি (Bowne)** বলেছেন, "The essential meaning of personality is self-hood, self-consciousness, self-control and the power to know".

এছাড়া, বিভিন্ন মনোবিদ ব্যক্তিসত্তাকে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাদের নিজস্ব সংজ্ঞা দিয়েছেন।

মর্টন প্রিন্স (Morton Prince) এর মতে—"ব্যক্তিসত্ত্বা হল ব্যক্তির অর্জিত এবং সহজাত সকল রকম জৈবিক প্রবণতা এবং আকাঙ্ক্ষার সমষ্টি"।

ওয়ারেন এবং কার্মাইকেল (Warren & Carmichael) এর মতে—জীবনবিকাশের যে কোন স্তরে ব্যক্তির গুণাবলীর যে সমন্বয় তাই হল ব্যক্তিসত্তা ["the entire organisation of a human being at any stage of his development"]।

কেম্প (Kempf) এর মতে, "ব্যক্তির নিজস্বতার পরিচায়ক অভিযোজন সহায়ক অভ্যাসের সমন্বয়ই হল ব্যক্তিসত্তা"।

স্কোয়েন এর মতে, "ব্যক্তিসত্তা হল ব্যক্তির সেই সব অভ্যাস, প্রবণতা এবং সেন্টিমেন্টের সমন্বয়

যা তাকে তার শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তি থেকে পৃথক করে রাখে” (Personality is the organised system, the functioning whole or unity of habits, dispositions and sentiments that mark off any one member of a group as being different from any other member of the same group).

ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি (Nature of Personality) :

1. ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। এই ক্রিয়া হয় বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গো ব্যক্তির অভিযোজনের জন্য।
2. ব্যক্তির সঙ্গো পরিবেশের অভিযোজন ঘটে ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, ভাবধারা, কামনা-বাসনা, জীবনাদর্শ এবং ব্যক্তির সহজাত প্রবণতার দ্বারা।
3. ব্যক্তিত্ব শুধুমাত্র কতকগুলি উপাদানের সমন্বয় নয়। ব্যক্তিত্ব হল বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল।
4. ব্যক্তিত্ব কোনো চিরস্থায়ী সংগঠন নয়। এটি সদা পরিবর্তনশীল, বিকাশমান এবং বর্ধনধর্মী।
5. দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রক্রিয়া থেকেই ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি জন্ম নেয়।
6. ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে সমগ্রত্ব, ঐক্য ও সামঞ্জস্য আছে তা নষ্ট হলে ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যায়।
7. ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি হল আত্মসচেতনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।
8. ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনশীলও বিকাশমান হলেও ব্যক্তিত্বের একটি স্থায়ী সংগঠন আছে.
9. ব্যক্তিত্বের জন্যই প্রতিটি ব্যক্তি এক বিশেষ ব্যক্তি, অন্য কারও সঙ্গো তার তুলনা হয় না।
10. ব্যক্তিত্বের সামাজিক উপাদানগুলি হল আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, কৃষ্টি ও ভাবধারা প্রভৃতি। সুতরাং, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সমাজের উপর নির্ভরশীল। তাই ব্যক্তিত্ব হল মানস-সামাজিক একক’ (Psycho-social unit)।

ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Personality) :

ব্যক্তিত্ব একটি জটিল বিষয়। তাই একটি বিশেষ সংজ্ঞার মাধ্যমে এর স্বরূপ নির্ণয় করা সহজ কাজ নয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের যথার্থ স্বরূপটি উদঘাটিত করতে হলে তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমাদের গোচরে আনতে হবে। এই কারণে ব্যক্তিত্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে আলোচনা হল।

1. নিজস্বতা (Ownship) :

ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির একটি স্বতন্ত্র সত্তা। একই পরিবেশে অভিযোজন করার সময় বিভিন্ন

ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে তাদের এই সুনির্দিষ্ট সত্তাটি প্রকাশ পায়। তবে এই ক্ষেত্রে অভিনবত্ব থাকলেও তার কোনও সংলক্ষণ অপর ব্যক্তির মধ্যে দেখা যাবে না-এমন কথা কখনোই বলা সম্ভব নয়।

2. আত্মসচেতনা (Self-awareness) :

ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির অহংবোধ থেকে উৎসারিত হয়। মানুষের চেতনায় যখন আত্মসচেতনতাবোধ জাগ্রত হয়, তখনই সে ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। তাই ইতর প্রাণীদের ব্যক্তিত্ব আছে এই কথা আমরা কখনও বলতে পারি না। কারণ এদের আত্মসচেনতাবোধ থাকে না।

3. উপাদানগত দিক (Componential aspect) :

ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র বংশগতি সূত্রে প্রাপ্ত কোনও বৈশিষ্ট্য নয়। এটি বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। কারণ ব্যক্তির মধ্যে তার যে সকল নিজস্ব গুণাবলী রয়েছে, সেগুলি পরিবেশের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার ফলেই পরিণতি লাভ করে।

4. লক্ষ্যাভিমুখীতা (Goal oriented) :

ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির অভিযোজনমূলক আচরণের ক্ষেত্রে তার স্বকীয়তার বহিঃপ্রকাশ, যা তাকে অপর ব্যক্তি থেকে পৃথক করে রাখে। এই পর্যায়ে যেহেতু আচরণ একটি উদ্দেশ্যাভিমুখী প্রক্রিয়া তাই ব্যক্তিত্ব সদা-লক্ষ্যাভিমুখী।

5. বিকাশমান সত্তা (Evolving entity) :

ব্যক্তিত্বের সংগঠনটি ক্রমবর্ধমান এবং গতিধর্মী—এটি নিশ্চল বা স্থির নয়। কারণ সমাজ হল পরিবর্তনশীল; তাই পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে সঙ্গাতি বিধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বকীয়তার প্রকাশ ভঙ্গিও পরিবর্তনধর্মী হতে বাধ্য। ফলে এটি বিকাশধর্মী না হলে তার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

6. সুসংহত সত্তা (Cohesive entity) :

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলির মিথষ্ক্রিয়ার ফলে যে সংগঠনটি গঠিত হয় তা একটি সমগ্র ও সুসংহত সত্তা। এখানে সংলক্ষণগুলির পৃথক কোনও বৈশিষ্ট্য প্রকাশপায় না। অভিযোজনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের সুসংহত সংগঠনটি সামগ্রিকভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।

সুতরাং উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে বলা যায় যে ব্যক্তিত্ব হল এমন একটি সমগ্র, সংহতিযুক্ত, সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, বিকাশমান ও গতিধর্মী মানসিক সংগঠন যা পরিবর্তনশীল উপসংহার পরিবেশে ব্যক্তিকে অদ্বিতীয় ও অনান্য আচরণ সম্পন্ন করতে বা প্রকাশ করতে সহায়তা করে। এইরূপ আচরণের সাথে অন্য কোনো আচরণের মিল খুঁজে পাওয়া বা তুলনা করা যায় না।

৪.৩.২ ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন টাইপ (Type of Personality) :

মনোবিদগণ ব্যক্তিত্বের ধরন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন তত্ত্বের উত্থাপন করেছেন। এখানে সেরকম তিনটি তত্ত্বের আলোচনা করা হল—

শেলডনের ব্যক্তিত্বের প্রকার (Sheldon's Types of Personality) :

১৯৪০ সালে আমেরিকার মনোবিজ্ঞান William Herbert Sheldon ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিত্বের প্রকার নির্ধারণে তিনি ব্যক্তি/মানুষের শারীরিকগঠনকে গুরুত্ব দিয়েছেন বা নির্ধারক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ব্যক্তির শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে যে ব্যক্তিত্বের ভাগটি দেখিয়েছেন তা হল

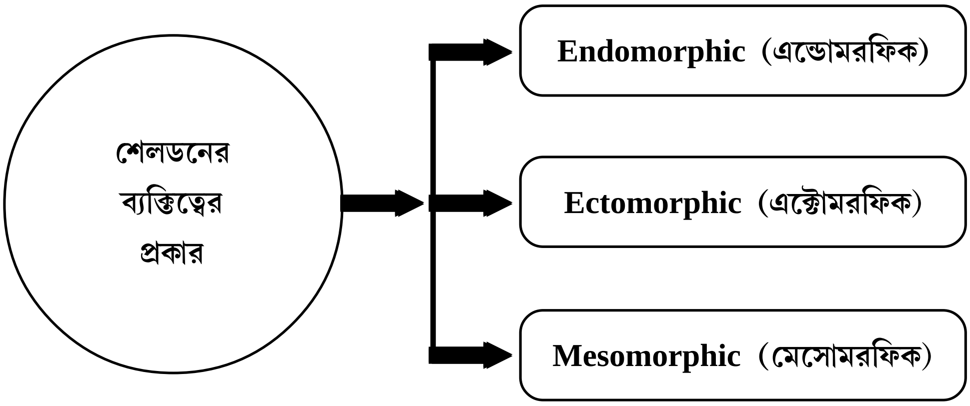

Sheldon-এর মতে ব্যক্তির শারীরিক গঠনের সাথে তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগত সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ শারীরিক গঠন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। তার বর্ণিত ব্যক্তিত্বের ভাগগুলিতে তিনি দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সাথে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহকে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন—

A. এন্ডোমরফিক (Endomorphic) :

এই ধরনের ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিরা শারীরিক গঠনের দিক থেকে গোলগাল ও নরম হয়। কিছুটা "Barrel of fun" ধরনের হয়।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য (Physical Characteristics) :

- ★ এদের কাধ চওড়া হয় এবং শরীরের নীচের অংশের তুলনায় উপরের অংশ অধিক চওড়া হয়।
- ★ এদের শরীরের বিভিন্ন অংশে মাংসপেশির বাহুল্য দেখা যায়, বিশেষ করে বাহু (Arms) এবং থাই (Thigh)-এ।

- ★ শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় হাতের কব্জি এবং পায়ের গোড়ালি অপেক্ষাকৃত রোগা (Slim) হয়।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হল—

- ❖ এরা সাধারণত সামাজিক হয়।
- ❖ এরা যে-কোনো বিষয় নিয়ে মজা করতে বা কৌতূহল করতে (Fun-loving) পছন্দ করে।
- ❖ এরা খেতে ভালোবাসে।
- ❖ এই ধরনের ব্যক্তিত্বের সহ্য ক্ষমতা অধিক হয়।
- ❖ এরা কখনও কখনও উত্তেজিত (Even-tempered) হয়ে পড়ে।
- ❖ এদের রসাত্মোবোধের (Sense of humore) অনুভূতি।
- ❖ এরা উদ্বেগমুক্ত থাকতে (Relaxed) পারে।
- ❖ এদের মধ্যে ভালোবাসার চাহিদা থাকে।
- ❖ এদের মেজাজগত বৈশিষ্ট্যকে "ভিসেরোটনিক" বলা হয়।

B. এক্টোমরফিক (Ectomorphic) :

এই ধরনের ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিদের দৈহিক গঠন, এন্ডোমরফিক ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিদের দৈহিক গঠনের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য (Physical Characteristics) :

- ★ এদের কাধ সংকীর্ণ হয়। শরীরের উপরের এবং নীচের উভয় অংশই সংকীর্ণ হয়।
- ★ এদের চওড়া কপাল বিশিষ্ট রোগা ও সরু মুখমণ্ডল হয়।
- ★ এদের বক্ষদেশ (Chest) এবং পেটের দিকের অংশ সরু ও মেদহীন হয়।
- ★ এদের হাত-পা গুলি রোগা হয়।
- ★ এদের শরীর খুব সামান্যই চর্বি (fat) থাকে।
- ★ এই ধরনের ব্যক্তিরা অতিভোজন করলেও এদের ওজনগত বৃদ্ধি খুব একটা হয় না।
- ★ এদের মেজাজগত বৈশিষ্ট্য "সেরিব্রোটনিক" ধরনের হয়।

ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য (Personality Traits) :

- ❖ এরা নিজেদের সম্পর্কে সচেতন থাকে।
- ❖ এরা কিছুটা সংরক্ষিত ভাবে একান্তে (Private) থাকা পছন্দ করে।
- ❖ এদের ব্যক্তি সাধারণত অন্তর্মুখী হয়। (Introvert)
- ❖ এরা সামাজিক দিক থেকে উদ্বিগ্ন (Anxious) থাকে।
- ❖ এরা শিল্পী (Aristic) হয়।
- ❖ এদের প্রাক্ষোভিক নিয়ন্ত্রণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
- ❖ এরা কিছুটা চিন্তাশীল (Thoughtful) হয়।

C. মেসোমরফিক (Mesomorphic) :

মেসোমরফিক ধরনের ব্যক্তিদের দৈহিক গঠন গোলগাল, এন্ডোমরফিক এবং এক্টোমরফিকদের মাঝামাঝি ধরনের হয়।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য (Physical Characteristics) :

- ★ এদের বড়ো মাথা, চওড়া কাধ এবং সরু কোমড় (waist) থাকে।
- ★ এদের পেশিবহুল শরীর শক্তিশালী হয়।
- ★ এদের শরীরের চর্বি (fat) কম থাকে।

ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য (Personality Traits) :

এই ব্যক্তিত্বের ধরন সোমাটোটনিক হয়। এদেরকে সাধারণত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বা “Well proportioned” বলা হয়। এদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হল—

- ❖ এই ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তিরা সাধারণত অভিযান প্রিয় হয়।
- ❖ এরা সাহসী ও কৌতূহলী হয়।
- ❖ অন্যেরা যা চিন্তা করে বা চায় তার থেকে ভিন্ন রকম ভাবে এরা চিন্তা করে।
- ❖ এদের মানসিকতা বিস্তৃত (bold) হয়।
- ❖ এরা সাধারণত প্রতিযোগিতামূলক কাজে অংশ নেয়।
- ❖ এরা ক্ষমতা (Power) প্রত্যাশী হয়।
- ❖ এরা ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে।

ক্রেশ্চমারের ব্যক্তিত্বের ধরন (Kretschimer’s type of Personality) :

জার্মান মনোচিকিৎসক অর্নেস্ট ক্রেশ্চমারও ব্যক্তির শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকে বর্ণনা করেছেন। তিনি মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমস্ত মানুষকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। তা হল—

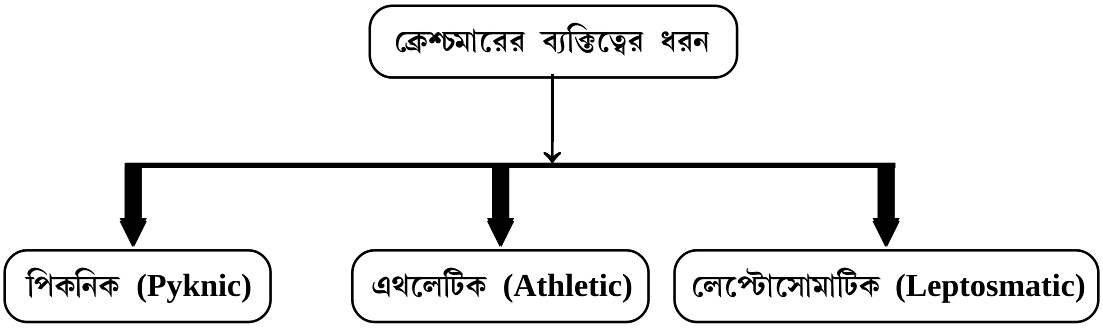
ক্রেশ্চমারের ব্যক্তিত্বের ধরন
পিকনিক (Pyknic)
এথলেটিক (Athletic)
লেপ্টোসোমাটিক (Leptosmatic)

A. পিকনিক (Pyknic) :

দৈহিক বৈশিষ্ট্য (Physical Characteristics) :

★ এরা সাধারণ বেটেখাটো (stocky), মোটা, মাংসবহুল ধরনের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়।

ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য (Personality Traits) :

দৈহিক গঠন অনুযায়ী এদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হল—

❖ এরা সাধারণত সামাজিক হয়।

❖ এরা সর্বদা হাসি-উচ্ছল থাকে।

❖ এরা যে-কোনো বিষয়কে সহজেই মেনে নিতে পারে।

❖ এরা প্রকৃতিগত ভাবে ভালো হয়।

❖ এরা বন্ধুত্বপ্রিয় হয়।

B. এথলেটিক (Athletic) :

দৈহিক বৈশিষ্ট্য (Physical Characteristics) :

★ এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য সামঞ্জস্যপূর্ণ, শক্তিশালী, পেশিবহুল সুঠাম গঠনের অধিকারী।

ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য (Personality Traits) :

ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে—

❖ এরা উদ্যমী ও শক্তিশালী হয়।

❖ এরা যে-কোনো কাজে আশাবাদী (optimistic) হয়।

❖ এরা সমস্ত রকম পরিবেশের মধ্যে সুসামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারে।

C. লেপ্টোসোমাটিক (Leptosomatic) :

দৈহিক বৈশিষ্ট্য (Physical Characteristics) :

★ এরা দৈহিক গঠনের দিক থেকে রোগা লম্বাটে, দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে।

ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য (Personality Traits) :

দৈহিক গঠনের জন্য এদের ব্যক্তিত্বের ধরন হল—

❖ এরা প্রকৃতিগত ভাবে অসামাজিক হয়ে থাকে।

❖ এরা নিজেদেরকে আড়ালে এবং সংরক্ষিতভাবে রাখতে চায়।

ইয়ুং-এর শ্রেণিবিভাগ (Jung’s Classification) :

মনোবিদ ইয়ুং (C G Jung) ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপের কথা বলেছেন—

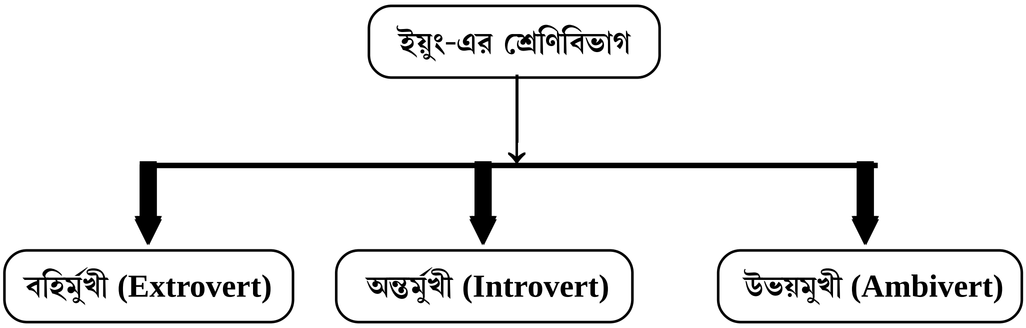
ইয়ুং-এর শ্রেণিবিভাগ
বহির্মুখী (Extrovert)
অন্তর্মুখী (Introvert)
উভয়মুখী (Ambivert)

I. বহির্মুখী (Extrovert) :

এদের প্রাণশক্তি এত বেশি যে এরা বহির্জগতের কর্মকোলাহলেই অংশগ্রহণ করতে বেশি ভালোবাসে। এরা সবসময় প্রাণখোলা, এরা অত্যন্ত সামাজিক এবং সামাজিক যে-কোনো

কাজে যোগদান করতে ভালোবাসে। এরা অত্যন্ত চটপটে এবং কাজ করতে ভালোবাসে। এরা যে কোনো পরিবেশে খুব সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। এরা সাধারণত খুব আবেগপ্রবণ হয়।

II. অন্তর্মুখী (Introvert) :

এদের প্রাণশক্তি অন্তর্মুখী। এরা নিজেদের মধ্যেই থাকতে ভালোবাসে। বর্হিজগতের প্রতি এদের আকর্ষণ নেই বললেই চলে। এরা আত্মকেন্দ্রিক, উদাসীন, স্বার্থপর, আত্মসচেতন, চিন্তাশীল, আবেগপ্রবণ এবং সংবেদনশীল হয়। এরা অত্যন্ত অসামাজিক হয়। নিজের মধ্যেই নিজেকে লুকিয়ে রাখতে ভালোবাসে। এরা আত্মবিশ্লেষণ করতে পারে কিন্তু নতুন পরিবেশে সংগতিবিধান করতে পারে না। এরা কল্পনাপ্রবণ হয় এবং দিবাস্বপ্নে বিভোর থাকে।

III. উভয়মুখী (Ambivert) :

এরা অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী—এই উভয় শ্রেণির মধ্যবর্তী। অর্থাৎ, এরা চরম অন্তর্মুখীও নয় আবার চরম বহির্মুখীও নয়। এরা একদিকে যেমন আত্মসচেতন, অপরদিকে তেমনি সামাজিক। এরা পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের আচরণ পরিবর্তন করতে পারে। বেশিরভাগ মানুষই এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিত্বের সামাজিক মূল্যবোধের দিকে থেকে এরা আদর্শস্থানীয়।

ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্বের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Freud's personality) :

মনোবিদ ফ্রয়েড বিশেষ এক দিক থেকে ব্যক্তিসত্তার শ্রেণীবিভাগ করেছেন। ফ্রয়েড মানুষের যৌনশক্তি (libido) বিকাশের ধারার বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তার শ্রেণীবিভাগ করেছেন। অর্থাৎ ব্যক্তির যৌনতার (sexuality) দিক থেকে এই শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যৌন জীবনের বিকাশের পথে বিশেষ বাধা বা নিয়ন্ত্রণ থেকে এই ধরনের ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টি হয়। যেমন—

প্রথমত : মৌখিক রতিপ্রবণ শ্রেণী (Oral-erotic type) :

যৌন শক্তির (libido) বিকাশের প্রথম পর্যায়ে শিশু তার যৌন আকাঙ্ক্ষাকে চোষণের (sucking) দ্বারা চরিতার্থ করে। সেই অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তির বিকাশ স্থিরীকৃত (fixation) হয় তা হলে তার এই ধরনের ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে। এদের বৈশিষ্ট্য হল—এরা নৈরাশ্যবাদী এবং হিংসাপরায়ণ হয়। জীবনের ব্যর্থতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য শিশুদের মত আচরণ করে। ফ্রয়েড এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের আবার দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—সক্রিয় টাইপ (active oral type) এবং নিষ্ক্রিয় টাইপ (passive oral type)।

দ্বিতীয়ত : পায়ু-রতিপ্রবণ শ্রেণী (Anal-erotic type) :

যৌনতা বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে, অর্থাৎ যৌন আকাঙ্ক্ষা যখন পায়ুর সক্রিয়তার মাধ্যমে চরিতার্থ হয়, তখন যদি কারও যৌন শক্তি স্থিরীকৃত হয়, তা হলে তারা এই ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। এই ধরনের ব্যক্তিসত্তাকেও আবার ফ্রয়েড দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এক দল থাকে, উচ্ছৃঙ্খল ধর্ষণকামী এবং অপর দল সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয়। প্রথম দল বিশেষভাবে অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়।

তৃতীয়ত : স্বাভাবিক রতি প্রবণ শ্রেণি (Genital type) :

এই ধরনের ব্যক্তিসত্তার অধিকারীদের যৌনজীবন স্বাভাবিক হয় এবং তারা স্বাভাবিক মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

মানব জীবনে ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব বা তাৎপর্য (Significance of Personality in Human life) :

শিশুর জন্মবস্থায় কোন ব্যক্তিসত্তা থাকে না। কিন্তু ধীরে ধীরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অভিযোজন করতে গিয়ে সে কতকগুলি স্বতন্ত্র আচরণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। এর ফলে তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ শুরু হয়। এই ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তির বংশগতি (heredity) এবং পরিবেশের (environment) পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে গড়ে ওঠে। সুতরাং, ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নির্ণয়ে, পরিবেশের মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষা পরিবেশ বা বিদ্যালয়, শিশুর জীবন-পরিবেশের একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে। তাই তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ অনেকাংশে তার বিদ্যালয় পরিবেশ বা শিক্ষা পরিবেশের উপর নির্ভর করে। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ স্যার পার্শি নান্ (Nunn) শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের বিকাশ। তিনি 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য' (individuality) বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা ব্যক্তিসত্তারই নামান্তর মাত্র। তা হলে এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে শিক্ষার উদ্দেশ্যই হল ব্যক্তিসত্তার বিকাশ।

মানব জীবনের সঠিক দিক নির্ণয় ব্যক্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী তার সামাজিক স্থান নির্ণয় হয়। মানবজীবনে ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব আলোচিত হলো—

আত্মবিশ্বাস জাগায় (Builds confidence) :

একজন মহান ব্যক্তিত্ব আপনার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেয়। যখন আপনি জানেন যে আপনি যথাযথভাবে সাজসজ্জা এবং সুসজ্জিত, এটি একজন ব্যক্তির সাথে দেখা করার সময় আপনাকে কম উদ্বিগ্ন করে তোলে। সঠিক জিনিসগুলি জানা এবং নিজেকে কীভাবে পরিচালনা করতে হয় তা আপনার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তুলবে। আপনি যদি পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে থাকেন এবং পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে থাকে তবে আপনার সেরা পারফরম্যান্স দেওয়া আপনার পক্ষে সত্যিই সহজ হয়ে যায়। আপনার ব্যক্তিত্ব থেকে

আত্মবিশ্বাস আপনাকে একটি উৎসাহ দেয় যা আপনার জন্য সহজতার পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যায় এবং আপনি আপনার সমস্ত উদ্বেগ এবং ভয় নিয়ন্ত্রণ করতে এবং নির্ভীকভাবে কাজ করতে সক্ষম হন।

যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি (Development of Communication Skill) :

ব্যক্তিত্ব বিকাশের সময় যোগাযোগ দক্ষতা উন্নত করার জন্য অনেক জোর দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনের জন্য ভাল যোগাযোগ দক্ষতা থাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লোকেরা আপনার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হলে আপনি যা বলেন তার প্রতি আরও গ্রহণযোগ্য হয়। মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতাও ব্যক্তিত্ব বিকাশের অংশ, আপনার বক্তৃতা উন্নত করা আপনার বার্তার প্রভাবকে শক্তিশালী করবে। কথা বলার এবং ভাষার দক্ষতার পাশাপাশি উচ্চারণ এবং শব্দভাণ্ডার উন্নত করার উপর অনেক জোর দেওয়া হয়। একই সময়ে, কার্যকর যোগাযোগের মধ্যে একজন ভালো শ্রোতা হওয়াও অন্তর্ভুক্ত।

ইতিবাচক মনোভাব গঠন (Forming positive attitude) :

জীবনে অগ্রগতির জন্য ইতিবাচক মনোভাব সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। ইতিবাচক মনোভাবের একজন ব্যক্তি সর্বদা উজ্জ্বল দিকের দিকে তাকায় এবং সর্বদা একটি উন্নয়নমূলক পথে থাকে। নেতিবাচক মনোভাবের একজন ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে একটি সমস্যা খুঁজে পায়। আশেপাশের লোকেদের ঘাঁটাঘাঁটি এবং সমালোচনা করার পরিবর্তে, পুরো পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করুন এবং এর জন্য একটি উপযুক্ত সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, সমস্যা থাকলে তার সমাধানও থাকতে হবে। হতাশাহীন পরিস্থিতিতেও ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা ব্যক্তিত্ব বিকাশমূলক কর্মসূচির অংশ।

বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা (Makes it believable) :

একটি সঠিক ড্রেসিং সেন্স থাকা এবং আপনার জন্য সঠিক পোশাক বাছাই করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি একটি বই এর প্রচ্ছদ দ্বারা বিচার করবেন না এই কথা বলা সত্ত্বেও, লোকেরা তাদের পোশাক এবং এটি কীভাবে পরিধান করা হয় তা দ্বারা লোকেদের বিচার করার প্রবণতা রাখে। এছাড়াও, আপনার পোশাক আপনার সমগ্রিক চেহারা এবং আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও একটি বড় ভূমিকা পালন করে।

ব্যক্তিত্বের উন্নতি (Personality improvement) :

প্রতিযোগিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উচ্চ একাডেমিক ফলাফলের অধিকারী এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে ইচ্ছুক প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সংখ্যা কম নয়। আজকাল একা প্রতিভা এবং কঠোর পরিশ্রম দিয়ে জিততে পারবেন না, এই দুটি ছাড়াও ভাল ব্যক্তিত্বেরও প্রবল প্রয়োজন রয়েছে। ব্যক্তিত্ব বিকাশ সাফল্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা আপনাকে অবশ্যই আপনার জীবনে সফল হতে হবে। আপনি যাদেরকে মহান ব্যক্তিত্বের মডেল হিসাবে দেখেন তাদের বেশিরভাগই তাদের প্রাকৃতিক

বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। ব্যক্তিত্বের বিকাশ আপনাকে একটি চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং আপনাকে বাকিদের থেকে আলাদা করে তোলে।

সুস্থ শরীর (Healthy body) :

ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল চেহারা এবং শারীরিক স্বাস্থ্য। ভালো ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি সুস্থ জীবনের জন্য ভালো শারীরিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা খুবই জরুরি। একটি রোগে ভারাক্রান্ত শরীর অন্যদের জন্য করুণা পেতে পারে কিন্তু সেই ব্যক্তির পক্ষে একটি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা খুব কঠিন। নিয়মিত ব্যায়াম করা এবং একটি সুস্থ শরীর বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি স্বাস্থ্যকর এবং স্মার্ট চেহারা একটি প্রভাব তৈরি করার জন্য একেবারে অপরিহার্য।

৪.৪ ব্যক্তিত্ব বিকাশের মূল তত্ত্ব (Basic Theories of Personality Development)

সদ্যোজাত শিশুর কোন ব্যক্তিসত্তা থাকে না। তার কারণ তখনও পর্যন্ত সে পরিবেশের সঙ্গো সঠিকভাবে অভিযোজন শুরু করেনি এবং ব্যক্তিসত্তার পরিচায়ক কোন আচরণধারা গ্রহণ করেনি। তবে শিশু কতকগুলি সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়। দৈহিক, মানসিক সব রকম সম্ভাবনাই তার ভেতর থেকে এবং পরিবেশ তার উপর ক্রিয়াশীল হলে তার বিকাশ ঘটে। তাই ব্যক্তিসত্তা (personality) জন্মগতসূত্রে প্রাপ্ত নয়, ব্যক্তিসত্তা বিকাশনির্ভর। মনোবিদ্ আলপোর্ট (Allport)। এ প্রসঙ্গো আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, জন্মমুহূর্তে শিশুর মধ্যে তার সব গুণই বর্তমান থাকে; কিন্তু পরিপূর্ণ সামাজিক ও নৈতিক জীবনের অধিকারী সে বিকাশের মাধ্যমে হয়। এই বিকাশের ধারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন পরিসরের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। আর এই বিকাশের পথে বিভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হয়। তাই ব্যক্তিসত্তা স্থির কোন মানসিক গুণ নয়, ব্যক্তিসত্তা পরিবর্তনশীল এবং বিকাশমান সত্তা। কিন্তু তা হলেও প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তা একটি মূল সূত্রকে কেন্দ্রকরে বিকাশ লাভ করে তার ফলেই আমাদের পক্ষে ব্যক্তিসত্তার অনুশীলন করা সম্ভব হয়। সাধারণতঃ সামগ্রিক জীবন বিকাশে যে সব প্রক্রিয়া সহায়তা করে, ব্যক্তিসত্তা বিকাশেও তারা সাহায্য করে। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ধারা অনুশীলন করে মনোবিদ আলপোর্ট এ রকম 14টি কৌশলের কথা বলেছেন। এগুলিকে তিনি ব্যক্তিসত্তা বিকাশের বিভিন্ন দিক (Aspects of growth) হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছেন। পাঠ্যক্রম অনুযায়ী নিম্নে ব্যক্তিত্বের দুটি তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করা হলো এবং তাদের শিক্ষাগত তাৎপর্য দেওয়া হল। যথা (1) আলপোর্টের ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণ তত্ত্ব (Allport’s theory of personality traits) এবং (2) আইজ্যাঙ্কের সংলক্ষণ তত্ত্ব (Eyesenk’s Personality Trait Theory)।

৪.৪.১ আলপোর্টের ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণের তত্ত্ব (Allport's theory of personality traits) :

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের সংজ্ঞা নিরূপণে মনোবিদদের মধ্যে যেরকম মতভেদ দেখা গেছে, তেমনি তার স্বরূপ বিশ্লেষণেও তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন মনোবিদ তাই বিভিন্নভাবে সংলক্ষণের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। এনাদের মধ্যে আলপোর্ট ছিলেন অন্যতম।

আলপোর্টের সংলক্ষণের শ্রেণিবিভাগ (Allport's Classification) :

আলপোর্ট একজন প্রখ্যাত সংলক্ষণবাদী মনস্তাত্ত্বিক। ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলপোর্টের গবেষণা মনোবিদ গণের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। আলপোর্ট মানুষের সংলক্ষণগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেন।

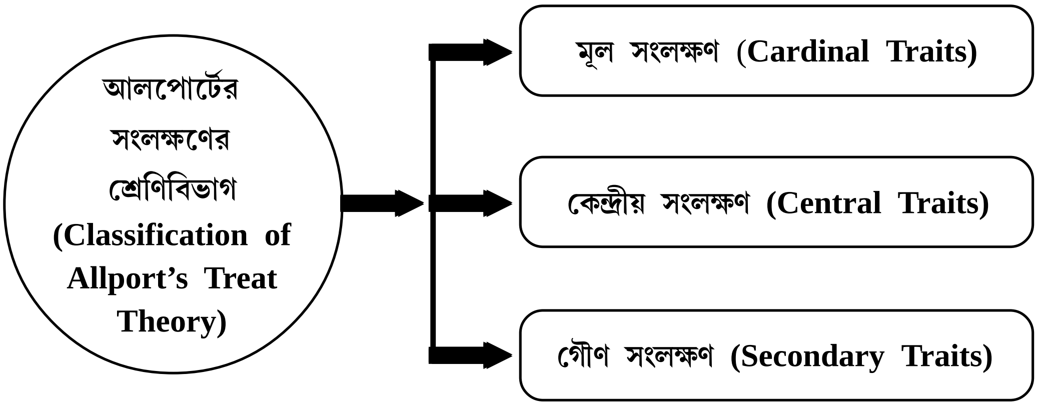
আলপোর্টের সংলক্ষণের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Allport's Treat Theory)
মূল সংলক্ষণ (Cardinal Traits)
কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ (Central Traits)
গৌণ সংলক্ষণ (Secondary Traits)

মূল সংলক্ষণ (Cardinal Traits) :

ব্যক্তির প্রায় সব আচরণের মধ্যে যে সংলক্ষণগুলি দেখা যায় তাকে বলা হয় মূল সংলক্ষণ। এই ধরনের সংলক্ষণ সকলের মধ্যে থাকে না, কিন্তু যার মধ্যে থাকে তার মধ্যে তীব্রভাবে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন। কোনো কোনো ব্যক্তির নিকট জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়া এমন পর্যায়ে চলে যায় যে সমস্ত জীবনে প্রতিটি আচরণের গতি-প্রকৃতি এই আকাঙ্ক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে মনে রাখতে হবে, এই সংলক্ষণ সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ হলেও এটা ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত ব্যক্তিত্ব নয়।

কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ (Central Traits) :

কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ বলতে বোঝায় সেই ধরনের সংলক্ষণ যার ব্যাপ্তি মূল সংলক্ষণের মতো নাহলেও যার মধ্যে ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। এগুলি অবশ্যই মূল সংলক্ষণের মতো সাধারণধর্মী নয়। এই ধরনের কতকগুলি সংলক্ষণ ব্যক্তির নির্দিষ্ট আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই সংলক্ষণগুলি সকলের মধ্যে থাকে,

যেমন—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, উদ্যোগী, বিশ্বাসযোগ্যতা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ মূল সংলক্ষণের রূপ নিতে পারে যদি তা আচরণকে তীব্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

গৌণ সংলক্ষণ (Secondary Traits) :

এই সংলক্ষণগুলির বৈশিষ্ট্য হল কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ অপেক্ষা ব্যাপ্তি কম, অল্পক্ষণ স্থায়ী এবং এদের ব্যবহারও কম। এই সংলক্ষণগুলি অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক উদ্দীপক দ্বারা উদ্দীপিত হয় এবং এদের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপ্তিও কম।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সংলক্ষণের এই শ্রেণিকরণ অনুমানমূলক, কোনো রাশিবিজ্ঞান বা বিজ্ঞানগ্রাহ্য নয়। আলোচনা এবং সহজভাবে বোঝানোর জন্যই এই শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। আলপোর্টের মতে, ব্যক্তিভেদে সংলক্ষণগুলির তীব্রতা ও বিস্তারে তারতম্য দেখা যায়। কোনো দুটি ব্যক্তির আচরণ শতকরা একশো ভাগ সদৃশ বা একই রকম হয় না। প্রতিটি ব্যক্তিই পরিবেশের সঙ্গে নিজস্ব ভঙ্গিতে অভিযোজন করে। প্রতিটি ব্যক্তিই অভিযোজনে অনন্যতা প্রকাশ করে।

সংলক্ষণ মতবাদের সমালোচনা (Criticism of Trait Theory) :

বর্তমানে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ মতবাদ মনোবিদদের দ্বারা বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। যেমন—

★ বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মনোবিদ্‌গণ একমত হতে পারেননি।

★ সংলক্ষণ সম্পর্কে বলা হয় যে এটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করে এবং এটি অপরিবর্তনীয়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতেও এর কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে ‘বন্ধুত্ব’ যদি একটা সংলক্ষণ হয়, তাহলেও সে জীবনের সমস্ত পরিস্থিতিতেই বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে পারে না। সুতরাং সংলক্ষণ কখনোই অপরিবর্তনীয় নয়, কারণ ব্যক্তিত্বের মধ্যেই পরিবর্তনশীলতা বর্তমান।।

★ সংলক্ষণের পরিমাপযোগ্যতার মধ্যেও যথেষ্ট অসুবিধা রয়েছে। কারণ, এর ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট একক নেই এবং পরিমাপেরও কোনো নির্দিষ্ট যন্ত্র নেই। সাধারণভাবে খাতা, পেনসিলের সাহায্যে সংলক্ষণের পরিমাপ করা হয়, যাতে যথেষ্ট ভুলের সম্ভাবনা থেকে যায়।

★ সংলক্ষণের পরিমাপের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, কোনো ব্যক্তি যখন কোনো বিশেষ একটি সংলক্ষণের ক্ষেত্রে ভালো স্কোর করে, তবে পরীক্ষক অন্যান্য সংলক্ষণেরও তাকে বেশি স্কোর দেন। এক্ষেত্রে ‘Halo effect’ কাজ করে।

★ সংলক্ষণের পরিমাপ থেকে কোনো ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে কখনোই পরিষ্কার ধারণা করা

যায় না। সংলক্ষণ পরিমাপ করে কেবলমাত্র ব্যক্তির আচরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য করা যায়।

৪.৪.২ আইজ্যাঙ্কের তত্ত্ব (Eysenck Theory) :

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ নিয়ে যে সমস্ত মনস্তত্ত্ববিদ গবেষণা করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জার্মান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ মনোবিদ Hans. J. Eysenck আইজ্যাঙ্কের-এর মতে, সংলক্ষণ হল বিস্তৃত আচরণগত উপাদান, যা ব্যক্তির প্রকৃতিকে বর্ণনা করে। অর্থাৎ সংলক্ষণের দ্বারা ব্যক্তির আচরণগত বৈশিষ্ট্য (যেমন—ব্যক্তি শান্ত বা সহজেই উত্তেজিত) জানা সম্ভব হয়। তিনি একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সংলক্ষণের শ্রেণিক্রম (hierarchy of traits) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর এই তত্ত্বে তিনি ব্যক্তিত্বের উপাদান বিশ্লেষণের সাহায্যে সংলক্ষণের তিনটি মাত্রা সাইকোটিসিজম (Psychoticism), বর্হির্মুখী বনাম অন্তর্মুখী (Extroversion vs introversion) এবং মনোবিকার (Neuroticism) ব্যাখ্যার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর এই তত্ত্বকে PEN মডেলও বলা তিনটি মাত্রা—

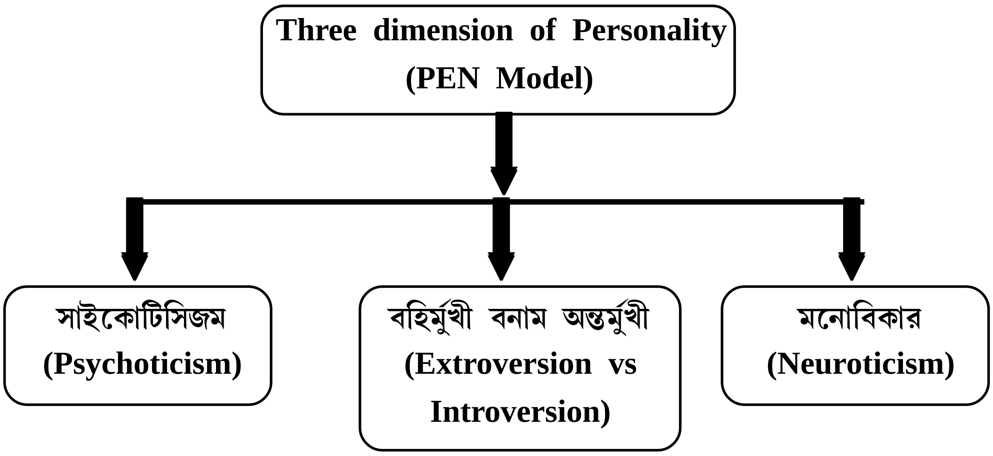
Three dimension of Personality (PEN Model)
সাইকোটিসিজম (Psychoticism)
বহির্মুখী বনাম অন্তর্মুখী (Extroversion vs Introversion)
মনোবিকার (Neuroticism)

নিম্নে এই তিনটি ভাগের বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো

A. সাইকোটিসিজম (Psychoticism) :

Eysenck-এর মতে, এই ধরনের ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিরা নিঃসঙ্গ, অসংবেদী, আত্মকেন্দ্রিক, লাজুক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আবেগপ্রবণ এবং সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণে অনিচ্ছুক, দুঃসাহসিক কাজে ভীত হয়ে থাকে।

B. বহির্মুখী বনাম অন্তর্মুখী (Extroversion vs introversion) :

বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের বৈশিষ্ট্য হল—সামাজিক, বহির্মুখী, (outgoing), সংবেদী, আশাবাদী, প্রফুল্ল ইত্যাদি।

অন্যদিকে, অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের বৈশিষ্ট্য হল—শান্ত, চাপা স্বভাবের, চিন্তামূলক, শৃঙ্খলা পরায়ণ, আত্মকেন্দ্রীক ইত্যাদি।

C. মনোবিকার (Neuroticism) :

Eysenck-এর মতে, মানসিক স্থিতিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারীরা স্বাভাবিক হয়ে থাকে। এরা সাধারণত শান্ত, স্থিতিশীল, স্বাবলম্বী হয়ে থাকে। অন্যদিকে মনোবিকারগ্রস্থ ব্যক্তিরা স্বাভাবিকতার বিপরীত হয়ে থাকে। এরা মেজাজী, স্পর্শকাতর, উদ্বিগ্ন স্বভাবের হয়ে থাকে।

শিক্ষাগত ভূমিকা (Educational Implications) :

- ❖ Eysensk এর তত্ত্বে, ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন মাত্রাকে জানা সম্ভব হয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের ধরনগুলি সম্পর্কে অবগত হতে পারলে, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের ধরনগত পার্থক্য ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা দিতে পারবেন।
- ❖ এই তত্ত্বের সাহায্যে ব্যক্তির আচরণ সংগঠনের পর্যায় বা স্তর সম্পর্কে জানা সম্ভভ হয়। শিক্ষার্থীর কোনো নতুন আচরণ সংগঠনে এই তত্ত্বকে শিক্ষকগণ কাজে লাগাতে পারেন।
- ❖ ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন মাত্রাকে জেনে শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষের মানসিক অস্থিতিশীল শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে তার সঠিক নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে পারেন।

★ ব্যক্তিত্বের পরিমাপ (Measurement of Personality) :

ব্যক্তিত্বের পরিমাপ ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক উভয় উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি ও গঠনের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা অথবা ব্যক্তিত্বে সামঞ্জস্যতাজনিত সমস্যার সমাধানে এবং শিক্ষার্থীদের সু-ব্যক্তিত্ব গঠনের নির্দেশনা দেওয়ার প্রয়োজনে ব্যক্তিত্বের পরিমাপ (measurement of personality) করা দরকার। একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সু-সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে ব্যক্তিত্বের দুর্বল বিষয়গুলি, যেমন—পরিমাপ করা প্রয়োজন, তেমনি অন্তর্নিহিত শক্তি (ego-strength) সম্পর্কেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব নির্বাচনে বা দায়িত্বপূর্ণ কাজে দক্ষ ব্যক্তিত্বের নির্বাচনের প্রয়োজনেও ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করা প্রয়োজন।

বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Analytical Method) :

বিশ্লেষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল এখানে ব্যক্তিত্বের অন্তভুক্ত প্রলক্ষণগুলিকে পৃথকভাবে পরিমাপ করা হয় এবং পরে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা হয়। বিশ্লেষণ পদ্ধতি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত।

সাক্ষাৎকার (Interview) :

এখানে পরিমাপক সামনা-সামনি কথাবার্তার মাধ্যমে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ

করেন। সাক্ষাৎকার চার রকমের হতে পারে আদর্শায়িত (Standardised), অ-আদর্শায়িত (Non-standardised), অংশত (Part) ও সম্পূর্ণ (Exhaustive)। প্রথম ক্ষেত্রে, ব্যক্তিকে কীভাবে এবং কী কী জিজ্ঞাসা করা হবে তা পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট থাকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট থাকে না। সাক্ষাৎকারের সময়ই প্রয়োজন অনুযায়ী সব কিছু ঠিক করা হয়। বর্তমানে আদর্শায়িত উপায়টি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কারণ এক্ষেত্রে সমগ্র পরিস্থিতিটি পরিমাপকের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। অ-আদর্শায়িত বা অনিয়ন্ত্রিত সাক্ষাৎকারে পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠলে ব্যক্তিগত প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি দেখা যায়। তৃতীয় বা অংশত ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিত্বের বিশেষ কোনো দিক পরিমাপ করা হয়, যেমন—বৃত্তি নির্বাচনে বুদ্ধি, সততা, ধৈর্য, সহনশীলতা, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা প্রভৃতি।

পর্যবেক্ষণ (Observation) :

ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে অধ্যয়ন করাকেই পর্যবেক্ষণ বলে। তথ্যসংগ্রহে পর্যবেক্ষণ একটি অকৃত্রিম পদ্ধতি। প্রশ্নগুচ্ছ ও সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে যেসব অসুবিধা দেখা যায় তা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে অনুপস্থিত। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে সংগৃহীত তথ্য অধিকতর নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য। পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট সংগঠিত এবং আধুনিক গবেষণার কৌশল এখানে ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণে সাধারণ অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি থেকে আধুনিক যান্ত্রিক ও ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ায় নিখুঁতভাবে তথ্যসংগ্রহ হতে পারে। পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী পর্যবেক্ষণকে পর্যায়ক্রমে উন্নত ও বিজ্ঞানভিত্তিক করা যেতে পারে। পরীক্ষা আর কিছুই নয়, নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণের নিয়ন্ত্রিত শর্ত বলতে আমরা বুঝি কক্ষের নির্বাচন, যন্ত্রের নির্দিষ্টকরণ, দলভুক্ত শিশুদের নির্বাচন, বিশেষ ধরনের উদ্দীপকের উপস্থাপন এবং বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক।

প্রশ্নগুচ্ছ (Questionnaire or Inventories) :

ব্যক্তিত্ব পরিমাপের একটি পুরোনো ও বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হল প্রশ্নগুচ্ছ। ব্যক্তির মনোভাব, মতবাদ, প্রলক্ষণ প্রভৃতি জ্ঞান হওয়ার উদ্দেশ্যে বিধিসম্মত উপায়ে কতকগুলি প্রশ্ন নির্বাচন করে ব্যক্তিকে উত্তর দিতে বলা হয়। খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে উত্তর দেওয়ার নির্দেশ থাকে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য স্কোরমান নির্ণয় করা হয়। নিম্নে কয়েকটি ব্যক্তিত্ব নির্ণায়ক প্রশ্নগুচ্ছের উল্লেখ করা হল—

A. মিনেসোটা বহুমুখী ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা (Minnesota Multiphasic Personality Inventories) :

এটি একটি বহুল প্রচলিত প্রশ্নগুচ্ছ। 1940 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এটি প্রকাশিত। 1951 খ্রিস্টাব্দে এর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অভীক্ষাটি দুটি আকারে পাওয়া যায়

ব্যক্তিগত ও দলগত। দুটি অভীক্ষাই ১৬ বা তার অধিক বয়সের ব্যক্তিদের উপর প্রয়োগ করা হয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিকতা, রাজনীতি, বৃত্তি, মানসিক বিকার, যৌনতা ইত্যাদির উপর ৫৫০টি বাক্য আছে। বাক্যগুলি পৃথকভাবে এক একটি কার্ডে লেখা থাকে। পরীক্ষার্থী কার্ডগুলি নিয়ে তিনটি ভাগে ভাগ করবে। যেগুলি সে সত্য মনে করবে সেগুলি এক জায়গায়, যেগুলি মিথ্যা বলে মনে করবে সেগুলি আর এক জায়গায় এবং যেগুলি সম্পর্কে সে মতামত দিতে পারছে না সেগুলি আর—এক জায়গায় রাখবে। প্রথম দিকে অভীক্ষাটিকে ৭টি স্কেলে ভাগ করা হয়—হাইপোকনড্রিয়া (Hs), হিস্টিরিয়া (Hy), পৌরুষত্ব নারীসুলভ (Mt), সাইকাসথেনিয়া (Pt), প্যারানইয়া (Pa), সিজোফ্রেনিয়া (Sc), সাইকোপ্যাথিক (Pd)। পরবর্তীকালে এই অভীক্ষা থেকে আরও চারটি পৃথক স্কেল গঠন করা হয়। এইগুলিকে যথার্থতা স্কেল বলে। পরে সামাজিক অন্তর্মুখীতা (Social introversion) বলে আরও একটি স্কেল যুক্ত হয়ে MMPI থেকে মোট ১২টি স্কোর মান পাওয়া সম্ভব হয়।

B. বার্নরয়টারের ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নগুচ্ছ (Bernreuter's Personality Inventories) :

এই অভীক্ষাটি খুবই জনপ্রিয়। তিনি এই অভীক্ষা দ্বারা ব্যক্তিত্বের চারটি প্রলক্ষণকে পরিমাপের কথা বলেন। যথা—মনোবিকার (Neuroticism), আত্মনির্ভরতা (Self sufficiency), কর্তৃত্ব (Dominance) এবং অন্তর্মুখীতা (Introversion)। এই অভীক্ষায় ১২৫টি প্রশ্ন আছে। প্রশ্নগুলি সংগৃহীত হয়েছে Thurstone Personality Schedule, Laird's Introversion Extroversion test, Allport's Ascendance Submission study এবং Benreuter's self sufficient scale থেকে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের তিনটি সম্ভাব্য উত্তর আছে—হ্যাঁ, না ও জানি না। অভীক্ষায় যে চারটি প্রলক্ষণ পরিমাপের ব্যবস্থা আছে তার প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক স্কোর নির্দেশক (Scoring key) আছে। মনোবিকার, আত্মনির্ভরতা, কর্তৃত্ব ও অন্তর্মুখী অভীক্ষাংশের স্কোরকে যথাক্রমে বলা হয়।

C. বেল-এর সংগতিবিধানের প্রশ্নগুচ্ছ (Bell's Adjustment Inventories) :

H. M. Bell এই অভীক্ষাটি প্রস্তুত করেন। এর দুটি অংশ আছে। একটি শিক্ষার্থীদের জন্য ও অপরটি বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য। এই অভীক্ষা দ্বারা অভীক্ষার্থীর অভিযোজনের ক্ষমতা ও অভিযোজন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা আছে কিনা তা জানা যায়। শিক্ষার্থীদের জন্য অভীক্ষাটিতে অভিযোজনের চারটি দিকের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে, যেমন—গৃহ পরিবেশ (Home), স্বাস্থ্য (Health), সামাজিক (Social), ও প্রাক্ষোভিক (Emotional) দিক। বয়স্কদের জন্য উপরিউক্ত চারটি দিক ছাড়াও বৃত্তিমূলক অভিযোজনকে (Occupational adjustment) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

D. আইজেনক-এর ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নগুচ্ছ (Eysenck's Personality Inventories) :

ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক আইজেনক এই অভীক্ষাটি 1963 খ্রিস্টাব্দে বয়স্কদের জন্য প্রস্তুত

করেন। 1966 খ্রিস্টাব্দে ছোটোদের জন্যও তিনি একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন যাকে বলা হয় Junior Eysenck Personality Inventory বা সংক্ষেপে JEPIT। জুনিয়রের ক্ষেত্রে মোট ৬০টি পদ আছে—২৪টি বহিমুখী (Extrovers), ২৪টি মনোবিকার সংক্রান্ত (Neuroticism), ১২টি মিথ্যা ধরবার জন্য। এই অভীক্ষাটি উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা সম্পন্ন (80′–90′) এবং প্রয়োজন মতো যথার্থতার অধিকারী। উপরিউক্ত ব্যক্তিত্ব নির্ণায়ক প্রশ্নাবলি ছাড়াও আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্নাবলির উল্লেখ করাযেতে পারে, যেমন—(ক) Guilford Zimmerman Temparament Survey (খ) California Psychological Inventory।

প্রশ্নগুচ্ছ পদ্ধতির যেমন কতকগুলি সুবিধা আছে তেমনি কিছু অসুবিধাও বর্তমান। সুবিধার মধ্যে **প্রথমত** হল প্রশ্নগুলিকে আদর্শায়িত করা সম্ভব। **দ্বিতীয়ত,** বিভিন্ন ব্যক্তির উত্তর থেকে উত্তরের প্রকৃতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা সম্ভব। **তৃতীয়ত,** একসঙ্গে অনেকের উপর পরীক্ষা করা সম্ভব। **চতুর্থত,** পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী সামনাসামনি থাকলে যে ধরনের লজ্জা, সংকোচ, ভয় পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব পরিমাপে বাধার সৃষ্টি করতে পারে তার অবকাশ এখানে নেই। অসুবিধার মধ্যে **প্রথমত,** উত্তরদাতারা অনেক সময় প্রকৃত উত্তর দেয় না। বিশেষ করে যেগুলিকে সে ক্ষতিকারক বলে মনে করে। **দ্বিতীয়ত,** উত্তর দেওয়ার সময় আবেগের পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না, যা ব্যক্তিত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

E. কেস স্টাডি পদ্ধতি (Case Study Method) :

একজন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ও সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করতে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকমের তথ্য, যেমন—সামাজিক, শারীরিক, জীবনীমূলক, পরিবেশগত, বৃত্তিমূলক ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করাকেই কেস স্টাডি বা ব্যক্তি অধ্যয়ন বলে। বিভিন্ন অভীক্ষা এবং কৌশলের সাহায্যে ব্যক্তি সম্পর্কীয় সামগ্রিক তথ্যসংগহ করাই হল কেস স্টাডি। সমগ্র ব্যক্তিকে জানতে এটি হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভবত সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। কেস স্টাডির উদ্দেশ্য হল তথ্যের সমস্ত উৎসকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি সম্পর্কিত সব তথ্যসংগ্রহ করা। কেস স্টাডিতে তথ্যসমূহকে এমনভাবে সংগঠিত এবং সমন্বিত করা হয় ফলে ব্যক্তি কীভাবে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের চেষ্টা করছে তা জানা যায়। কেস স্টাডির প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে সামগ্রিকভাবে দেখা।

কেস স্টাডি ও কেস হিস্ট্রির মধ্যে অনেক সময় বিভ্রান্তি দেখা যায়। কোনো ব্যক্তির শারীরিক, সামাজিক বা মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কিত ইতিহাসকেই কেস হিস্ট্রি (Case History) বলে। এক্ষেত্রেও ব্যক্তির বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্য সংগ্রহ করা এবং তা অধ্যয়ন করা হয়। কিন্তু ওই সকল তথ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তির বিকাশ সম্পর্কীয় কোনো মন্তব্য করা হয় না। কেস স্টাডিতে সমগ্র ব্যক্তি সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করা হয়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কীভাবে গড়ে উঠেছে তার ব্যাখ্যা করা হয় এবং বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে পরামর্শদাতা তার উন্নত অভিযোজনে পরামর্শ দেন। এক কথায় বলা যায় Case Study এবং Cast History-কে অনেকে একই বলে মনে করেন। তবে বাস্তবে এর মধ্যে পার্থক্য আছে। Case study হল Case History এবং আরও কিছু।

প্রক্ষেপণ অভীক্ষা (Projective Test) :

সাধারণ Projection বা প্রক্ষেপণ বলতে বোঝায় কোনো বিষয়ের উপস্থাপনাকে। ব্যক্তিত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অবচেতন মনের প্রক্ষোভ, জটিলতা, সমস্যা, চাহিদা ইত্যাদি অন্যান্যদের সামনে উপস্থাপনকেই প্রক্ষেপণ বা projection বলা হয়।

ব্যক্তির অবচেতন মনের বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমন—ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, ভয়, সন্দেহ, মনোভাব, যোগ্যতা ইত্যাদির পরিমাপক হিসেবে প্রক্ষেপণ অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের অভীক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির নিকট থেকে অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক ও অসংগঠিত উদ্দীপক উপস্থাপন করে তার প্রতিক্রিয়া নিরূপণ করা হয়। এরূপ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে পরিমাপ করা হয়। প্রক্ষেপণ অভীক্ষার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—

- ★ ব্যক্তিকে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য পরিস্থিতিতে রেখে তার প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা হয়।
- ★ ব্যক্তিকে আত্মপ্রকাশের জন্য প্রণোদিত করা। এখানে কিছু উল্লেখযোগ্য প্রক্ষেপণ অভীক্ষার আলোচনা করা হল

রসার্কের ইন্‌ক ব্লট অভীক্ষা (Rorchach Ink Blot Test) :

এই প্রক্ষেপণ অভীক্ষাটি ব্যক্তির মানসিক বিশৃঙ্খলা (mental disorder) নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে সুইস মনোবিজ্ঞানী Harmann Rorschach (1884–1922) অভীক্ষাটি তৈরি করেন। এই অভীক্ষায় রসার্ক অর্থবিহীন কালির ছাপ সম্বলিত ১০টি কার্ডের ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। অভীক্ষায় ব্যক্তির প্রতিক্রিয়াকে কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। যেমন—

1. পরীক্ষণ ব্যক্তি কতৃক প্রতিটি কার্ডের সামগ্রিক বর্ণনা।
2. কোনো কার্ডের আংশিক বর্ণনা।
3. ছবির রং, আকৃতি বা অন্য কিছুর প্রতি প্রতিক্রিয়া।
4. মানুষ, জীব-জন্তু বা অন্য কিছুর সঙ্গে কালির ছাপের সাদৃশ্য রচনা।

অভীক্ষার ১০টি কালির ছাপ সম্বলিত কার্ড রয়েছে এর মধ্যে ৫টি কালো ও ধূসর বর্ণের, ২টি কালো ও লাল বর্ণের এবং বাকি ৩টি অন্যান্য বর্ণের, যেমন অভীক্ষাটিকে পর্যায় অনুসারে প্রয়োগ করা হয়

1. কার্ডের ছবিগুলিকে ব্যক্তির নিকট একটি নির্দিষ্ট ক্রমে এবং একক সময়ে একটিই উপস্থাপন করা হয়। পরীক্ষণীয় ব্যক্তিকে বসিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অনুযায়ী একটি কার্ড দেওয়া হয় এবং তাকে বলা হয় ‘সে কী দেখল?’
2. প্রতিক্রিয়া করার জন্য ব্যক্তিকে সময় দেওয়া হয় এবং একই বিষয়ের উপর তার ইচ্ছানুযায়ী

একাধিক প্রতিক্রিয়াকে গ্রহণ করা হয়। তাকে কার্ডটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্য উৎসাহিত করা হয়।

3. পরীক্ষক প্রতিটি প্রতিক্রিয়ার জন্য গৃহীত সময়সীমার রেকর্ড বা নথিভুক্তকরণ করে রাখেন।
4. প্রতিটি কার্ড প্রদর্শনের পর বিষয়বস্তুর বা প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ করা হয়।

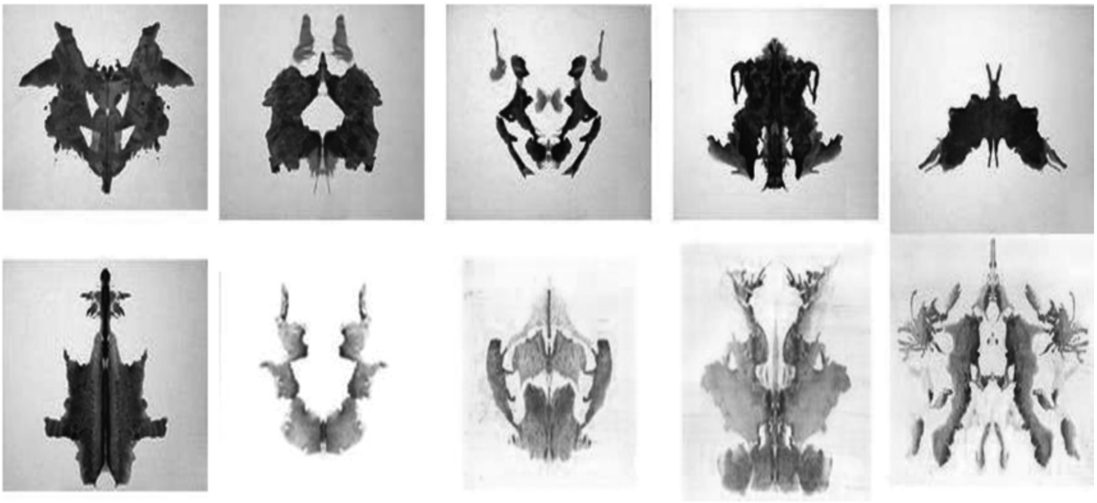

Fig : কালির ছাপ

স্কোরিং বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Scoring analysis and decision making) :

এই অভীক্ষার স্কোর তৈরির জন্য প্রতিক্রিয়াগুলিকে সংকেতযুক্ত করা হয় এবং চারটি ভাগে ভাগ করে স্কোরিং করা হয়—(a) স্থান, (b) বিষয়, (c) মৌলিকত্ব, (d) নির্ধারক।

যেমন—স্থান বা Location বলতে বোঝায়।

W = কার্ডের সামগ্রিক দর্শনকে বোঝায়।

w = কার্ডের না দেখা বিষয়কে নির্দেশ করে।

D = সামগ্রিক বর্ণনাকে নির্দেক করে। ইত্যাদি

- ❖ বিষয় বা content বলতে প্রতিক্রিয়ার বিষয়বস্তুকে বোঝানো হয়।
- ❖ মৌলিকত্ব বা Originality হল প্রতিক্রিয়ার অভিনবত্ব। অর্থাৎ, একই কার্ড দেখে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া যখন প্রত্যেকের থেকে পৃথক বা অভিনব হয় তখন 0 চিহ্ন দ্বারা প্রতিক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করা হয়।

- ❖ নির্ধারক বা determinant বলতে কালির ছাপের রূপ, রং, গতি, ছায়া (shade) কে বোঝানো হয়, যার ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়াকে চিহ্নযুক্ত করা হয় স্কোরিং-এর জন্য। এই অভীক্ষার মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নকারীর সুপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন।

থিম্যাটিক অ্যাপারসেপসান অভীক্ষা (Thematic Apperception Test) :

এখানে বহু অর্থবোধক বাস্তব ছবিকে উদ্দীপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। নির্দেশ অনুযায়ী ওই ছবিটিকে কেন্দ্র করে গল্প গঠন করতে বলা হয়। এই ধরনের অভীক্ষার মধ্যে Thematic Appreciation Test (T.A.T) ও Children Appreciation Test (C.A.T) উল্লেখযোগ্য। মনোবিদ মারে এই অভীক্ষাটি প্রস্তুত করেন। এখানে মোট ১৯টি কার্ড আছে যার মধ্যে একটি একেবারে সাদা। বাকিগুলিতে বহু অর্থযুক্ত বাস্তব ছবি আছে। অভীক্ষার্থীকে উক্ত ছবির প্রেক্ষিতে একটি কাহিনি লিখতে বলা হয় যার মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা থাকবে। সবশেষে সম্পূর্ণ সাদা কার্ডটি দেওয়া হয় যেখানে একটি ছবি কল্পনা করে কাহিনি লিখতে বলা হয়। অনুমান করা হয়, কল্পিত ছবিটিকে কেন্দ্র করে কাহিনি গঠন করার সময় অভিজ্ঞার্থী নিজের চিন্তাভাবনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মানসিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি মানসিক দিকগুলি অবচেতনভাবে প্রকাশ ঘটায়। Ruth Strong-এর মতে, ‘To some extent, the he reads into the pictures his own experience the responses made in the test situation also reveal the person’s attitudes and ways of thinking in the situations.”

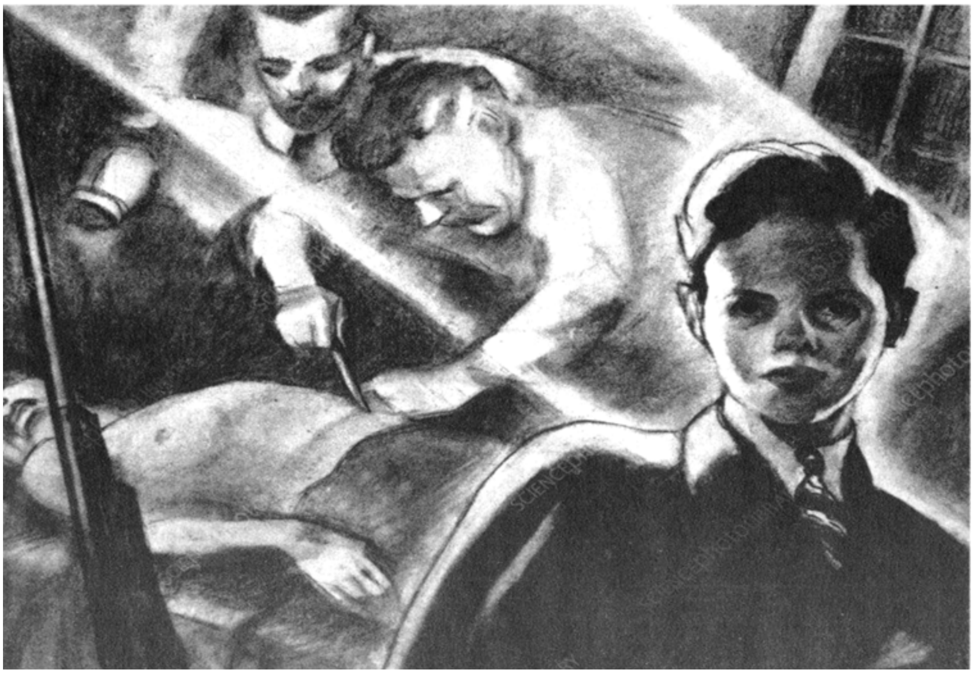

Fig. : Thematic Apperception Test Card

শিশুদের জন্যও মারে এই ধরনের একটি অভীক্ষা গঠন করেন। একেই C.A.T. বলা হয়। এখানে মানুষের ছবির পরিবর্তে জন্তু-জানোয়ারের ছবি ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য সব T.A.T.-এর ন্যায়।

T.A.T.-এর ছবিতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায়—

(১) ছবিগুলি কোনো স্থান-কাল নির্দেশ করে না।

(২) ছবিগুলি সুস্পষ্ট কোনো অর্থ বহন করে না।

(৩) ছবিগুলি কোনো গল্প সূচনা করে মাত্র।

(৪) ছবিগুলি এমনভাবে অঙ্কিত হয়েছে যাতে গল্পের আঙ্গিক সাধারণ মাপের।

(৫) শিশুরাও যাতে ছবিগুলির সাথে একাত্ম হতে পারে সেইভাবে ছবিগুলিকে নির্বাচন করা হয়েছে।

৪.৫ ব্যক্তিত্বের অভিক্ষার শিক্ষাগত প্রয়োগ বা তাৎপর্য (Educational Implication of Personality test) :

A. রাশি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ (Statistical scientific analysis and measurement of personality) :

আজকাল ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য রাশিবিজ্ঞানের কৌশল (statistical analysis) ব্যবহার করা হয়। বিশেষভাবে উপাদান বিশ্লেষণ (factor analysis) পদ্ধতির দ্বারা ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন উপাদান নির্ণয় করার চেষ্টা আধুনিক মনোবিদরা করেছেন। এই ধরনের পদ্ধতিকে আমরা পরিপূর্ণ পদ্ধতি বলতে পারি না কারণ, উপাদান বিশ্লেষণের জন্য ব্যক্তিকে কোন না কোন আদর্শায়িত অভীক্ষা দিতে হয়। এই অভীক্ষার স্কোরকে রাশি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায়। তাই এই ধরনের ব্যক্তিসত্তার অনুশীলন পদ্ধতিকে সহায়ক পদ্ধতি (auxiliary method) বলা যেতে পারে।

B. জীবন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ (Observing life situations and measuring personality) :

ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি ও অভীক্ষা কৃত্রিম পরিস্থিতিতে ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ করার চেষ্টা করে। তাই অনেক মনোবিদ ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের জন্য সংক্ষিপ্ত জীবন পরিবেশ (Miniature life situation) সৃষ্টি করে, তার মধ্যে অনুশীলন করার কথা বলেছেন। কারণ, তাঁরা মনে করেন, ব্যক্তিসত্তাকে প্রকৃতভাবে অনুশীলন করতে হলে তাকে তার স্বাভাবিক

পরিস্থিতিতে বিচার করতে হবে। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিসত্ত্বার বিভিন্ন সংলক্ষণকে অনুশীলন করার জন্য, একটি বিশেষ সময়ে তার প্রাত্যহিক কাজ লক্ষ্য করা হয়; এই অনুশীলনের দ্বারা ব্যক্তির আচরণের সামঞ্জস্যতা (consistency) সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। অনেক সময় একটি ক্ষুদ্রাকারের কর্মপরিস্থিতি সৃষ্টি করে, ব্যক্তিসত্তার প্রতিক্রিয়ার অনুশীলন করে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

C. পরীক্ষণ ও ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ (Testing and measurement of personality) :

অনেক মনোবিদ ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের জন্য পরীক্ষাগারে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি (laboratory Experiment) প্রয়োগ করে থাকেন। এইসব পদ্ধতির দ্বারা ব্যক্তিসত্তার সংবেদনগত ও অনুভূতিমূলক দিক বিশেষভাবে অনুশীলন করা যায়।

D. অনুমান ও ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ (Assumptions and measurements of personality) :

অনেক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের জন্য অনুমানমূলক সিদ্ধান্তের (prediction) ব্যবহার করা হয়। তবে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে অনুমান নির্ভর বলে এর থেকে বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং এই পদ্ধতি থেকে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তার উপর নির্ভর করা যায় না।

E. আদর্শ টাইপ ও ব্যক্তিত্ব পরিমাপ (Ideal Type and Measurement of Personality):

এ ছাড়া, ব্যক্তিসত্তার টাইপ (type) অনুশীলন করে, অনেক সময় তাকে পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। এ সম্পর্কে পূর্বেই আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। ব্যক্তিকে আদর্শ টাইপের (ideal type) দিক থেকে শ্রেণিবিভাগ করার মধ্যে যে বিভিন্ন তরুটি আছে, সে সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

F. গভীরতা বিশ্লেষণ এবং ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ (Depth analysis and Measurement of Personality) :

ফ্রয়েড (Freud) এবং তাঁর অনুগামী মনোবিদগণ ব্যক্তিসত্তা অনুশীলনের জন্য বিশেষ ধরনের এক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, যাকে বলা হয় গভীরতা অনুশীলন (depth analysis)। এই মত অনুযায়ী, ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণের মূলে আছে অবচেতন মন (unconscious mind)। এই অবচেতন মনকে অনুশীলন করার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। যেমন—বিশেষ ধরনের সাক্ষাৎকার (psychiatric interview), মুক্ত অনুষঙ্গ (free association), স্বপ্ন বিশ্লেষণ (dream analysis), সম্মোহন (hypnotism) ইত্যাদি। পরবর্তী কালে মনোবিদ মারে (Murry), এইসব পদ্ধতির গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

৪.৬ সারাংশ (Summary)

আলপোর্ট মনোবিদদের মধ্যে অন্যতম একজন ব্যাক্তিত্ব, যিনি প্রথম ব্যাক্তিত্বের সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ ধারনা প্রদান করেন। পরবর্তীকালে ম্যাসলো কার্ল রজার প্রথম মনোস্তত্ত্ববিদ তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন তত্ত্বের (Theory) উদ্ভাবন করেছেন। এই ইউনিটে আমরা ব্যাক্তিত্ব কী এবং তার বৈশিষ্ট্যগত দিকগুলি আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও প্রথম অংশ মানবজীবনে ব্যাক্তিত্বের গুরুত্ব বা তাৎপর্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে ব্যাক্তিত্বের ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বগুলির মধ্যে আলর্পোটের ব্যাক্তিত্ব বিকাশের তত্ত্ব এবং আইজ্যাঙ্কের পেন মডেল আলোচিত হয়েছে। আলপোর্টের তত্ত্বে মূল সংলক্ষণ (Cardinal Traits) কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ (Central Traits) এবং গৌণ সংলক্ষণ (Secondary Traits) এর মাধ্যমে ব্যাক্তিত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং আইজ্যাঙ্ক তার তত্ত্বে সাইকোটিসিজম (Psychoticism), বর্হিমুখী (Extroverson) এবং মনোবিকার (Neuraticism) এর কথা বলেছেন যা PEN মডেল নামে পরিচিত।

এই অধ্যায়ের শেষে ব্যাক্তিত্ব পরিমাপের বিভিন্ন পরিমাপক পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্লেষণ পদ্ধতি (সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নগুচ্ছ) এবং প্রক্ষেপন পদ্ধতির (রসার্কের ইঙ্ক ব্লট অভিক্ষা থিমেটিক অ্যাপারসেপশন অভিক্ষা) মাধ্যমে ব্যাক্তির ব্যাক্তিত্ব সম্পর্কে ধারনা করা সম্ভব ও সর্বশেষে ব্যাক্তিত্ব অভিক্ষার শিক্ষাগত তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে।

৪.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-assessment Question)

১. ব্যাক্তিত্বের সংজ্ঞা দাও?

২. ব্যাক্তিত্বের প্রকৃতি আলোচনা করো।

৩. ব্যাক্তিত্বের বিভিন্ন টাইপ সম্পর্কে লেখ।

৪. অর্ন্তমুখী ব্যাক্তিত্ব বলকে কী বোঝো?

৫. আইজ্যাঙ্কের পেন (PEN) মডেল ব্যাখ্যা করো।

৬. ব্যাক্তিত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য বর্ণনা করো।

৭. রর্সাকের ইঙ্ক ব্লট অভিক্ষার বর্ণনা দাও।

৮. ব্যাক্তিত্ব পরিমাপকের শিক্ষাগত গুরুত্ব আলোচনা করো।

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008) Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House, Pvt, Lted. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993) Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P., (2001), Educational Psychology", Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3

Mangal, Dr. S. K., (1998) Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana. 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College Distric & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002), Modern Educational Psychology", Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

একক - ৫ ❑ মানুষের ক্ষমতার মনোবিজ্ঞান : ধারণা, বৈশিষ্ট্য এবং প্রকারভেদ (Psychology of Human Abilities : Concept, Characteristics and Basic Types)

গঠন (Structure)

৫.১ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

৫.২ ভূমিকা **(Introduction)**

৫.৩ মানুষের ক্ষমতার মনোবিজ্ঞান : ধারণা, বৈশিষ্ট্য এবং প্রকারভেদ **(Psychology of Human Abilities : Concept, Characteristics and Basic Types)**

- ৫.৩.১ ধারণা **(Concept)**
- ৫.৩.২ বৈশিষ্ট্য **(Characteristics)**
- ৫.৩.৩ মৌলিক প্রকারভেদ **(Basic Types)**

৫.৪ বুদ্ধি : ধারণা, মৌলিক তত্ত্ব (স্পিয়ারম্যান, থর্নডাইক এবং গিলফোর্ট), প্রকারভেদ এবং বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যবহার **(Intelligence : Concept, Basic Theories (Spearman, Thorndike and Guilford), Types and Uses of Intelligence Test)**

- ৫.৪.১ বুদ্ধির ধারণা **(Concept of Intelligence)**
- ৫.৪.২ মৌলিক তত্ত্ব (স্পিয়ারম্যান থর্নডাইক এবং গিলফোর্ড) **(Basic Theories (Spearman, Thorndike and Guilford)**
- ৫.৪.৩ বুদ্ধির অভীক্ষার বিভিন্ন প্রকারভেদ এবং তার ব্যবহার **(Types and Uses of Intelligence Test)**

৫.৫ সৃজনশীলতা : ধারণা, বৈশিষ্ট্য এবং শিক্ষাগত গুরুত্ব **(Creativity : Concept, Characteristics, Significance in Education)**

- ৫.৫.১ সৃজনশীলতার ধারণা **(Concept of Creativity)**

৫.৫.২ সৃজনশীলতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Creativity)

৫.৫.৩ সৃজনশীলতার শিক্ষাগত গুরুত্ব (Educational Significance of Creativity)

৫.৬ সারাংশ (Summary)

৫.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-Assessment Questions)

৫.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

উক্ত ইউনিটটি শেষ হওয়ার পরে শিক্ষার্থীরা যেসব বিষয় জানতে সক্ষম হবে—

- মানুষের ক্ষমতার মৌলিক ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদগুলি জানবে।
- বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে।
- বুদ্ধির বিভিন্ন তত্ত্বগুলি সম্পর্কে ধারণা তৈরি হবে এবং তাদের শিক্ষাগত তাৎপর্য জানবে।
- সৃজনশীলতা বলতে কি বোঝায়, সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হবে।
- সৃজনশীলতার বৈশিষ্ট্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তার গুরুত্ব বলতে পারবে।

৫.২ ভূমিকা (Introduction)

সাম্প্রতিক দশকে মানব ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি খুব দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে মানব ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি যথেষ্ট। মানব ক্ষমতা যে ধীরে ধীরে বহু বছর ধরে সুগঠিত হয়, সে কথা আজ সর্বজনবিদিত। আর এই সমস্ত মানব ক্ষমতা একবার সুগঠিত হয়ে পড়লে, তা ব্যক্তিকে আজীবন ধরে তার বিভিন্ন সামাজিক ও শারীরিক পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। মানব ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা লাভের পর শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সহায়ক উপকরণের সাহায্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াতে পারেন।

নিম্নলিখিত উপবিভাগগুলিতে মানব ক্ষমতার ধারণা, বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

'বুদ্ধি' একটি ধারণা, যা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায়শই ব্যবহার করে থাকি। আমরা প্রায়শই এই ধরনের মন্তব্য করি যে ওই ব্যক্তিটি বেশ বুদ্ধিমান, আবার ওই ব্যক্তিটি একদমই বোকা

ইত্যাদি। শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তার দরুন মানবজাতি প্রাণীকুলের সর্বোত্তম জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু আসলে এই বুদ্ধিমত্তা কি?

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্ন রকম মত পোষণ করেছেন। আবার বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্ন উপাদানকে দায়ী করেছেন, যেগুলি বুদ্ধিমত্তার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৫.৩ মানুষের ক্ষমতার মনোবিজ্ঞান : ধারণা, বৈশিষ্ট্য এবং প্রকারভেদ (Psychology of Human Abilities : Concept, Characteristics and Basic Types)

মানসিক ক্ষমতা (Meaning of Human Ability) :

মানব ক্ষমতা হলো ব্যক্তির আভ্যন্তরীন এক ধরনের দক্ষতা, যা ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট শারীরিক বা মানসিক কার্য সম্পাদন করতে সাহায্য করে। এই সক্ষমতা ব্যক্তি সহজাত সূত্রে প্রাপ্ত করতে পারে বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। তবে, Capacity ও Competence এর সঙ্গে Ability এর ধারণাগত পার্থক্য আছে। সক্ষমতা সাধারণত যে সমস্ত আচরণের পরিবর্তন আনে, তা স্থায়ী হয়। প্রকারগত দিক থেকে সক্ষমতা দুই প্রকারের—

প্রজ্ঞামূলক এবং অঙ্গাসঞ্চালনমূলক ক্ষমতা Cognitive Ability and Psychomotor Ability : তবে এই দুই ধরনের সক্ষমতাই আদতে শিখন ও পরিণমনের মিথস্ক্রিয়ার ফল।

উদাহরণস্বরূপ, যখন কোন একজন শিশু কোন একটি বাক্যের অর্থ বুঝতে পারে তার মানে সেই শিশু ঐ বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের অর্থ পৃথকভাবে বুঝতে সক্ষম। এই ক্ষেত্রে শব্দের অর্থ বোঝা বা ওই বাক্যের বিষয়বস্তুটিকে পরিপূর্ণরূপে বুঝতে পারা, তার Cognitive Ability-র ধারণা দেয়।

অন্যদিকে, কোন একটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যক্তিকে তার যে ক্ষমতা সাহায্য করে তা, Psycho Motor Ability-র আওতাভুক্ত। নিপুণভাবে কোন কাজে সমর্থ হতে গেলে, দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি ব্যক্তিকে arm-hand-mind এর co-ordination রাখা জরুরি।

তাই স্বাভাবিকভাবেই অধিক সক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি কোন কাজ নিপুণভাবে করতে পারেন। দক্ষতা ও সক্ষমতা হলো সেই গুণ, যা ব্যক্তির মধ্যে আগে থেকেই বর্তমান আছে। প্রতিভা হল ব্যক্তির সেই গুণ যা ব্যক্তিকে যোগ্য স্থানে উন্নীত করে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি যে সমস্ত সক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে সেগুলোর পাশাপাশি তার অর্জিত বিভিন্ন সক্ষমতা এবং প্রশিক্ষণ বিশেষ গুরুত্বের অবদান রাখে।

৫.৩.১ মানসিক ক্ষমতার ধারণা (Concept of Mental Ability) :

মানুষের ক্ষমতা হল মানুষের অন্তস্থিত শক্তি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত শক্তি, যা তার মধ্যে

আচরণগত দিক থেকে বিভিন্ন পরিবর্তন আছে। ব্যক্তির এই ক্ষমতা সাধারণত দুই ধরনের হয়—Cognitive এবং Psycho-Motor। যখন কোন একটি শিশু শব্দের অর্থ বুঝে বা ভাষা বুঝে কোন একটি বাক্যের অর্থ বোঝার চেষ্টা করে তখন সে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করে। অন্যদিকে, Psycho Motor ability একজন মানুষকে একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে সাহায্য করে। এই ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা manual skill-এর সাথে জড়িত যে কোনও নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হন। বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মানুষ শিখতে, ধারণা তৈরি করতে, যুক্তি প্রয়োগ করতে এবং যুক্তি প্রয়োগ করার জ্ঞানীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়; যার দ্বারা ব্যক্তি বিভিন্ন সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধানের পথ হিসেবে বিভিন্ন প্রকল্প গঠন করতে সমর্থ হয়। মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে মানুষের ক্ষমতা হিসাবেও ব্যাখ্যা করা হয়, যা জটিল জ্ঞানীয় কৃতিত্ব এবং উচ্চ স্তরের প্রেরণা এবং আত্ম-সচেতনতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মানুষ, শিখতে, ধারণা তৈরি করতে, বোঝার যুক্তি প্রয়োগ করতে এবং যুক্তি প্রয়োগ করার জ্ঞানীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়।

৫.৩.২ মানসিক ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Human Abilities) :

একটি ক্ষমতা বা দক্ষতার যেমন—সাবলীলভাবে ইংরেজি বলার ধারণাকে Co-relation এবং Experimental Research এর মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়। এইভাবে ইংরেজিতে কথা বলার ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের এই একটি ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েই খুব সহজেই অভিযোজনে সক্ষম হয়।

Fleishman And Bartlet (1969), মানুষের ক্ষমতার উপর গবেষণার একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা করে মানব ক্ষমতার পাঁচটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল—

A. সক্ষমতা আসলে শিখন ও পরিণমনের মিথষ্ক্রিয়ার ফলস্বরূপ। যে কোন বিষয়ের ধারণা এবং নীতিগুলি বোঝার জন্য প্রচুর অনুশীলন এবং শেখার প্রয়োজন। একটি শিশুর maturation level সে যা শিখতে পারে, তা সীমিত করে। এইভাবে, জন্ম থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত বিভিন্ন হারে তার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, শৈশবকালে গাণিতিকের তুলনায় মৌখিক বোধগম্যতা আরও দ্রুত বিকাশ লাভ করে।

B. যৌবন অবস্থায় উন্নীত হওয়া পর্যন্ত শিশুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সক্ষমতার বিকাশ ঘটতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ যৌবন অবস্থায় শিশু যে সমস্ত দক্ষতা অর্জন করে, তা সাধারণত চিরস্থায়ী হয়। দক্ষতা বছরের পর বছর বেশ স্থিতিশীল।

C. ক্ষমতা এবং কার্য সম্পাদন একে অপরের পরিপূরক। ব্যক্তির বর্তমান ক্ষমতা, সে যে হারে

নতুন কাজ শিখে তাকে প্রভাবিত করে। এইভাবে, স্থানিক ক্ষমতা এবং গাণিতিক যুক্তিতে উচ্চতর শিক্ষার্থী, পদার্থবিজ্ঞানে উচ্চতর ক্ষমতা অর্জন করে।

D. কোন একজন ব্যক্তি তার কোনো একটি পরিস্থিতিতে অর্জিত ক্ষমতাকে অন্য পরিস্থিতিতে খুব সহজে প্রয়োগ করতে পারেন। এইভাবে, যার সাধারণ ক্ষমতা যত বেশি সে তত বেশি তার স্থানান্তর ঘটাতে সক্ষম। পাটিগণিত গণনা একটি ক্ষমতা, যা শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র গণনা সম্পর্কিত কোন নতুন কাজ শেখার সুবিধা দেয়। আবার, স্থানিক ক্ষমতা কোন শিক্ষার্থীকে তার অর্জিত জ্ঞান গণিত, বিজ্ঞান, প্রকৌশল এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে বিস্তৃত শ্রেণীর কাজ শেখার সুবিধা দেয়।

E. দক্ষতার চেয়ে ক্ষমতা বেশি মৌলিক 'দক্ষতা' শব্দটি একক কাজ বা কাজের দক্ষতার স্তরকে বোঝায়। ড্রাইভিং, সাঁতার, টাইপিং হল দক্ষতার বিভিন্ন স্তরে অর্জিত দক্ষতা। এই দক্ষতাগুলির প্রতিটি অর্জন করার সময় ব্যক্তি একটি ক্রমিক ক্রিয়াকলাপ শিখে এবং দ্রুত ও নিঁখুতভাবে সেগুলি সম্পাদন করে। ব্যক্তির প্রতিটি দক্ষতা ব্যক্তির বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের সাথে জড়িত। খুব দ্রুত আঙুল সঞ্চালনের দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি খুব ভালো typing করতে পারেন বা খুব সুন্দর লিখতে পারেন। Typing করা বা খুব সন্দির করে লিখতে পারা কেবলমাত্র তার cognitive ability-র প্রকাশ করে তা নয়, বরং এটি তার psychomotor ability-র ও প্রকাশক।

৫.৩.৩ মানসিক ক্ষমতার মৌলিক প্রকারভেদ (Basic Types of Human Abilities) :

আমরা এখন জ্ঞানীয় ক্ষমতার প্রকৃতি অনুযায়ী পাঁচটি ভিন্ন মৌলিক ধরনের মানুষের ক্ষমতা সম্পর্কে জানব। এই প্রত্যেকটি ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে অর্জিত হয়—(i) a single unitary ability, (ii) a set of primary abilities, (iii) a larger number of specific abilities, (iv) an independent number of specific abilities related to learning hierarchies, এবং (v) a hierarchical structure involving both general and specific abilities.

(i) সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা বা 'G' একটি একক ক্ষমতা। উদ্দেশ্যমূলক কাজ করার, যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা করার এবং পরিবেশের সাথে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য একজন ব্যক্তির সর্বজনীন ক্ষমতা হিসাবে এটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে।

(ii) থার্স্টোনের অধ্যয়নের (1983) ভিত্তিতে কতগুলি প্রাথমিক মানসিক উপাদান চিহ্নিত করা হয়েছিল (PMA)। তিনি কয়েকটি প্রাথমিক মানসিক ক্ষমতা চিহ্নিত করেছিলেন। তার মতে, এই সমস্ত মানসিক উপাদানগুলি প্রকারগত দিক থেকে পৃথক হলেও গঠনগত দিক থেকে

একই। তিনি মোট যে পাঁচটি প্রধান PMA-র কথা বলেন, সেগুলি হল—(a) verbal meaning, (b) number facility, (c) reasoning, (d) perceptual speed এবং (e) spatial relation.

(iii) Specific Ability সম্পর্কে ধারণা দানের জন্য গিলফোর্ড (1967) তার 'SOI' মডেল তৈরি করেছিলেন। তার মতে, Operation, Content ও Product মিলিয়ে একটি ক্ষমতা তৈরি হয়। তিনি একটি ক্ষমতাকে পাঁচটি Operations, চার ধরনের Content এবং ছয়টি Product এর ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব, তার মতে মোট, 5 × 5 × 6 বা 150টি নির্দিষ্ট ক্ষমতা আছে।

(iv) Divergent Product Ability (Creativity) হল গিলফোর্ড প্রদত্ত Structure of Intellect থেকে প্রাপ্ত একটি নতুন ভাবনা। সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার একক ধারাবাহিকতায় মানুষকে উচ্চ থেকে নিচুতে রাখা যেতে পারে এবং শিক্ষাগত এবং বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রেও ব্যক্তিকে উচ্চ থেকে নিম্ন স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে। কিছু শিক্ষার্থীর মধ্যে divergent thinking ability-র পরিমাণ বেশি হতে পারে, আবার কিছু শিক্ষার্থীর মধ্যে convergent thinking abilityক্ষ্ম-র পরিমাণ বেশি হতে পারে। Divergent thinking ability-র সঙ্গেই সৃজনশীলতার ধারণাটি সংশ্লিষ্ট।

(v) ভার্নন (1950), স্মিথ (1964) এবং অন্যান্য বিভিন্ন মনোবিদ Hierarchical Structure of Abilities প্রণয়ন করেছিলেন। তারা বলেছিলেন general and group factor theory অধিকাংশ মনোবিদ দ্বারা স্বীকৃত হলেও এই তথ্যগুলি ক্ষমতা সমূহের শ্রেণীকরণে ব্যর্থ। তাছাড়া কোনো ব্যক্তির পারদর্শিতার ক্ষেত্রে এই সমস্ত মানসিক ক্ষমতা কতটা কার্যকরী, সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তাই এই সংক্রান্ত বিভিন্ন মনোবিদদের তত্ত্ব অনুমানমূলক বলে বিবেচিত হতে পারে।

I. বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার নির্ধারক (Determinants of Intellectual Abilities) :

বৌদ্ধিক ক্ষমতার মৌলিক নির্ধারকগুলিকে বেইলি (1970) নিম্নরূপে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন :

(a) বংশগতির ভূমিকা, ব্যক্তিদের মানসিক ক্ষমতার স্তর ও বুদ্ধির প্রকৃতি—উভয়কেই একটি অনির্দিষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করতে কাজ করে।

(b) যে পরিবারে শিশুকে লালন-পালন করা হয়, তার আর্থ-সামাজিক পটভূমির অবস্থা বুদ্ধিমত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হতে পারে। এতে পারিবারিক আয়, পিতার শিক্ষা, মায়ের শিক্ষা, পিতার পেশা ইত্যাদির সম্মিলিত প্রভাব রয়েছে।

(c) পরিবেশগত দারিদ্রতা, আপাত দৃষ্টিতে কম বুদ্ধিমত্তার জন্য অবদান রাখে এবং দারিদ্রতা যত বেশি, তার ক্ষতিকারক প্রভাব তত বেশি।

(d) পিতা মাতার হস্তক্ষেপ, অনুপ্রেরণামূলক অবস্থার উন্নতি করতে পারে; বাচ্চাদের শেখার উদ্বেগ কমানোর এবং অপুষ্টি দূর করার জন্য আরও ভাল সুযোগ তৈরি করে I.Q. স্কোর বাড়ায়।

(e) Emotional Climate, যেখানে শিশুকে লালন-পালন করা হয়, তা তার মানসিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। কোন শিশুর I.Q. স্কোর সেই শিশুর গৃহপ্রবেশের emotional climate দ্বারা প্রভাবিত হয়।

II. শিক্ষায় মানবিক ক্ষমতার তাৎপর্য (Significance of Human Abilities in Education) :

অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে বহুবছর ধরে মানুষের ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। ক্ষমতাগুলি Cognitive এবং Psychomotor domain এ বিভিন্ন দক্ষতা অর্জনে শিশুকে পারদর্শী করে তোলে। নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা এবং ফ্যাক্টর বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'ক্ষমতা' বৈজ্ঞানিকভাবে চিহ্নিত করা হয়। অনেক শিক্ষার্থী কর্মক্ষমতা, সতর্ক পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমেও সক্ষমতা চিহ্নিত করা হয়।

অনেক মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার সংগঠন সম্পর্কে ধারণা তৈরি করেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মডেলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো—এই মডেল অনেকগুলি পৃথক ক্ষমতা সনাক্তকরণের চেয়েও বুদ্ধিমত্তার প্রকৃতির অনুশীলন ও সৃজনশীল ক্ষমতার লালন-পালনের উপর জোর দেয়। Cognitive Ability শিক্ষাগত কৃতিত্বের মাধ্যমে বিচার করা যায় এবং project শিক্ষার মাধ্যমে এর লালন-পালন করা যেতে পারে। এইভাবে, মানুষের ক্ষমতা সনাক্তকরণ এবং তালিকাভুক্ত করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অগ্রগতি করা হচ্ছে।

৫.৪ বুদ্ধি : ধারণা, মৌলিক তত্ত্ব (স্পিয়ারম্যান, থর্নডাইক এবং গিলফোর্ড), প্রকারভেদ এবং বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যবহার (Intelligence : Concept, Basic Theories (Spearman, Thorndike and Guilford), Types and Uses of Intelligence Test)

৫.৪.১ বুদ্ধির ধারণা (Concept of Intelligence) :

মানব বুদ্ধিমত্তার অধ্যয়নটি 1800 দশকের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল, যখন স্যার ফ্যান্সিস গাল্টন 'বুদ্ধিমত্তা' অধ্যয়নকারী ব্যক্তিদের প্রথম একজন হয়ে ওঠেন। তিনি একজন প্রতিভাধর ব্যক্তির ধারণার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তাই তিনি প্রতিক্রিয়ার সময় এবং অন্যান্য শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাপ করার

জন্য একটি ল্যাব তৈরি করেছিলেন, যাতে তার অনুমান পরীক্ষা করা যায় যে—'বুদ্ধিমত্তা' একটি সাধারণ মানসিক ক্ষমতা, জৈবিক বিবর্তনের একটি ফসল, যেমন ধারণাটি ডারউইন দ্বারা দেওয়া হয়েছিল।

গাল্টন তত্ত্ব দিয়েছিলেন, যে দ্রুততা এবং অন্যান্য শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি কোন একজন ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা বা সাধারণ মানসিক ক্ষমতা সম্পর্কে আভাস প্রদান করে (Jensen, 1982)। এইভাবে, গ্যাল্টন প্রতিক্রিয়ার সময় হিসাবে বুদ্ধিমত্তাকে কার্যকর করেছিলেন। Operationalization হল গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, যার মধ্যে একটি অ-পরিমাপযোগ্য ঘটনা (যেমন—বুদ্ধিমত্তা), পরিমাপযোগ্য শর্তে (প্রতিক্রিয়া সময় হিসাবে) সংজ্ঞায়িত করা, ধারণাটিকে অভিজ্ঞতামূলকভাবে অধ্যয়ন করার অনুমতি দেয় (Crowthre-Heyck, 2005)। ল্যাবরেটরি সেটিংয়ে বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গ্যালটনের অধ্যয়ন এবং বুদ্ধিমত্তার উত্তরাধিকার সম্পর্কে তার তত্ত্বকরণ এই ক্ষেত্রে কয়েক দশক ধরে ভবিষ্যতের গবেষণা ও বিতর্কের পথ প্রশস্ত করেছে।

মূলত বুদ্ধিমত্তা হল চিন্তা করার ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা থেকে শেখার, সমস্যা সমাধান করা এবং নতুন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, সাধারণ বুদ্ধিমত্তা (g) নামে একটি ধারণা রয়েছে, যা মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার সামগ্রিক পার্থক্যের জন্য দায়ী।

বুদ্ধিমত্তা এবং যোগ্যতার ধারণা দুটি যেহেতু খুব কাছাকাছি তাই বুদ্ধিমত্তা এবং যোগ্যতার মধ্যে একটি পার্থক্য করা উচিত। বুদ্ধিমত্তা হল একজন ব্যক্তির ক্ষমতা বা সম্ভাবনা, যেখানে যোগ্যতা হল সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে কোন ব্যক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কি কি অর্জন করেছে। যোগ্যতা হল কিছু নির্দিষ্ট জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের জন্য একজন ব্যক্তির ক্ষমতার নির্দেশক বৈশিষ্ট্যগুলির সংমিশ্রণ।

বুদ্ধির সংজ্ঞা (Definition of Intelligence) :

বুদ্ধিমত্তার সংজ্ঞা হিসেবে সবথেকে গৃহীত মতটি হলো যে—বুদ্ধিমত্তা হল বোঝার এবং যুক্তির একটি সাধারণ ক্ষমতা, যা ব্যক্তিকে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করে। সর্বজন স্বীকৃত সর্বাধিক গৃহীত বুদ্ধিমত্তার সংজ্ঞা হল—"বুদ্ধিমত্তা হল একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্যমূলক কাজ করার, যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা করার এবং তার পরিবেশের সাথে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা। এটি একজন ব্যক্তির তার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং তার শেখার এবং বিমূর্ত চিন্তা করার ক্ষমতা অর্ন্তভুক্ত করে।" বুদ্ধিমত্তাকে অনেক উপায়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে : (a) উচ্চ স্তরের ক্ষমতা (যেমন—বিমূর্ত যুক্তি), (b) মানসিক উপস্থাপনার ক্ষমতা, (c) সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, (d) সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, (e) শেখার ক্ষমতা, (f) মানসিক জ্ঞান, (g) সৃজনশীলতা এবং (h) পরিবেশের চাহিদাগুলোর সঙ্গো কার্যকরীভাবে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা।

মনোবিজ্ঞানী রবার্ট **স্টার্নবার্গ** বুদ্ধিমত্তাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন—

“The mental abilities necessary for adaptation to, as well as shipping and selection of any environmental context”

মনোবিদ স্টার্ন (Stern) বলেছেন—“জীবনের নতুন সমস্যা বা পরিস্থিতির সঙ্গে সচেতনভাবে সামঞ্জস্যবিধানের সাধারণ মানসিক ক্ষমতাই হল বুদ্ধি” (Intelligence is general mental adaptability to new problems and condition of life)

মনোবিদ প্যাটারসন (Paterson) বলেছেন, “যে জৈবিক কৌশলের সাহায্যে কোনো জটিল পরিস্থিতির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে একক প্রতিক্রিয়া করা যায় তাই হল বুদ্ধি (Intelligence is a biological mechanism by which the effects of a complexity of stimuli are brought together and given a somewhat unified effects in behaviour)।

এড্ওয়ার্ডস (Edwards)-এর মতে, “পরিবর্তনশীল এবং বহুমুখী প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতাই হল বুদ্ধি” (Capacity for variability and versatility of response is called intelligence)।

বাকিংহাম (Buckingharm) বলেছেন, শিখনের ক্ষমতাই হল বুদ্ধি (Intelligence is the ability to learn)।

কলভিন (Colvin) এর মতে, “ব্যক্তির বুদ্ধি তার অভিযোজন সংক্রান্ত অতীত শিখন বা শিখন ক্ষমতার সমানুপাতী (An individual possess intelligence is so far he has learned or can learn to adjust himself to his environment)।

ডিয়ারবর্ন (Dearborn) বলেছেন, “বুদ্ধি হল অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হওয়ার ক্ষমতা” (Intelligence is the capacity to learn or profit by experience)।

বুদ্ধির স্বরূপ (Nature of Intelligence) :

গুণগত মান নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। এই উপদানটি সহজাত এবং সাধারণধর্মী। মনোবিদগণ এর নাম দিয়েছেন বুদ্ধি। কর্ম-সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই উপাদানটির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। বুদ্ধির জন্যই কাজের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষভাবে মানুষের শিখন সম্ভব হয় এই উপাদানটির জন্যই। দ্রুত কার্য সম্পাদনে, দুটি বস্তুর মধ্যে তুলনা নির্ধারণে, বিমূর্ত চিন্তনে ও অভিযোজনের ক্ষেত্রে এই উপাদানটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে বুদ্ধির যে স্বরূপটি মূর্ত হয়ে ওঠে তা হল :

(১) বিকাশশীলতা (Developmentalism) :

বৃদ্ধি হল একটি বিকাশশীল উপাদান। জন্মের পর থেকে এর বিকাশ ঘটতে থাকে। তবে

বিকাশের প্রকৃতি নিয়ে মনোবিদদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। মনোবিদ টারম্যান (Terman) মনে করেন যে, এই সময়সীমা হল ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত। ভেক্সলার (Wechsler)-এর মতে, এই সীমা হল ২০ বছর। স্যান্ডিফোর্ড (Sandiford) বলেছেন যে, এই ক্ষমতাটির দু'রকম বৃদ্ধি ঘটে। একটি হল উল্লম্ব (Vertical) বৃদ্ধি যা চলে ২৩ বছর বয়স পর্যন্ত। আর এরপর বুদ্ধির যে বিকাশ ঘটে তা হল অনুভূমিক (Horizontal)। এই ধরনের বিকাশ ব্যক্তির জীবনে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে।

(২) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা (Individuality) :

বুদ্ধি সহজাত হলেও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে তা বিভিন্ন পরিমাণে অবস্থান করে। সকল মানুষের মধ্যে বুদ্ধি সমপরিমাণে থাকে না। এটি ব্যক্তির একটি নিজস্ব সাধারণ ক্ষমতা। প্রকৃতপক্ষে এটি কর্ম-সম্পাদনের ক্ষেত্রে গুণগত মান নির্ধারণ করে থাকে। ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণে থাকার জন্যই কাজের গুণগত মানের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

(৩) বিমূর্ত চিন্তন (Abstract Thinking) :

বুদ্ধি বিমূর্ত চিন্তনের সহায়ক। দর্শন বা গণিতের জটিল তত্ত্ব অনুধাবন করা সম্ভব হয় এই ক্ষমতাটির জন্যই। এই ক্ষমতাটি ছাড়া বিমূর্ত চিন্তন কখনোই সম্ভব নয়। বিমূর্ত চিন্তন করার ক্ষমতা একমাত্র বুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব হয়ে থাকে।

(৪) সঙ্গাতি সাধন (Consistency) :

বাইরের জগতের সাথে সার্থকভাবে সঙ্গাতি সাধনের ক্ষেত্রে এই মানসিক ক্ষমতাটি ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে সহায়তা করে। সঙ্গাতি সাধনে ব্যর্থ হলে আমাদের পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব হবে। বৈচিত্র্যময় যে পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধান করার মতো কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকে না, সেইক্ষেত্রে বুদ্ধি আমাদেরকে সঙ্গাতি সাধনে সাহায্য করে থাকে।

(৫) উন্নত মানসিক প্রক্রিয়া (Advance mental processes) :

পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণের মতো দুটি উন্নত মানসিক প্রক্রিয়া বুদ্ধির দ্বারাই কার্যকর করা সম্ভব হয়ে থাকে। এই দুই মানসিক প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে বুদ্ধি একান্তভাবে অপরিহার্য।

(৬) সম্বন্ধ স্থাপন (Establish a relationship) :

দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষেত্রে বুদ্ধি অত্যন্ত অপরিহার্য। বস্তুগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে হলে তাদের মধ্যে উপস্থিত সাধারণ ধর্মগুলিকে অনুধাবন করা দরকার। এই ধরনের অনুধাবনের ক্ষেত্রে বুদ্ধি আমাদেরকে সাহায্য করে থাকে। তার ফলে একাধিক বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভবপর হয়।

উপসংহার (Conclusion) :

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুদ্ধির যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা দেখতে পাই তা হল এই যে, বুদ্ধি একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত বিকাশধর্মী। এটি ব্যক্তিকে বিমূর্ত চিন্তনে, সম্বন্ধ স্থাপনে এবং উন্নত মানসিক প্রক্রিয়া সম্পাদনে সহায়তা করে থাকে। বুদ্ধি ছাড়া ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গতি সাধন একেবারেই সম্ভব নয়।

৫.৪.২ বুদ্ধির মৌলিক তত্ত্ব (Basic Theories of Intelligence) :

কিছু গবেষক বলেন, যে বুদ্ধিমত্তা একটি সাধারণ ক্ষমতা; অন্যরা দাবি করে যে বুদ্ধিমত্তা, নির্দিষ্ট দক্ষতা এবং প্রতিভা নিয়ে গঠিত। কিছু মনোবিজ্ঞানী দাবি করেন যে বুদ্ধিমত্তা জিনগত সূত্রে বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, এবং অন্যরা দাবি করেন যে এটি আশেপাশের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলস্বরূপ, মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধিমত্তার বেশ কিছু বিপরীত তত্ত্ব তৈরি করেছেন এবং সেইসাথে কিছু স্বতন্ত্র পরীক্ষার কথা বলেছেন, যা এই ধারণাটিকে পরিমাপ করার চেষ্টা করে। বুদ্ধিমত্তার তিনটি মৌলিক তত্ত্ব, যথা—(i) স্পিয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব, (ii) থর্নডাইকের বহু উপাদান তত্ত্ব এবং (iii) গিলফোর্ডের বুদ্ধির কাঠামো সংক্রান্ত তত্ত্ব, সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হলো :

স্পিয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (Spearman’s two factor Theory of Intelligence) :

ভূমিকা (Introduction) :

ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী স্পিয়ারম্যান তাঁর বুদ্ধি সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল “American Journal of Psychology”—“General intelligence objectively determined and measured” প্রবন্ধে 1904 খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশ করেন। এই তত্ত্ব দ্বি-উপাদান তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই তত্ত্বে পৌঁছানোর জন্য, স্পিয়ারম্যান ফ্যাক্টর বিশ্লেষণ নামে পরিচিত একটি পরিসংখ্যানগত কৌশল ব্যবহার করেছিলেন। এটি এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে দুটি চলের সহ সম্পর্ককে মূল্যায়ন করা হয় এবং যা এই পারস্পরিক সম্পর্ক সূচককে ব্যাখ্যা করে। বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে, স্পিয়ারম্যান লক্ষ্য করেছেন যে, যারা বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার একটি ক্ষেত্রে ভালো করেছে (উদাহরণস্বরূপ, গণিত), তারা বিজ্ঞান বা সঙ্গীতের মতো অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভালো করতে পারে। অন্য কথায়, গণিত এবং সঙ্গীতে ভাল ফল করার মধ্যে একটি দৃঢ় সম্পর্ক ছিল, এবং স্পিয়ারম্যান তখন এই সম্পর্কটিকে একটি কেন্দ্রীয় উপাদানের ধারা বিশ্লেষণ করেন, যা তার কথায় সাধারণ বুদ্ধিমত্তা (g-উপাদান) নামে পরিচিত। স্পিয়ারম্যানের ভাষায়, এই g- উপাদান সর্বজনীন এবং শিশু জন্মগত সূত্রে এই উপাদান অর্জন করে। প্রতিটি কাজের জন্যই এই উপাদান প্রয়োজনীয়। তবে বিভিন্ন কাজে এই উপাদানের ব্যবহৃত পরিমাণ বিভিন্ন রকম হতে পারে। g- উপাদান এর পাশাপাশি স্পিয়ারম্যান আরো একটি উপাদানের কথা বলেন, সেটি হল s- উপাদান। তার ভাষায়, s- উপাদান হলো বিশেষধর্মী ক্ষমতা, যা প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে সমানভাবে নাও থাকতে পারে, এবং যা প্রতিটি

কাজে ব্যবহার নাও হতে পারে। কাজ বিশেষে এই s-উপাদানের পরিবর্তন ঘটে। এই উপাদান সর্বজনীন নয়। সাধারণত s-উপাদান জন্মগত নয়, অর্জিত এবং শিশু পরিবেশ থেকে তা অর্জন করে।

দ্বি-উপাদান তত্ত্বের মূল বক্তব্য (The essence of two-factor theory) :

স্পিয়ারম্যান মতে, যে-কোনো রকমের বৌদ্ধিক কাজ দুটি ভিন্ন জাতীয় ক্ষমতা বা শক্তির সমন্বয়ে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে একটি সবরকম বৌদ্ধিক কাজের ক্ষেত্রে সর্বজনীনভাবে বর্তমান। এই ক্ষমতাকে স্পিয়ারম্যান বলেছেন সাধারণ উপাদান (General factor) বা ‘g’ উপাদান (g-facgtor)। অপর উপাদানটি কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট বুদ্ধিমূলক কাজেই বর্তমান। এই উপাদানটিকে তিনি নাম দিয়েছেন বিশেষ উপাদান (Specific factor) বা ‘s’ উপাদান (s-factor)।

একটি কার্যে যে বিশেষ শক্তিটি ব্যয় হবে অন্যান্য কাজে সে নিরপেক্ষ থাকবে। এই প্রসঙ্গো স্পিয়ারম্যান বলেছেন—.....all branches of intellectual activity have in common one fundamental function, whereas the remaining specific elements of the activity see in every case to be wholly different from that in all the others.

‘g’-এর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of g-factor) :

(i) ‘g’ হল জন্মগত।

(ii) সমস্ত বুদ্ধিমূলক কাজের মধ্যে ‘g’ সর্বজনীনভাবে বিদ্যমান।

(iii) একই ব্যক্তির বিভিন্ন কাজে ‘g’ গুণগতভাবে এক কিন্তু পরিমাণগতভাবে বিভিন্ন।

(iv) ‘g’ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে গুণগতভাবে পৃথক।

‘s’-এর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of s-factor) :

(i) ‘s’ হল অর্জিত।

(ii) একটিমাত্র বুদ্ধিমূলক কাজে ‘s’ সীমাবদ্ধ।

(iii) একই ব্যক্তির বিভিন্ন কাজে ‘s’ বিভিন্ন

(iv) ‘s’-এর গুণগতমান ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পৃথক।

দ্বি-উপাদান তত্ত্বের গাণিতিক ব্যাখ্যা (Mathematical explanation of two-factor theory) :

স্পিয়ারম্যান বিভিন্ন বুদ্ধিমূলক কাজ করার ক্ষমতাকে সংখ্যাগতভাবে পরিমাপ করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করেন। এই সম্পর্ককে রাশিবিজ্ঞানে বলা হয় সহগতি। বিশ্বজগতে প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত। বৈজ্ঞানিক ভাষায় দুটি চলকের (Variable) মধ্যে যদি এমন কোনো সম্পর্ক থাকে যে একটির কোনো প্রকার পরিবর্তন ঘটলেই অপরটির মধ্যে একটি পরিবর্তন হবে, তখন

এই সম্পর্ককে বলা হয় সহগতি বা অনুবন্ধ (Correlation)। আর ওই চলক দুটিকে বলা হয় সম্বন্ধযুক্ত। এই সহগতি তিন প্রকার।

(i) **ধনাত্মক সহগতি (Positive Correlation) :** ধনাত্মক সহগতির ক্ষেত্রে দুটি সম্পর্কযুক্ত রাশির একটির হ্রাস বা বৃদ্ধির জন্য অপরটির যথাক্রমে হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়ে থাকে। যেমন—চাকার ব্যাস ও পরিধি, তাপমাত্রা ও থার্মোমিটারে পারদের উচ্চতা।

(ii) **ঋণাত্মক সহগতি (Negative Correlation) :** ঋণাত্মক সহগতির ক্ষেত্রে দুটি সম্বন্ধযুক্ত রাশির একটির হ্রাস বা বৃদ্ধির জন্য অপরটির যথাক্রমে বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়। যেমন—ঊর্ধ্বমুখে উৎক্ষিপ্ত বস্তুর বেগ ও সময়।

(iii) **শূন্য সহগতি (Zero Correlation) :** এ ক্ষেত্রে দুটি রাশির একটির পরিবর্তন অপরটির পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে না। যেমন—দৈহিক শক্তি ও বুদ্ধি, বাজারে আলুর দর ও শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফল।

সুতরাং, এই বিশ্বপ্রকৃতির যে-কোনো দুটি ঘটনা বা মানব প্রকৃতির যে-কোনো দুটি বৈশিষ্ট্যকে এই তিনপ্রকার সহগতির যে-কোনো একটি দিয়ে প্রকাশ করা যায়। রাশিবিজ্ঞানে সহগতির পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য একটি সাংখ্যমান ব্যবহার করা হয়। একে বলা হয় সহগতির সহগাঙ্ক (Coefficient of Correlation)। এই সহগতির সহগাঙ্ককে ইংরেজি ‘r’ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

দ্বি-উপাদান তত্ত্বের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা (Geometric explanation of two-factor theory) :

স্পিয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বটি জ্যামিতিক চিত্রের দ্বারা পরিবেশন করা যায়।

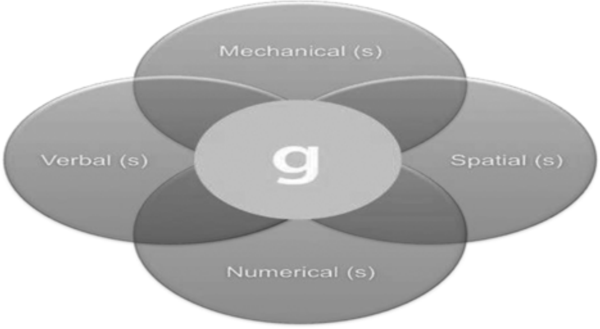

চিত্রানুযায়ী, মাঝের বড়ো বৃত্তটি সাধারণ উপাদান বা ‘g’, আর ছোটো ছোটো অধিবৃত্তগুলি এক একটি বিশেষ ধরনের বুদ্ধিমূলক কাজের সীমারেখা। দ্বি-উপাদান তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো কার্যের জন্য কিছুটা সাধারণ উপাদান ও কিছুটা বিশেষ উপাদানের প্রয়োজন। বড়ো বৃত্তটির ভিতরে অধিবৃত্তের অংশটি দ্বারা সাধারণ উপাদান ও বাইরের অংশটি দ্বারা বিশেষ উপাদান বোঝানো হয়েছে।

সমালোচনা (Criticism) :

স্পিয়ারম্যানের এই মতবাদ বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী কর্তৃক সমালোচিত হয়েছে।

1. টমসন বলেছেন, আমাদের সমস্ত বুদ্ধিমূলক কাজের মধ্যে একটি সাধারণ উপাদান ক্রিয়া করছে একথা বলা যেতে পারে না। কতকগুলি ক্ষমতা বা উপাদান দলবদ্ধ হয়ে থাকে এবং এই দলগত উপাদানগুলি আমাদের বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশ পায়।
2. স্পিয়ারম্যান দেখিয়েছেন টেট্রাড অন্তশূন্য বলে সব বৃদ্ধিমূলক কাজেই ‘g’ বর্তমান। কিন্তু টমসন বললেন—দলগত উপাদান দ্বারাও প্রমাণ করা যায় যে, টেট্রাড অন্তশূন্য হচ্ছে।
3. থার্স্টোন ‘g’ উপাদান বা দলগত উপাদানের অস্তিত্বকে স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন—যদিও বিভিন্ন বুদ্ধিমূলক কাজের মধ্যে সহগতি আছে কিন্তু সেই সহগতির পরিমাণ এতই অল্প যে তার উপর নির্ভর করে দলগত উপাদান বা ‘g’-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না।
4. স্পিয়ারম্যান সাধারণ শক্তি বা উপাদানের প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করেননি। তিনি বলেছেন, প্রাণীর বিচার-বিশ্লেষণে এই শক্তিটির প্রয়োজন হয়। যেহেতু মানুষের সব কাজেই কমবেশি বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন তাই সব ক্ষেত্রেই এই শক্তিটি ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ এটি সর্বজনীন। মনস্তত্ত্বে একেই বলা হয় বুদ্ধি। স্পিয়ারম্যান তাঁর তত্ত্বে ‘s’ অপেক্ষা ‘g’-এর উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ‘g’ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—“It is some force capable of being transferred from one mental operation to another different one.” যেহেতু ‘s’ অর্জিত, সেহেতু এর গুণগত মান ‘g’-এর গুণগত মানের উপর নির্ভর করে।
5. স্পিয়ারম্যানের এই ব্যাখ্যায় বিশেষ শক্তিগুলি বুদ্ধির অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ বিশেষ শক্তিগুলি কর্ম সম্পাদনে ব্যবহৃত হলেও সর্বজনীন নয়। কাজেই স্পিয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব মূলত এক উপাদান তত্ত্ব। এখানে প্রাচীন রাজতন্ত্রবাদকেই স্বীকার করা হয়েছে।

থর্নডাইকের বহু উপাদান তত্ত্ব (Thorndike’s Multiple Factor Theory) :

স্পিয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বের তীক্ষ্ণ সমালোচকদের মধ্যে একজন ছিলেন E. L. Thorndike (1926), যিনি বিশ্বাস করতেন যে স্পিয়ারম্যান দ্বারা অধ্যয়ন করা আন্তঃসম্পর্কগুলির একটি সাধারণ উপাদানের প্রশ্ন পরীক্ষা করার জন্য খুব সংক্ষিপ্ত ছিল। তিনি সাধারণ বুদ্ধিমত্তার (g) মতো একটি বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্বের ধারণার প্রতি তীব্র আপত্তি করেছিলেন। এক ধরণের উপাদানের পরিবর্তে, তিনি মত রেখেছিলেন যে, প্রচুর সংখ্যক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা বুদ্ধিমত্তা তৈরি করে। থর্নডাইকের মতে, সাধারণ উপাদানটি ব্যক্তির মধ্যে থাকে না তবে কাজের প্রকৃতিতে থাকে। কাজের কাঠিন্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি কোন বিশেষ কাজ করতে পারে, আবার অন্য কোন ব্যক্তি সেই বিশেষ কাজটি করতে পারে না।

থর্নডাইক বুদ্ধির তত্ত্ব হিসাবে বহু-উপাদান তত্ত্বের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট উদ্দীপকের নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া আছে। এইরকম অসংখ্য উদ্দীপকের সঙ্গে অসংখ্য প্রতিক্রিয়া বন্ধনের নামই হল বুদ্ধি। ব্যক্তিভেদে বুদ্ধির তারতম্যের কারণ হল স্নায়ুতন্ত্রের বন্ধনের সংখ্যার কম বেশি। এই তত্ত্বানুযায়ী সাধারণ বুদ্ধি বলে কিছু নেই। থর্নডাইকের তত্ত্বকে বুদ্ধির পারমাণবিক তত্ত্বও বলা যায় (Automatic Theory of Intelligence)। তিনি বুদ্ধির চারটি গুণের কথা ব্যক্ত করেছেন।

A. স্তর (Level) :

স্তর হল সমাধানযোগ্য কাজের জটিলতার মাত্রা। যদি একাধিক কাজগুলিকে কঠিনতার মাত্রা অনুযায়ী কোনো স্কেলে বিন্যাস করা যায় তাহলে ব্যক্তি যে পরিমাণ কঠিন কাজ করতে সক্ষম তাই হল তার বুদ্ধির স্তর মাত্রা। এই স্তর মাত্রা বুদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

B. বিস্তৃতি (Range) :

একই কাঠিন্য মাত্রার যত অধিক সংখ্যক বিভিন্ন প্রকারের সমস্যা সমাধান করা যায় তাই হল বুদ্ধির ব্যাপ্তি ধর্ম। তাত্ত্বিকভাবে ব্যক্তি বুদ্ধির যে স্তরে অবস্থান করেছে সেই স্তরের সমস্ত সমস্যাই তার সমাধান করা উচিত। বুদ্ধির এই ব্যাপ্তিধর্মের বিকাশের জন্য অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা এবং শিখনের প্রয়োজন।

C. ক্ষেত্র (Area) :

নির্দিষ্ট স্তরে ব্যক্তির বিভিন্ন পরিস্থিতির সমস্যার সমন্বয়কে ক্ষেত্র বলে। বুদ্ধির প্রতিটি স্তরে ব্যাক্তি যত সংখ্যক পরিস্থিতির প্রতি সফল প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম তাকে তার বুদ্ধির ক্ষেত্র বলে।

D. গতি (Speed) :

সমস্যার সমাধানের দ্রুততাই বুদ্ধির গতি ধর্ম। প্রতিটি বুদ্ধির অভীক্ষায় উক্ত 4টি ধর্ম আছে। যখন আমরা কোনো ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপ করতে চাই তখন তাকে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে দেওয়া হয় (ক্ষেত্র)। এই কাজগুলির কঠিনতার মান ভিন্ন (স্তর)। প্রতিটি স্তরে কিছু প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে (বিস্তার) এবং নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান করতে হয় (গতি)।

থর্নডাইক ধরে নিয়েছিলেন যে, বুদ্ধিমত্তার মধ্যে তিনটি পারস্পরিক স্বাধীন ক্ষমতা জড়িত।

E. বিমূর্ত বুদ্ধিমত্তা (Abstract Intelligence) :

মৌখিক এবং প্রতীকী চিন্তা করার ক্ষমতা;

F. যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তা (Mechanical Intelligence) :

ব্যক্তির শরীরকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার এবং বস্তুগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা।

G. সামাজিক বুদ্ধিমত্তা (Social Intelligence) :

মানুষের সাথে যোগাযোগ করার, বোঝার এবং সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পাদন করার ক্ষমতা।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, স্পিয়ারম্যান এবং থর্নডাইকের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরীত্য মূলত একটি তাত্ত্বিক দিক অনুযায়ী এবং থর্নডাইকের আগ্রহের ধরনগুলি মূলত স্পিয়ারম্যান তার পারস্পরিক সম্পর্ক ম্যাট্রিক্সে যে পরিমাপ ব্যবহার করেছিল, তার মতোই। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এটি চাকরি সৃষ্টিতে এবং কর্মী নিয়োগে ব্যবহৃত হয়—‘চাকরি বিশ্লেষণে’। পৃথক উপাদান একে অপরের থেকে তুলনামূলকভাবে স্বাধীন। বিভিন্ন কাজের বা ক্রিয়াকলাপের সময়, বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন মাত্রায় প্রয়োগ হয়।

গিলফোর্ডের বুদ্ধির তত্ত্ব (Guilford’s theory of Intelligence) :

থর্নডাইক, থম্পসন প্রমুখের তত্ত্বগুলির জটিলতা, অস্পষ্টতা ও অসম্পূর্ণতা বুদ্ধির উপর আরও গভীর গবেষণাকে উৎসাহিত করে। এই সময় মনোবিদ গিলফোর্ড (Guilford) তাঁর যুগান্তকারী বুদ্ধির ত্রিমাত্রিক তত্ত্ব প্রকাশ করেন। 1966 খ্রিস্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্বের পরীক্ষাগারে একাধিক অভীক্ষায় প্রাপ্ত ফলের উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধ্যাপক গিলফোর্ডও তাঁর সহযোগীগণ এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমাদের মন ত্রিমাত্রিক, একমাত্রিক নয়, যা পূর্বে মনে করা হত। বুদ্ধিকে তাই তিনটি মাত্রায় বিবেচনা করতে হবে। মাত্রা তিনটি হল—

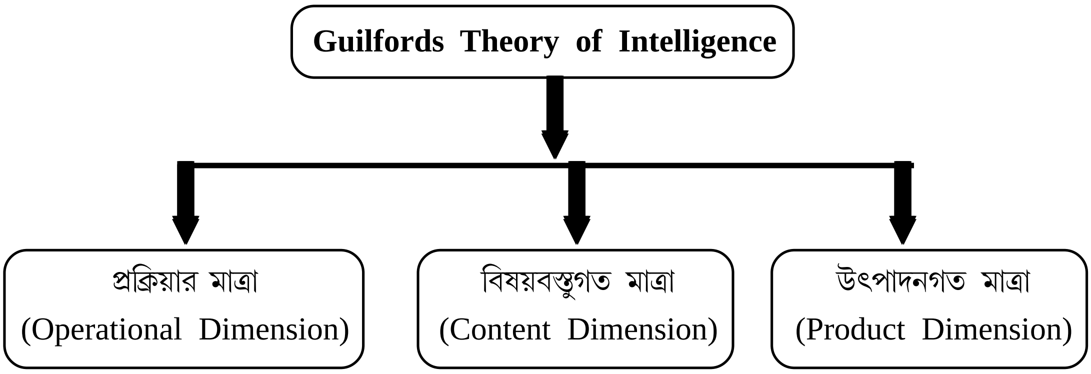
Guilfords Theory of Intelligence
প্রক্রিয়ার মাত্রা (Operational Dimension)
বিষয়বস্তুগত মাত্রা (Content Dimension)
উৎপাদনগত মাত্রা (Product Dimension)

A. প্রক্রিয়ার মাত্রা (Operational Dimension) :

এটি হলো ব্যক্তির প্রাথমিক মানুষের উপাদান যার সাহায্যে সে মানসিক বুদ্ধিক প্রক্রিয়া পরিচালনা করে লক্ষ্যের দিকে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। গিলফোর্ড এর মত অনুযায়ী প্রক্রিয়াগত মাত্র পাঁচ ধরনের

হতে পারে—

1. **প্রজ্ঞা (Cognition) :** এটি হল শিখন প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা জ্ঞানগত বিষয় অনুধাবন করা যায়।
2. **স্মৃতি (Memory) :** এটি একটি প্রাথমিক মানসিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা জ্ঞানের বিষয়কে সংরক্ষণ করা যায় ও চেনা যায়।
3. **কেন্দ্রাপসারী চিন্তন (Divergent Thinking) :** কেন্দ্রাপসারী চিন্তনে আমরা বিভিন্নভাবে চিন্তা করি। যার ফলে চিন্তার প্রসার এবং নতুন অন্বেষণের প্রসার ঘটে। সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত কার্যকরী।
4. **কেন্দ্রানুগ চিন্তন (Convergent Thinking) :** এটি হল দেয় তথ্য থেকে সবচেয়ে ফলপ্রসূ প্রথাগত তথ্যে উপনীত হওয়া। দেয় তথ্য প্রতিক্রিয়াকে নির্দিষ্ট করে। নতুন কিছু অন্বেষণ করার সুযোগ এবং প্রয়াস এখানে দেখা যায় না।
5. **মূল্যায়ন (Evaluation) :** এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি কোন বিষয়ের বা সিদ্ধান্তের গুণমান বিচার করে অর্থাৎ ব্যাক্তি বিষয়বস্তুর উপযোগিতা, কার্যকারিতা, ভালো-মন্দ বিচার করে।

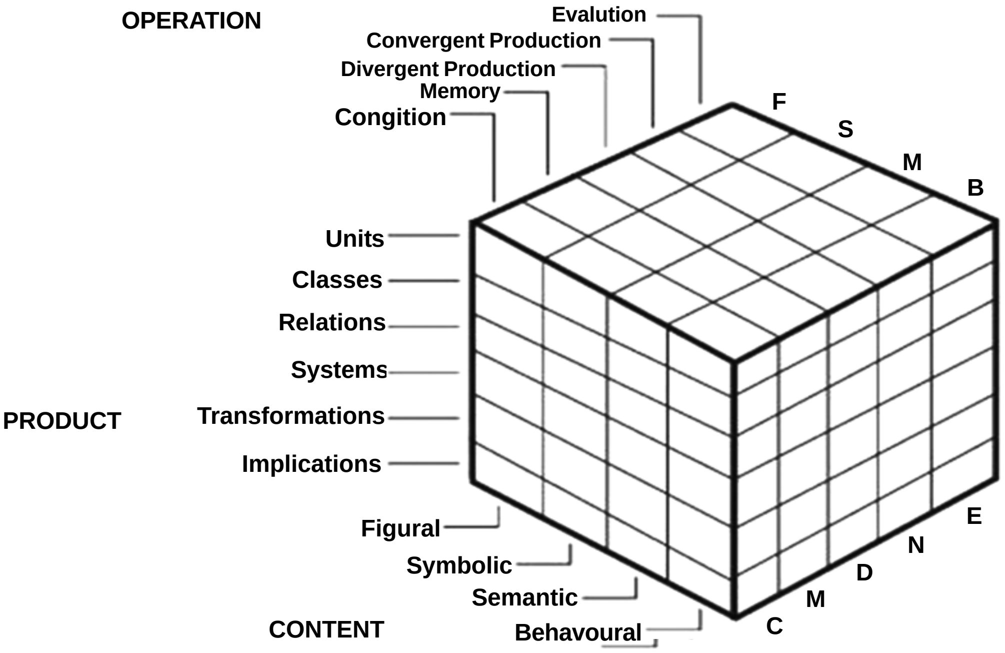
OPERATION
Evalution
Convergent Production
Divergent Production
Memory
Congition
F
S
M
B
Units
Classes
Relations
Systems
PRODUCT
Transformations
Implications
Figural
Symbolic
Semantic
Behavioural
CONTENT
E
N
D
M
C

Fig : Guilford's SOI Model

B. বিষয়বস্তু মাত্রা (Content Dimension) :

নির্দিষ্ট উদ্দীপকের ওপরই ব্যক্তি তার মানবিক প্রক্রিয়া কার্যকরী করে। ওই উদ্দীপককে বলে বিষয়বস্তুগত মাত্রা অর্থাৎ ব্যক্তির বিষয়বস্তুগত মাত্রার ওপর মানসিক প্রক্রিয়া করে থাকে। বৌদ্ধিক বা জ্ঞানমূলক তথ্যকে বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে গিলফোর্ড 4 ভাগে বিভক্ত করেছেন।

(i) **চিত্রগত বা মূর্ত বিষয়বস্তু (Figural Content) :** ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুধাবন করা যায় এমন মূর্ত বস্তু। এখানে বস্তু ছাড়া অন্য কিছুকে বোঝায় না। যেমন দৃশ্যগ্রাহ্য বস্তুর আকার, আকৃতি, রং ইত্যাদি। অর্থাৎ যা আমরা দর্শন, শ্রবণ করি তা এর অন্তর্ভুক্ত।

(ii) **প্রতীকরূপী বিষয়বস্তু (Symbolic Content) :** এটি হল অক্ষর, সংখ্যা এবং অন্যান্য প্রথাগত সংকেত যা বিন্যস্ত থাকে। যেমন—বর্ণমালা (Alphabet), সংখ্যা শ্রেণি (Number series), আঙ্কিক চিহ্ন (+, –, ×) ইত্যাদি।

(iii) **বিমূর্ত বিষয়বস্তু (Sementic Content) :** এটা হল ভাষাগত বা ভাবগত অর্থ যেমন—প্রবাদ ভোগের মা গঙ্গা পায় না, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা ইত্যাদি)।

(iv) **আচরণমূলক বিষয়বস্তু (Behavioural Content) :** এটি হল সামাজিক আচরণ, যার সাহায্যে নিজেদের ও অন্যান্যদের বোঝার এবং মেলামেশার ক্ষমতাকে বোঝায়।

C. উৎপাদন বা ফলশ্রুতি (Product) :

নির্দিষ্ট উদ্দীপক অর্থাৎ বিষয়বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বৌদির প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে যে লক্ষ্য অর্জিত হয় তাই হলো ফলাফল কত মাত্রা। গিলফোর্ড বলেছেন যখন কোনো বিষয়বস্তুর উপর প্রক্রিয়া কার্যকরী হয় তখন ছয় রকমের ফলশ্রুতি দেখা যায়। এই 6 ধরনের ফলশ্রুতি হল—

(i) **একক (Units) :** বিষয়কে কেন্দ্র করে দৃষ্টি, শ্রুতি এবং প্রতীকসহ জ্ঞান অর্জন করার ক্ষমতা এর অন্তর্ভুক্ত।

(ii) **শ্রেণি (Class) :** কোনো শব্দ বা ভাবধারাকে শ্রেণিবদ্ধ করার ক্ষমতা।

(iii) **সম্পর্ক (Relations) :** বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক বিধানের ক্ষমতা এবং ধারণাগত বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কারের ক্ষমতা।

(iv) **ব্যবস্থাপনা (System) :** বস্তুগত সংগঠন, প্রতীকধর্মী বিষয় সংগঠন, সমাধানের জন্য সমস্যা সংগঠন করার ক্ষমতা এই অংশের অন্তর্ভুক্ত। যেমন—মাধ্যাকর্ষণ না থাকলে কী হত?

(v) **পরিবর্তনশীলতা (Transformations) :** কোনোবস্তুর রূপান্তর ঘটলে কী অবস্থা হয়, বর্তমানে কোনো ঘটনার পরিবর্তন ঘটলে কী হবে তা অনুমান করার ক্ষমতা এই অংশের অন্তর্ভুক্ত।

(vi) **তাৎপর্য বিচার (Implications) :** কোনো প্রত্যাশার ব্যাপকতা, বর্তমানের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করার ক্ষমতা এই ফলশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত।

বুদ্ধির 3টি মাত্রাকে উপরোক্ত ছকের মাধ্যমে ব্যক্ত করা যায়। ঘনকের একদিকে আছে প্রতিক্রিয়ার মাত্রা, অন্যদিকে আছে বিষয়বস্তুর মাত্রা এবং তৃতীয় দিকে আছে ফলশ্রুতি বা উৎপাদনগত মাত্রা। প্রক্রিয়াগত মাত্রার ৯টি শ্রেণি, বিষয়গত মাত্রার 4টি এবং উৎপাদনগত মাত্রার 6টি অর্থাৎ মোট 5 × 4 × 6 = 120টি বুদ্ধির উপাদান আছে। বর্তমান বিষয়বস্তুগত মাত্রার চিত্রগত বিষয়কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—দৃষ্টিগত ও শ্রবণজাত। ফলে বিষয়বস্তু মাত্রা 4টির পরিবর্তে 5টি শ্রেণি হয়েছে এবং বুদ্ধির মোট উপাদান হয়েছে (5 × 5 × 6 = 150টি)। গিলফোর্ড উপাদান বিশ্লেষণের সাহায্যে এখনও পর্যন্ত 90টি বুদ্ধির উপাদান আবিষ্কার করেছেন। অবশিষ্ট উপাদানগুলি আবিষ্কৃত হবে—গিলফোর্ডের ধারণা। পরবর্তীতে গবেষণা করে SOI মডেলের মোট 180টি উপাদান পাওয়া গিয়েছে (5 × 6 × 5)। যেখানে স্মৃতি (Memory) কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

SOI-এর শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Significance of SOI) :

SOI-এর শিক্ষাগত তাৎপর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই তত্ত্বটি মনস্তত্ত্ব, শিক্ষাগত এবং বৃত্তিগত অভীক্ষায় ও শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে কার্যকরী হতে পারে।

1. **মনস্তত্ত্বে (Psychological Field) :** বিভিন্ন বয়সের জন্য বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা গঠনে ‘SOI’ মডেল খুব গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, 5 ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ায় বোঝা যায় যে, কাজ করার ৯টি উপায় আছে। 6 শ্রেণির উৎপাদন বা ফলশ্রুতি 6 ধরনের বৌদ্ধিক ক্ষমতার অর্থ বহন করে। এর প্রেক্ষিতে প্রশ্নের শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে।

   গিলফোর্ড মডেলের সাহায্যে যেভাবে বৌদ্ধিক উপাদানগুলি বিভক্ত করেছেন ভবিষ্যতে তার প্রভাব বিভিন্ন বৌদ্ধিক ক্রিয়ামূলক কাজ যেমন—গবেষণায় বিশেষ করে শিখন, স্মৃতি, সমস্যা সমাধান ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

2. **শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত অভীক্ষার ক্ষেত্রে (Educational and vocational Perspective) :** ‘SOI’ মডেলে 120 (অন্য মতে 150টি) বৌদ্ধিক ক্ষমতার উল্লেখ আছে। এর তাৎপর্য হল বুদ্ধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার জন্য বিভিন্ন ক্ষমতা পরিমাপক পদ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মডেল অনুযায়ী বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে 4 রকমের বুদ্ধি ব্যবহার করা যেতে পারে। বিমূর্ত বুদ্ধি ২টি শ্রেণির—প্রতীকমূলক ও বিমূর্ত ভাষামূলক ক্ষমতা। যেসব ক্ষেত্রে শব্দ অনুধাবন, বানান, ভাষা, সংখ্যা নিয়ে কাজ, অঙ্ক (জ্যামিতি ছাড়া) প্রয়োগ হয় সে ক্ষেত্রে প্রতীকমূলক ক্ষমতার বিশেষ প্রয়োজন। বাচনিক ধারণার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে বোঝার জন্য বিমূর্ত ভাষামূলক (Semantic) বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। সেজন্য যেসব কাজে তথ্য ও ভাষা শিখন অপরিহার্য সেখানে এই বুদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়বস্তু মাত্রার সর্বশেষ হল আচরণমূলক যাকে সামাজিক বুদ্ধি

বলা হয়। সমাজে নিজের ও অন্যান্যদের আচরণ বুঝতে এই বুদ্ধির দরকার। যেসব কাজে অপরের সঙ্গো সম্পর্ক রেখে চলতে হয় যেমন—শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, সামাজিক কর্মী, সাংবাদিক, কোম্পানির দালাল এবং নেতা সে ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে এই বুদ্ধির প্রয়োজন।

3. **শিক্ষার ক্ষেত্রে (Educational Field) :** শিক্ষার ক্ষেত্রে 'SOI' মডেল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হল।

প্রথমত, 'SOI' মডেল শিক্ষার্থী ও শিখনের ক্ষেত্রে এক নতুন ধারণার সূচনা করেছে। প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী শিখন হল উদ্দীপক—প্রতিক্রিয়ার (S-R) এর মধ্যে বন্ধন। SOI মডেল শিক্ষার্থীকে একটি কম্পিউটারের সঙ্গো তুলনা করেছে। সে শুধু তথ্য সঞ্চয় করে না অপসারী চিন্তনের মাধ্যমে নতুন তথ্য সরবরাহ এবং মূল্যায়ন করে। মানুষের ক্ষেত্রে এখানে আর একটি সুবিধা হল কম্পিউটারের মতো এখানে তথ্য ইনপুট হিসেবে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। মানুষ তথ্য বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে এবং বিন্যাস করতে সক্ষম। এই মতানুযায়ী শিখন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে শুধুমাত্র বন্ধন নয়, তথ্য আবিষ্কারও বটে। শিখনের জ্ঞানমূলক তত্ত্বের ধারণা এক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। মডেল আরও বলে যে, উচ্চস্তরের চিন্তন, সমস্যা সমাধান, সৃজনশীলতা প্রভৃতি বিকাশে, পাঠক্রম সংগঠন এবং শিখন পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত, পূর্বে শিক্ষা ছিল বুদ্ধির অনুশীলন। বর্তমান 'SOI' মডেল অনুযায়ী শিক্ষা হল নির্দিষ্ট অভ্যাস ও দক্ষতার শিক্ষণ।

তৃতীয়ত, শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য বলতে যদি বৌদ্ধিক ক্ষমতার বিকাশ বোঝায় সে ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু প্রক্রিয়া এবং উৎপাদনের নির্দিষ্ট সমন্বয়ের ভিত্তিতে পাঠক্রম সংগঠন এবং শিখন অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করতে হবে।

৫.৪.৩ বুদ্ধির বিভিন্ন প্রকারভেদ এবং তার ব্যবহার (Types of Intelligence and their Uses) :

আটটি মৌলিক ধরণের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে নীচে বর্ণনা করা হলো—

1. **যৌক্তিক ও গাণিতিক বুদ্ধি (Logical-Mathematical Intelligence) :**

যুক্তিভিত্তিক সমস্যা বিশ্লেষণ, গাণিতিক প্রক্রিয়া চালানো, বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুসন্ধান করা, অবরোহী যুক্তি প্রদান করা, যুক্তিভিত্তিক চিন্তা করা, ইত্যাদি সবই ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। এটি বিজ্ঞান ও গাণিতিক চিন্তন এর সঙ্গো সংশ্লিষ্ট।

ব্যবহার (Application) :

- যৌক্তিক এবং গাণিতিক ধাঁধার সমাধান করা
- গবেষণা প্রকল্প - পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এবং সেগুলি বিশ্লেষণ করা
- পরিমাপ এবং সার্ভে করা
- জটিল বৈজ্ঞানিক এবং গাণিতিক তত্ত্ব অনুধাবন করা
- কারণ এবং প্রভাবের সম্পর্ক আবিষ্কারের জন্য পরীক্ষা করা
- বিভিন্ন বস্তুর শ্রেণীবিন্যাস করুন - ভেনগ্রাম, ডায়াগ্রাম ইত্যাদির ব্যবহার করা।
- বিমূর্ত প্রতীক এবং সূত্র ব্যবহার করে যে কোনো ধরনের গণনা করা।

2. ভাষাগত বুদ্ধি (Linguistic Intelligence) :

নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে এবং অন্যের মনের ভাব বুঝতে, ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতাই এই হল ভাষাগত বুদ্ধি। লিখিত বা কথিত ভাষার প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার শক্তি ভাষা। শেখার ক্ষমতা, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনে ভাষাকে ব্যবহারের শক্তি, তথ্য স্মরণের হাতিয়ার হিসেবে ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা ইত্যাদি সবই ভাষাগত বুদ্ধির অন্তর্গত।

ব্যবহার (Application) :

- বই পড়া।
- জোরে পড়া।
- গল্প শোনা—মৌখিক বা এমনকি টেপ/সিডিতেও।
- বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক ও আলোচনা।
- কবিতা, ছোটগল্প লেখা।
- সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন পড়া।
- স্ক্র্যাবলের মতো Word Game খেলা।
- জনসাধারণের সমস্যা সম্পর্কে কথা বলা।

3. স্থানিক বুদ্ধি (Spatial Intelligence) :

1996 সালে Lohman, স্থানিক বুদ্ধি প্রসঙ্গে বলেন—It is “the ability to generate, retain, retrive and transform well structured visual images. It is what we do when we visualise shapes in our mind's eye. It is the mental feat that architects and engineers perform when the design buildings." অর্থাৎ, মনের অভ্যন্তরে স্থানিক জগতের প্রতিরূপ গড়ে তোলার ক্ষমতাই হলো—স্থানিক বুদ্ধি।

ব্যবহার (Application) :

- আমরা যখন আমাদের "মনের চোখে" বিভিন্ন আকারগুলি কল্পনা করি, তখন আমরা এটি করি।
- এটি একটি মানসিক কৃতিত্ব, যা স্থপতি এবং প্রকৌশলীর ব্যবহার করেন, যখন তারা বিল্ডিং ডিজাইন করেন।
- একজন রসায়নবিদকে একটি অণুর ত্রিমাত্রিক গঠন চিন্তা করতে সাহায্য করে এই বুদ্ধি।
- মাইকেল এঞ্জেলো যখন পাথরের খোঁপায় আটকে থাকে একটি ভবিষ্যত ভাস্কর্য কল্পনা করেছিলেন, তখন তিনি এটিই ব্যবহার করেছিলেন।
- এটি চিন্তার ধরণও, যা আমরা বিভিন্ন চাক্ষুষ দৃষ্টিভঙ্গি কল্পনা করতে ব্যবহার করি।
- এই ধরনের দক্ষতা একজন ব্যক্তির সামগ্রিক বুদ্ধিমত্তার একটিমাত্র দিক। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলের ভিত্তিতে বলা যায় যে—স্থানিক চিন্তা, STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিতে)-এ কৃতিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎদ্বাণী করে থাকে।

4. সঙ্গীত সংক্রান্ত বুদ্ধি (Musical Intelligence) :

সঙ্গীত নিয়ে চিন্তা করা, সংগীতের ছন্দ, তাল, লয়, শোনা-বোঝা, ও তা নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা এই বুদ্ধির অন্তর্গত। এই বুদ্ধি থাকা ব্যক্তির সংগীত মনে রাখতে পারে এবং মন থেকে সংগীত সৃষ্টি করতে পারে।

ব্যবহার (Application) :

- শিক্ষা ব্যবস্থায় সঙ্গীত অন্তর্ভুক্ত করা (যেখানে উপযুক্ত)।
- শিক্ষার্থীদের স্বাধীন প্রকল্পের জন্য সঙ্গীত অন্তভুক্ত করার অনুমতি দেওয়া।
- একটি পাঠের সাথে সঙ্গীত সংযুক্ত করা, যেমন—ঐতিহাসিক সময়কালে কোন সঙ্গীত জনপ্রিয় ছিল, সে সম্পর্কে কথা বলা।
- শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন করতে সাহায্য করার জন্য গান ব্যবহার করা।

- শিক্ষার্থীরা ক্লাসে অধ্যয়নরত অবস্থায় Mozart বা Beethoven বাজানো।
- গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া গেছে যে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শোনার ফলে মস্তিষ্ক, ঘুমের ধরণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং স্ট্রেস লেভেলের উপশম হয়।

5. গতি ও শারীর বৃত্তীয় বুদ্ধি (Bodily-Kinesthetic Intelligence) :

শারীরিক বা দেহ সঞ্চালনগত বুদ্ধিমত্তা বলতে একজন ব্যক্তির হাত এবং শরীরের নড়াচড়া, নিয়ন্ত্রণ এবং অভিব্যক্তির মাধ্যমে শারীরিকভাবে তথ্য প্রক্রিয়া করার ক্ষমতা বোঝায়। সমস্ত শরীর বা তার অংশ সঞ্চালনের সমন্বয় সাধন, সঞ্চালন দ্বারা সমস্যার সমাধান বা কিছু উৎপাদন করতে এই বুদ্ধির প্রয়োজন।

ব্যবহার (Application) :

- শারীরিক সঞ্চালনগত বৃদ্ধি সম্পৃক্ত শিক্ষার্থী এমন পেশার দিকে আকৃষ্ট হতে পারে, যেখানে শারীরিক মিথষ্ক্রিয়া জড়িত।
- স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট পেশায়—এর মধ্যে সার্জারি, নার্সিং, শারীরিক থেরাপি, পেশাগত থেরাপি, জরুরি চিকিৎসা প্রযুক্তিবিদ এবং বিনোদন থেরাপি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
- শিল্পকলায়, এর মধ্যে একজন অভিনেতা, নর্তক, শিল্পী (পেইন্টিং, ভাস্কর্য), নৈপুণ্য শিল্পী বা ডিজাইনার হওয়া অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
- শারীরিক শিক্ষা এবং ক্রীড়া পেশার মধ্যে রয়েছে অ্যাথলেটিক প্রশিক্ষক, ব্যক্তিগত প্রশিক্ষক, অ্যারোবিক্স প্রশিক্ষক, শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক এবং পেশাদার ক্রীড়াবিদ।
- ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে রয়েছে ছুতোরের কাজ, কাঠর কাজ, মেকানিক এবং চলন্ত সিস্টেমের সাথে কারখানার কাজ।
- অন্যান্য পেশার মধ্যে পোস্টাল ক্যারিয়ার, ফায়ার ফাইটার, পুলিশ অফিসার, ফরেস্ট রেঞ্জার, বা মিলিটারি অন্তর্ভুক্ত।

6. অন্তঃব্যক্তি বুদ্ধি (Intrapersonal Intelligence) :

অন্তঃব্যক্তি বুদ্ধিমত্তা হল একজনের অভ্যন্তরীণ জগত এবং অনুভূতি অন্বেষণ করার ক্ষমতা। এই ধরনের বুদ্ধিমত্তা একজন ব্যক্তিকে তাদের জীবন পরিকল্পনা ও পরিচালনায় মনোযোগ দিতে সাহায্য করতে পারে। উচ্চ অন্তর্ব্যক্তি বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন শিশুরা কী অর্জন করতে চায় এবং কীভাবে তারা তা অর্জন করতে পারে, সে সম্পর্কে ধারণা রাখে।

ব্যবহার (Application) :

- অন্তঃব্যক্তি বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে একজন ব্যক্তি নিজের শক্তি এবং দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন এবং এভাবে তিনি নিজকে বস্তুনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।
- এই বুদ্ধিমত্তার দ্বারা কোন একজন ব্যক্তি বিনা দ্বিধায় অন্যের অনুভূতি, ভয় এবং প্রেরণা গ্রহণ করতে পারেন। একজন ভাল নেতার মধ্যে এই ধরনের বুদ্ধিমত্তা থাকা আবশ্যিক, যার দ্বারা তিনি অন্যান্য ব্যক্তিকে সক্ষম হবেন।
- অন্তঃব্যক্তি বুদ্ধির মাধ্যমে একজন—নিজের নেতিবাচক স্ব-কথোপকথনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেন, স্ব-যত্ন এবং নিজের প্রতি সদয় হতে পারেন—মননশীলতীপূর্ণ হতে পারেন—অন্তঃব্যক্তি যোগাযোগের উন্নতি করতে পারেন।

7. আন্তঃব্যক্তি বুদ্ধি (Interpersonal Intelligence) :

আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধি হল অন্যদের সাথে কার্যকরভাবে বোঝার এবং যোগাযোগ করার ক্ষমতা। অন্য ব্যক্তির অভিপ্রায়, আকাঙ্ক্ষা বোঝার ক্ষমতা হলো এই বুদ্ধি। অন্যান্যদের সঙ্গে কার্যকরীভাবে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারার ক্ষমতাও হলো এই বুদ্ধি। বাচনিক বা অবাচনিক যোগাযোগ সাধনে এই বুদ্ধি সাহায্য করে।

ব্যবহার (Application) :

- একজন ব্যক্তির অন্য লোকেদের সাথে ভাল সম্পর্ক স্থাপন এবং সম্পর্ক পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এই বুদ্ধি কাজে লাগে।
- এটি মানুষকে তাদের আশেপাশের লোকদের চাহিদা এবং অনুপ্রেরণা বুঝতে সক্ষম করে, যা তাদের সামগ্রিক প্রভাবকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।
- এই ধরনের বুদ্ধি ব্যক্তিকে বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতির সাথে সহজেই মানিয়ে নিতে সাহায্য করে।
- যারা এই বুদ্ধির অধিকারী হয়, তারা কার্যকরভাবে যোগাযোগ করে এবং আলোচনা ও বিতর্কে অংশ নিতে উপভোগ করে।
- আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ব্যক্তিদের, অন্য মানুষের মেজাজ, স্বভাব, প্রেরণা এবং অনুভূতির প্রতি তাদের সংবেদনশীলতার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

8. প্রকৃতিগত বুদ্ধি (Naturalistic Intelligence) :

গার্ডনারের মত, প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তা হল পরিবেশ, বস্তু, প্রাণী বা উদ্ভিদের উপাদান সনাক্তকরণ,

শ্রেণীবিভাগ এবং পরিচালনা করার ক্ষমতা। যে সমস্ত ব্যক্তিরা এই বুদ্ধির অধিকরী হয়, তারা পরিবেশের যত্ন নেয় এবং প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকতে পছন্দ করে। তারা প্রাণী এবং উদ্ভিদ সনাক্ত করতে ভাল পারে।

ব্যবহার (Application) :

- এই বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিরা শারীরিক/মানসিকভাবে দূষণ ঘটানোর পক্ষপাতী নয়।
- এই বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিরা প্রকৃতি সম্পর্কে জানার তীব্র আগ্রহ প্রকাশ করে।
- প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকার জন্য এই বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিরা উদ্দীপনা পায়।
- প্রকৃতিতে পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা, আবহাওয়ার পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতার অধিকারী হয় এই বুদ্ধির ব্যক্তিরা।
- প্রকৃতি এবং পরিবেশ সম্পর্কে বই এবং নিবন্ধ, লিখতে প্রাকৃতিক বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিরা ভালো পারেন।

৫.৫.৪ বুদ্ধির অভীক্ষার প্রকারভেদ এবং ব্যবহার (Types and Uses of Intelligence Test) :

(i) ব্যক্তিগত বাচনিক পরীক্ষা (Individual Verbal Test) :

এই ধরনের বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন মাত্র ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপ করা হয়। পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার আইটেমগুলিতে উপস্থিত থাকার সময় ভাষা ব্যবহার করতে হবে। এখানে বিষয়ের উত্তর মৌখিক বা লিখিত আকারে দেওয়া যেতে পারে। স্বতন্ত্র মৌখিক পরীক্ষাগুলি নিম্ন বয়সের শিক্ষিত প্রতিবন্ধী ও শিশুদের জন্য উপযুক্ত উপকরণ হিসাবে কাজ করতে পারে। উদাহরণ :

(a) Standord-Binet Test of Intelligence,

(b) Wechsler Intelligence Scale for Children (Verbal Scale)

(ii) ব্যক্তিগত অবাচনিক পরীক্ষা (Individual Non-Verbal Test) :

এই বুদ্ধির অভীক্ষাটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা হয়। এটি সেই ব্যক্তির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যিনি পরীক্ষার ভাষা পড়তে এবং লিখতে অক্ষম এবং এটি ছোট বাচ্চাদের জন্যও। এতে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ রয়েছে যেমন—সঠিকভাবে ছবি সম্পূর্ণ করা, ব্লক, কিউব ইত্যাদি সেট করা। এটি এক ধরনের কর্মক্ষমতা পরীক্ষা এবং ভাষার দক্ষতার ছাড়া বুদ্ধিমত্তা পরিমাপ করার জন্য এটি উপযুক্ত। উদাহরণ :

(a) Wechsler Intelligence Scale for Children (Performance Scale)

(b) Pintour Peterson's Scale

(iii) দলগত বাচনিক অভিক্ষা (Group Verbal Test) :

এই ধরনের বুদ্ধির পরীক্ষায় একত্রে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর উপরে অভীক্ষা প্রয়োগ করা সম্ভব। পরীক্ষা পরিচালনার আগে অভীক্ষার্থীদের তাদের পেন্সিল এবং কলম প্রস্তুত করার জন্য সতর্ক করা হয়। এখানে পরীক্ষার উত্তরের সময়সীমা প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রায় সমান। এই ধরনের অভীক্ষা শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিক্ষিত গোষ্ঠীর জন্য প্রয়োগ করা হয়। তবে পরীক্ষাগুলি অর্থের পাশাপাশি সময় সাশ্রয় করে। উদাহরণ :

(a) Jalota's Scale of Intelligence

(b) Desai's Verbal Group Test of Intelligence

(c) CIE Verbal Group Test of Intelligence

(d) Samoohika Buddhi Parikshan

(iv) দলগত অবাচনিক অভিক্ষা (Group Non-Verbal Test) :

এই বিভাগে, একটি গ্রুপে অভীক্ষা পরিচালিত হয়। নিরক্ষর, ভাষা বুঝতে অসমর্থ এমন অনেকে অভীক্ষায় অংশ নেয়। এই ক্ষেত্রে দলগতভাবে ভাষাবর্জিত অভীক্ষা নেওয়া হয়। উদাহরণ :

(a) Raven's Progressive Matrices Test

(b) Cattle's Culture Free Test

(c) Pinter Patterson Scale of Performance Test

(d) Bhatia's Battery of Performance Test

(v) বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যবহার (Uses of Intelligence Test) :

বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

- বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার স্কোরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিবিন্যাসকরণ করা হয়;
- বিভিন্ন বয়সের স্তরে শিক্ষার্থীদের শেখার প্রস্তুতির পরিমাপ করা;
- বিষয়, কোর্স এবং কর্মজীবন নির্বাচন করা;
- পড়ার অক্ষমতা এবং শিক্ষাগত অনগ্রসরতার নির্ণয়করণ;
- শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত অগ্রগতির পূর্বাভাসপ্রদান;

- প্রতিরক্ষা পরিষেবাগুলিতে প্রশিক্ষণের জন্য প্রার্থীদের নির্বাচন;
- ব্যক্তিগত পার্থক্যের মাত্রা নির্ণয় করা;
- পেশাগত জীবনে শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক সাফল্যের পূর্বাভাস প্রদান করা;
- কেস স্টাডি রিপোর্ট তৈরির জন্য;
- শিক্ষাগত, বৃত্তিমূলক এবং ব্যক্তিগত নির্দেশিকা প্রদান করা।

৫.৫ সৃজনশীলতা : ধারণা, বৈশিষ্ট্য এবং শিক্ষাগত গুরুত্ব (Creativity : Concept, Characteristics, Significance in Education)

প্রাচীন যুগে বা মধ্যযুগে নতুন কিছু আবিষ্কারের পরে বা আগে আবিষ্কারক বহু বাধা ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হলেও পাঁচ-এর দশকে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের কৃত্রিম উপগ্রহ পাপনের পর বিশ্বব্যাপী এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়। লাঞ্ছনার পরিবর্তে আবিষ্কার ও আবিষ্কারক—এক অভূতপূর্ব সম্মান অর্জন করতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই মানুষ যে শুধু আবিষ্কারকদের সম্মান জানাচ্ছে তাই নয়, নতুনের প্রতি তার অস্বাভাবিক ঝোঁকেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বিশ্বব্যাপী মানুষের শ্রদ্ধা আবিষ্কার ও আবিষ্কারের উপর পড়লেও মনোবিদগণের আগ্রহ বা শ্রদ্ধা আবিষ্কারের চেয়ে আবিষ্কারকদের প্রতি বিশেষ করে তাদের মানসিকতার প্রতি প্রবর্ধিত হয়। মনোবিদগণের এই আগ্রহ থেকেই আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে নতুন এক ধারণার প্রবর্তন হয়, যাকে বলা হয় 'সৃজনক্ষমতা' (Creativity)। প্রথমে সৃজনক্ষমতাকে মানুষের বুদ্ধি বা সাধারণ মানসিক ক্ষমতার দ্বারাই ব্যাখ্যা করা হত। পরবর্তীকালে দেখা গেল, বুদ্ধির অভীক্ষা দিয়ে মানুষের অভিনবত্বকে সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না বা সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে ব্যক্তি কীভাবে সমাধানের পথ আবিষ্কার করে বা ব্যক্তির প্রতিভা কতখানি তা জানা যায় না। তাই মনোবিদগণ সৃজনাত্মক কাজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার অনুসন্ধান করতে গিয়ে বুদ্ধির বিকল্প হিসেবে সৃজনক্ষমতার ধারণা গ্রহণ করেছেন।

৫.৫.১ সৃজনশীলতার ধারণা (Concept of Creativity) :

ইংরেজি শব্দ 'Creativity' ল্যাটিন শব্দ 'Creare' থেকে এসেছে, যার অর্থ "সৃজন করা বা তৈরি করা"। চোদ্দো শতকের প্রথম দিকে ইংরেজিতে "create" শব্দটি আবিভূত হয়েছিল, বিশেষ করে Chauce (The Parson's Tale) 'ঐশ্বরিক সৃষ্টি' বোঝাতে এটি ব্যবহার করেছিলেন।

Teresa Amabile and Pratt (2016), সৃজনশীলতাকে উপন্যাসের উৎপাদন এবং দরকারী ধারণা এবং উদ্ভাবনকে সৃজনশীল ধারণার বাস্তবায়ন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে। 'উদ্ভাবন' একটি নতুন ধারণা

বা একটি নতুন আবিষ্কারের চেয়ে অনেক বেশি। একটি উদ্ভাবনের জন্য বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এছাড়াও একটি 'Emotional Creativity' রয়েছে, যা আবেগগত অভিজ্ঞতায় মৌলিকতা এবং উপযুক্ততার সাথে সম্পর্কিত জ্ঞানীয় ক্ষমতা এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলির একটি প্যাটার্ন হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

Torrence (1995) সৃজনশীলতাকে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন যদি আমরা সৃজনশীল প্রক্রিয়াটি বুঝতে পারি, তাহলে আমরা ভবিষ্যৎদ্বাণী করতে পারব যে, কোন ধরনের ব্যক্তি প্রক্রিয়াটি আয়ত্ত করতে পারে, কী ধরনের পরিবেশ এটিকে বৃদ্ধি করেছে এবং কোন উপাদানগুলির এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে।

সৃজনশীলতাকে সমস্যা সমাধান, অন্যদের সাথে যোগাযোগ এবং নিজেদের এবং অন্যদের বিনোদনের জন্য উপযোগী হতে পারে এমন ধারণা, বিকল্প বা সম্ভাবনাগুলি তৈরি বা সনাক্ত করার প্রবণতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। সৃজনশীলতা একজনের প্রবণতা, যা সমস্যা সমাধানে, অন্যদের সাথে যোগাযোগ করতে এবং নিজেদের এবং অন্যদের বিনোদনের জন্য উপযোগী হতে পারে।

Guilford (1959) বলেছেন—

"Creativity is the capacity to produce ideas that are both new and useful through divergent thinking."

Drevdahl (1956) সংজ্ঞায়িত করেছেন,

"Creativity is the capacity of a person to produce compositions, products or ideas which are essentially new or novel and previously unknown to the producer."

আসুবেল (Asubel DP) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি জীবনের যে-কোনো পরিস্থিতিতে এমন কোনো কাজ করেন, যার মধ্যে তার অভিনবত্ব প্রকাশ পায় এবং যার দ্বারা অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর তফাত করা যায়, তাঁকে সৃজনশীল ব্যক্তি বলা হয়"।

প্রেট্রাসিনস্কি (Z Pretrasinski) বলেছেন, "Creativity is a activity resulting in new product of a definite social value."

জেম্‌স্ (William James) বলেছেন,

চিন্তন দু-প্রকার—সৃজনাত্মক চিন্তন (Productive thinking) এবং পুনরুত্থাপনমূলক (Reproductive thinking)। তিনি বলেছেন, সৃজনাত্মক চিন্তন ক্ষমতাই সৃজনক্ষমতা এবং এই ধরনের চিন্তনের ফল হল সৃজনাত্মক কাজ।

সুতরাং, সৃজনশীলতা হল মানুষের মনের শক্তি যা সম্পর্কের পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন বিষয়বস্তু তৈরি করে এবং নতুন পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করে। সৃজনশীলতা তখনই ঘটে, যখন সৃজনশীল ব্যক্তিরা তাদের উদ্ভাবনী চিন্তাধারা দ্বারা নিত্যনতুন বিষয় তৈরি করতে পারে। সৃজনশীল ব্যক্তিরা বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়।

- **শক্তি (Energy) :** সৃজনশীল ব্যক্তিরা শারীরিক এবং মানসিক উভয় শক্তিরই প্রচুর পরিমাণে অধিকারী হন। যাইহোক, তাদের মধ্যে শান্তভাবে চিন্তা করার এবং নিজস্ব চিন্তন প্রতিফলিত করার শক্তি থাকে।
- **বুদ্ধি (Intelligence) :** মনোবিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বাস করেন যে, বুদ্ধিমত্তা সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিভাধর শিশুদের সম্পর্কে টারম্যানের বিখ্যাত দীর্ঘমেয়াদী গবেষণায়, গবেষকরা দেখেছেন যে, উচ্চ I.Q. মহান সৃজনশীলতার জন্য প্রয়োজনীয়, তবে উচ্চ I.Q. সহ সমস্ত লোক সৃজনশীল হয়।
- **শৃঙ্খলা (Discipline) :** সৃজনশীল ব্যক্তিরা কেবল আঘাত করার অনুপ্রেরণার অপেক্ষায় বসে থাকে না। তারা কৌতুকপূর্ণও হয়, তবুও তারা তাদের কাজ এবং আবেগের অনুসরণে শৃঙ্খলাবদ্ধ।

যদিও কিছু লোক স্বাভাবিকভাবেই সৃজনশীলতার অধিকারী হয় তবুও এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা, বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৫.৫.২ সৃজনশীলতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Creativity) :

সৃজনশীলতা হল নতুনত্ব তৈরি করার ক্ষমতা এবং সামর্থ্য। শিল্প, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে উচ্চ কৃতিত্ব যুক্ত শিক্ষার্থীদের ঐতিহ্যগতভাবে সৃজনশীল বলা হয়। তবে, যেকোনো ধরনের উৎপাদন তা আদর্শগত হোক, বা শারীরিক হোক বা সামাজিক হোক, তা সৃজনশীল হতে পারে।

(a) সৃজনশীল প্রক্রিয়া (Creative Process) :

Paul Torrence (1966, 1993), সৃজনশীলতা প্রক্রিয়ার চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে মৌলিকতা (অনন্য ধারণা থাকা), নমনীয়তা (ধারণা সম্পর্কে বিকল্প চিন্তা), সাবলীলতা (প্রচুর ধারণা তৈরি করা), এবং সম্প্রসারণ ক্ষমতা (ধারণার মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করা বা ধারনার উন্নতিকরণ করা)।

(b) ক্ষমতা হিসাবে সৃজনশীলতা (Creativity as Ability) :

সুস্থ মস্তিষ্কের সমস্ত ব্যক্তির কিছু পরিমাণে সৃজনশীল সম্ভাবনা রয়েছে, তবে ব্যক্তিরা আসলে কতটা নতুনত্ব তৈরি করে, তার মধ্যে তারতম্য রয়েছে। সৃজনশীলতার Psychometric

পরিমাপগুলি এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে গঠিত যে, তৈরি করার ক্ষমতা কার্যকলাপের বিভিন্ন ডোমেন জুড়ে সাধারণ (শিল্প, ব্যবসা, সঙ্গীত, প্রযুক্তি ইত্যাদি) এবং সময়ের সাথে সাথে স্থিতিশীল। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বোঝায় যে, একজন ব্যক্তি যার সৃজনশীলতা একটি ডোমেন গড়ের উপরে তা অন্যান্য ডোমেনেও গড়ের চেয়ে বেশি হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

(c) সৃজনশীলতা এবং বুদ্ধি (Creativity and Intelligence) :

'সৃজনশীলতা' এবং 'বুদ্ধিমত্তা' দুটি ক্ষমতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিভিন্ন গবেষণায় বিভিন্ন রূপে ধরা পড়েছে। এবং এই দুটি বিষয়ের সহ সম্পর্ক, কোন্ পরীক্ষাগুলি ব্যবহার করা হয় তার উপর অনেকংশে নির্ভর করে। এই ধরনের গবেষণাগুলি এমন প্রমাণ দিতে পারেনি যে, সৃজনশীলতা এবং বুধ্যাঙ্ক দুটি আলাদা বিষয়। অনুসন্ধানগুলি তথাকথিত ত্রিভুজাকার পারস্পরিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যেতে পারে। (Threshold Hypothesis নামে পরিচিত); I.Q. ডিস্ট্রিবিউশনের নীচের অর্ধেক ব্যক্তিদের তৈরি করার প্রয়োজনীয় জ্ঞানীয় ক্ষমতার অভাব রয়েছে এবং তাই অগত্যা কম সৃজনশীলতা প্রদর্শন করে। I.Q. বন্টনের উপরের অর্ধেক ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা আছে কিন্তু তারা তৈরি করতে পারে বা নাও পারে। ফলস্বরূপ, সৃজনশীলতা এবং I.Q. নিম্ন I.Q. স্তরে অত্যন্ত সম্পর্কযুক্ত; কিন্তু উচ্চ I.Q. স্তরে দুর্বলভাবে সম্পর্কযুক্ত। সৃজনশীলতা এবং বুদ্ধিমত্তার মধ্যে সম্পর্কের বিকল্প ব্যাখ্যাগুলি প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে যে—তারা একই ক্ষমতার দুটি দিক, তারা সম্পর্কহীন এবং তারা পারস্পরিক একচেটিয়া।

(d) প্রক্রিয়া হিসাবে সৃজনশীলতা (Creativity as Process) :

মানব মন যে অভিনব ধারণা তৈরি করতে পারে তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। Cognitive Psychologists রা লক্ষ্য করেন যে, ব্যক্তিরা সৃজনশীলতার প্রয়োজন এমন সমস্যার সমাধান কীভাবে করে, তার পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাসঙ্গিক মানসিক প্রক্রিয়াগুলি অনুমান করা যায়। একটি অনুমান বলে যে, সৃষ্টি হল ভিন্নতা এবং নির্বাচনের একটি প্রক্রিয়া, যা জৈবিক বিবর্তনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। একজন সৃজনশীল ব্যক্তির মন স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রচুর পরিমাণে ধারণার এলোমেলো সংমিশ্রণ তৈরি করে এবং কয়েকটি নির্বাচিত সংমিশ্রণ আচরণে প্রকাশ পায়। একটি বিকল্প হাইপোথিসিস হল যে, একজন সৃজনশীল ব্যক্তি অতীতের অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধ প্রভাবকে অগ্রাহ্য করতে সক্ষম। যে মুহূর্তে একটি পূর্বে অবহেলিত কিন্তু প্রতিশ্রুতিশীল বিকল্প মনে আসে, তা প্রায়ই অন্তর্দৃষ্টি হিসাবে উল্লেখ করা হয়। একটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত অনুমান হল যে, সৃজনশীল ব্যক্তিরা মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্ত হতে বেশি সক্ষম হয়—চিন্তার ভাব, যা বারবার পুনরাবৃত্তি হয়, যদিও তারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বা সমাধানের দিকে এই চিন্তার ভাবকে

নিয়ে যায় না। এটি মনে করা হয় যে, সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে কোনো একজন ব্যক্তি—বর্তমান এবং অতীতের সমস্যা এবং পরিস্থিতির মধ্যে সাদৃশ্য তৈরি করে এবং এক ডোমেন থেকে অন্য ডোমেনে অর্জিত বিমূর্ততা জ্ঞানীয় স্কিমা—প্রয়োগ করে।

(e) চিত্রকল্প সমূহের সাথে সম্পর্কিত (Creativity in relation to Imagery) :

ব্যাপক বিশ্বাস রয়েছে যে, অত্যন্ত সৃজনশীল ব্যক্তিরা সামগ্রিকভাবে চিন্তা করেন, visual image এর মত করে। যুক্তিভিত্তিক চিন্তনের ক্ষেত্রে যেমন আমরা স্তরে স্তরে চিন্তা করি, সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটা নয়। Memory Recall এর সাথে Visual Imaginary-র যেমন একটি স্পষ্ট সম্পর্ক আছে; কিন্তু সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে এর প্রাসঙ্গিকতা অস্পষ্ট।

(f) জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত (Creativity in relation to Knowledge) :

Cognitive এবং Biological সংক্রান্ত গবেষণায় দেখা গেছে যে, সৃজনশীল সমস্যা সমাধানের জন্য প্রাসঙ্গিক ডোমেন এবং ডোমেন নির্দিষ্ট কৌশলগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান প্রয়োজন। এটা সম্ভাবনা রয়েছে যে, সৃজনশীলতা একটি সাধারণ ক্ষমতা বা প্রক্রিয়া নয়, কিন্তু বিভিন্ন সৃজনশীল আচরণ এবং উৎপাদনগুলি তখনই আবির্ভূত হয়, যখন একজন যোগ্য এবং জ্ঞানী ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে একটি ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হতে অনুপ্রাণিত বোধ করে। এই কারণেই একজন ব্যক্তি যিনি কার্য সম্পাদনের একটি ডোমেনে অস্বাভাবিকভাবে সৃজনশীল, তিনি কার্য সম্পাদনের অন্য ডোমেনে অতটা সৃজনশীল নন।

সৃজনশীলতার উপাদান (Components of Creativity) :

সৃজনশীল ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি আচরণগত লক্ষণ পাওয়া যায়। এই আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলি সৃজনশীল ব্যক্তির সৃজনাত্মক কর্মসম্পাদনের সময় দেখা যায়। সৃজনাত্মক চিন্তনের এই আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলিকেই বলা হয় 'সৃজনশীল ক্ষমতার উপাদান। বিভিন্ন মনোবিদ সৃজনশীল ক্ষমতার যে উপাদানগুলি আজ পর্যন্ত চিহ্নিত করেছেন সেগুলি নিম্নরূপ—

(i) সাবলীলতা (Fluency) :

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সাবলীলতা সৃজনক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ক্ষিপ্রতা বলতে দ্রুত চিন্তা করার ক্ষমতা বোঝায়। প্রক্রিয়াগতভাবে সাবলীলতা চার প্রকার।

(ক) **শাব্দিক সাবলীলতা (Word fluency) :** দ্রুত নতুন নতুন অর্থযুক্ত শব্দ ব্যবহারের ক্ষমতা।

(খ) **সংযোগমূলক সাবলীলতা (Associational fluency) :** সমার্থক বা বিপরীতার্থক

শব্দ দ্রুত নির্বাচনের ক্ষমতা অর্থাৎ দুটি শব্দ বা ধারণার মধ্যে দ্রুত সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা।

(গ) **প্রকাশমূলক সাবলীলতা (Expressional fluency) :** মনের ভাবকে সংক্ষিপ্ত ভাষায় দ্রুত প্রকাশের ক্ষমতা। সুতরাং, বাক্যটি যত ছোটো হবে, ভাব প্রকাশের সাবলীলতা তত বাড়বে।

(ঘ) **আদর্শগত সাবলীলতা (Ideal fluency) :** পরিস্থিতি অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে উপযুক্ত সামগ্রিক ধারণা গঠনের ক্ষমতা।

(ii) নমনীয়তা (Flexibility) :

নমনীয়তা বলতে বোঝায় এমন অবস্থা যেখানে চিন্তন কোনো ধরা-বাঁধা পূর্ব নির্দিষ্ট পথে চলে না। নমনীয়াত দু-প্রকার

(ক) স্বতঃস্ফূর্ত নমনীয়তা (Spontaneous flexibility) : এক্ষেত্রে সৃজনশীল ব্যক্তি এক ধররেন চিন্তা থেকে অন্য ধরনের চিন্তায় নিজের মানসিক প্রক্রিয়াকে পরিবর্তন করতে পারে। কোনো রকম সংস্কার বা সংকীর্ণতা তার চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

(খ) অভিযোজনমূলক নমনীয়তা (Adaptive flexibility) : এক্ষেত্রে সৃজনশীল ব্যক্তি যে কোনো পরিবেশে অভিনব কৌশলে সমস্যা সমাধান করতে পারে। অর্থাৎ যে-কোনো সমাধান পদ্ধতিকে নিজের মতো করে গঠন করে নতুন সমস্যা সমাধান করতে পারে।

৫.৫.৩ শিক্ষায় সৃজনশীলতার গুরুত্ব (Educational Significance of Creativity) :

যদিও এটি অস্পষ্ট যে সৃজনশীল করার ক্ষমতা বাড়ানো যায় কিনা, তবুও সকল মনোবিদই স্বীকার করেন যে, সৃজনশীলতাকে দমন করা যেতে পারে। সৃজনশীলতা এবং শৃঙ্খলা, বিরোধী নয়—সৃজনশীল ব্যক্তিরা অনেক অনুশীলন করে এবং কঠোর পরিশ্রম করে। তবে, অতিরিক্ত কাঠামোগত কার্যকলাপের উপর ব্যাপক নির্ভরতা শিক্ষার্থীদের কল্যাণের উপর নেতিবাচক প্রভাব সহ সৃষ্টির প্রবণতাকে ব্যর্থ করতে পারে। ডিজাইন, কল্পনা বা উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয় এমন ক্রিয়াকলাপে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা অন্যদের তুলনায় ভালো পারফর্ম করবে, কিন্তু এই ধরনের ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে কোনো স্তরে দক্ষতা তৈরি করতে উৎসাহিত করে।

শিক্ষাবিদদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ রয়েছে যে, মানসম্মত পরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের লক্ষ্য নির্ধারণের প্রবণতা, শিক্ষকদের সৃজনশীলতার চেয়ে শিক্ষা এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতাকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য করে। সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয় বিশেষ pedagogy-র উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা স্কুলগুলিতে—উদাহরণস্বরূপ, মন্তেসরি এবং ওয়াল্ডর্ফ স্কুলগুলিতে।

একটি ভালো শ্রেণীকক্ষের পরিবেশে সবসময় সৃজনশীলতার কিছু উপাদান থাকে, যা পাঠককে আরও আকর্ষণীয় এবং ইন্টারেক্টিভ করে তোলে। পাঠ্যক্রমের সাথে সৃজনশীলতার সঠিক সংমিশ্রণ শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক চিন্তার দক্ষতা আমাদের একাডেমিক অগ্রগতিতে ইতিবাচকভাবে প্রতিফলিত করতে সহায়তা করে। এই দক্ষতাগুলি নতুন উপাদান দ্রুত শিখতে, শেখার দক্ষতা উন্নত করতে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে বুঝতে সাহায্য করে। এই দক্ষতার সঠিক বিকাশ আমাদের সাফল্য নির্ধারণ করবে।

৫.৫ সারাংশ (Summary)

মানুষের ক্ষমতা হল একটি নির্দিষ্ট শারীরিক বা মানসিক কাজ সম্পাদন করার বিদ্যমান যোগ্যতা বা দক্ষতা। অধ্যায়ন এবং অনুশীলনের মাধ্যমে বহু বছর ধরে মানুষের ক্ষমতা বিকাশ লাভ করে এসেছে। ক্ষমতাগুলি প্রজ্ঞামূলক ও সাইকো মোটর ডোমেইনের অন্তর্গত। বর্তমানে ব্যক্তির বিভিন্ন কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়।

ব্যক্তিজীবনে বুদ্ধি বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে। বুদ্ধি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা অর্জন করতে হলে বুদ্ধির সংজ্ঞা এবং তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, গুরুত্বগত দিক জানা প্রয়োজন। বুদ্ধিমত্তা হলো ব্যক্তির উদ্দেশ্য মূলক কাজ করার যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা করার এবং তার পরিবেশের সাথে কার্যকরীভাবে মোকাবেলা করার সামগ্রিক ক্ষমতা। লিঙ্গের পার্থক্যের কারণে বুদ্ধিমত্তার কোন পার্থক্য নেই যদিও বংশগতি বুদ্ধিমত্তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

সৃজনশীলতা মানুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি। সৃজনশীলতা হলো নতুন এবং কল্পনাপ্রসূত ধারণাকে বাস্তবে পরিণত করার কাজ। এটি বিশ্বকে নতুন উপায়ে উপলব্ধি করায়, লুকানো নিদর্শনগুলো খুঁজে বের করায়, আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন ঘটনার মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং সমাধান তৈরি করার ক্ষমতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

সৃজনশীল অভিব্যক্তির মাত্রা এবং মান আপেক্ষিক। এটি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে এবং বয়স থেকে বয়সে পরিবর্তিত হয়।

সৃজনশীলতা মানে মূল চিন্তা নতুন ধরনের সংসর্গ, ভিন্ন চিন্তা ভাবনা এবং অভিনব আচরণ, পুরনো সমস্যার নতুন সমাধান, নমনীয়তা এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি নতুন পদ্ধতি। সৃজনশীলতা একটি অত্যন্ত বিশেষায়িত এবং মূল ক্ষমতা হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি সার্বজনীন, অভিনবত্ব এবং ভিন্নতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

৫.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-assessment Question)

১. মানুষের ক্ষমতা বলতে কি বোঝো?

২. বুদ্ধি কি?

৩. স্পিয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো।

৪. গিলফোর্ডের তত্ত্বে বুদ্ধির তিনটি মূল উপাদান কি কি?

৫. সৃজনশীলতা বলতে কি বোঝো?

৬. সৃজনশীলতার বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৭. শিক্ষাক্ষেত্রে সৃজনশীলতার গুরুত্ব আলোচনা করো।

৮. বুদ্ধি পরিমাপক অভিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

৫.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008) Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House, Pvt, Lted. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993) Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P., (2001), Educational Psychology", Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3

Mangal, Dr. S. K., (1998) Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana. 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/prespective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College Distric & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002), Modern Educational Psychology”, Dhanptat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

একক - ৬ ❑ শিখনের মনোবিজ্ঞান (Psychology of Learning)

গঠন **(Structure)**

৬.১ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

৬.২ ভূমিকা **(Introduction)**

৬.৩ শিখন মনোবিজ্ঞান : ধারণা, বৈশিষ্ট্য এবং শিখনের নির্ধারক : মনোযোগ, চিন্তন, স্মৃতি, প্রক্ষোভ এবং পেষণা (শুধুমাত্র ধারণা) **(Psychology of Learning : Concept, Characteristics and Factors of Learning : Attention, Thinking, Memorization, Emotion and Motivation Basics only)**

    ৬.৩.১ শিখনের ধারণা **(Concept of Learning)**

    ৬.৩.২ শিখনের বৈশিষ্ট্য **(Characteristics of Learning)**

    ৬.৩.৩ শিখনের নির্ধারক **(Factors of Learning)**

৬.৪ শিখনের আচরণবাদী তত্ত্ব এবং তার শিক্ষাগত তাৎপর্য : সংযোজনবাদ, প্রাচীন এবং অপারেন্ট অনুবর্তন **(Behaviouristic Theories of Learning and its Educational implications : Connectionism, Classical and Operant Conditoning)**

৬.৫ শিখনের প্রজ্ঞামূলক তত্ত্ব (অন্তর্দৃষ্টি মূলক এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ) এবং এদের শিক্ষাগত তাৎপর্য **(Cognitive Theories of Learning (Insightful and Information Processing) and its Educational Implications)**

৬.৬ সারাংশ **(Summary)**

৬.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন **(Self-Assessment Questions)**

৬.৮ গ্রন্থপঞ্জি **(Reference)**

৬.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই ইউনিটটি শেষ হওয়ার পরে শিক্ষার্থীরা যে বিষয়গুলো জানতে সক্ষম হবে—

- শিখনের ধারণা বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবে।

- শিখনের বিভিন্ন আচরণ বাদী তত্ত্ব এবং তার শিক্ষাগত তাৎপর্য বুঝতে পারবে।
- শিখনের নির্ধারকগুলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে।
- শিখনের প্রজ্ঞামূলক তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তার শিক্ষাগত তাৎপর্য সম্পর্কে ধারণা গঠন হবে।

৬.২ ভূমিকা (Introduction)

শিখন মনোবিজ্ঞান হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত এবং মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন তত্ত্বগুলি এর অন্তর্ভুক্ত। শিখনের ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখা যায় শিক্ষা মনোবিদ্যায় বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন শিখন তত্ত্বের ব্যবহার হয়। যেমন—আচরণবাদী তত্ত্ব, প্রজ্ঞামূলক তত্ত্ব, সামাজিক নির্মিতবাদ তত্ত্ব।

বর্তমানে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এর উপর ব্যাপক গবেষণা হয়েছে যা শ্রেণিকক্ষের ভিতর এবং বাইরে শিক্ষার্থীরা কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করছে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা এবং বিবরণ করে। শিখন মনোবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত তথ্যগুলি শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা, অনুপ্রেরণা এবং তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগ, পারদর্শীতা ইত্যাদির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে।

৬.৩ শিখন মনোবিজ্ঞান : ধারণা, বৈশিষ্ট্য এবং শিখনের নির্ধারক : মনোযোগ, চিন্তন, স্মৃতি, প্রক্ষোভ এবং পেষণা (শুধুমাত্র ধারণা) (Psychology of Learning : Concept, Characteristics and Factors of Learning : Attention, Thinking, Memorization, Emotion andMotivation Basics only)

৬.৩.১ শিখনের ধারণা (Concept of Learning)

শিক্ষা মনোবিদ্যার (Educational Psychology) আলোচনার প্রায় সমগ্র অংশ জুড়ে যে সমস্যা আছে তা হল শিখন প্রক্রিয়া এমনি এক জটিল প্রক্রিয়া, যে তাকে খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। সাধারণ অর্থে শিক্ষা (Education) এবং শিখন (Learning) এই দুটি প্রক্রিয়াকে আমরা পৃথকভাবে দেখতে অভ্যস্ত নই। কিন্তু শিক্ষা এবং শিখনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। শিখন প্রক্রিয়ার জটিলতা মনোবিদদের বহু শতাব্দী ধরে চিন্তান্বিত করেছে। বর্তমান শতাব্দীতে শিখন সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ের স্বল্প পরিসর অংশে তার সবকিছু সম্পর্কে আলোচনা সম্ভব নয়। তবুও কিছু কিছু আধুনিক ধারণা সম্পর্কে উল্লেখ করার চেষ্টা করব এবং আধুনিক চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বিষয়ের আলোচনার চেষ্টা করব।

ব্যক্তিসত্তার (Personality) বিকাশ দুটো শক্তির উপর নির্ভর করে। একটা হল বংশগতি (Heredity) অপরটি হল পরিবেশ (Environment)। ব্যক্তি মানসের যে কোন অগ্রগতিকেই এই দুই-এর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। কোন বিশেষ অবস্থায়, বংশগতি কতটা ব্যক্তির বিকাশে সহায়তা করবে, তা নির্ভর করে পরিবেশ তার উপর কতটা ক্রিয়াশীল। আবার, পরিবেশ ব্যক্তির উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করবে তা নির্ণয় করে দেবে তার বংশগতি। এইভাবে ব্যক্তিজীবনে নিয়তই এক সংগ্রাম চলছে। এ সংগ্রাম ব্যক্তির জন্মগত গুণাবলীর সঙ্গো চিরপরিবর্তনশীল পরিবেশের। অর্থাৎ জীবনধারণের তাগিদে আমরা পরিবেশের সঙ্গো নিয়ত সংগ্রাম করে চলেছি। কোন বিশেষ মুহূর্তে কোন বিশেষ আচরণ (Behaviour) এই সংগ্রামেরই ফল। আচরণের প্রকাশ এক ধরনের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা, এই যে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গো আমরা অভিযোজন করছি, এর ফলে আমাদের জন্মগত আচরণধারার মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। সহজাত প্রবণতা (Original tendencies) ও জন্মগত আচরণগুলোর (Inborn behaviours) পরিবর্তিত হয়ে নতুন আচরণধারা আমাদের মধ্যে এনে দিচ্ছে। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ (Training) এবং পরিবেশের সঙ্গো অভিযোজনের তাগিদ, সব কিছু বাধ্য করছে নতুন আচরণ করতে। এই ধরনের আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে শিখন (Learning)। অর্থাৎ, অতীত, অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণের প্রভাবে আচরণধারা পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া তাকেই শিখন বলে।

শিখনের সংজ্ঞা (Definitions of Learning) :

According to Santrock : "Learning can be defined as a relatively permanent influence on behaviour, knowledge and thinking skills, which comes about through experience". অর্থাৎ শিখন হল ব্যক্তির আচরণ, জ্ঞান এবং চিন্তন দক্ষতার উপর আগে আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী প্রভাবে ফেলা যা অভিজ্ঞতার জন্য হয়ে থাকে।

According to Parson, Hinson & Brown : "Learning is change is behaviour or capacitry acquired through experience". অর্থাৎ শিখন হল আচরণের বা দক্ষতার পরিবর্তন যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

According to Gates et. al. : "Learning is the modification in behaviour to meet environmental requirements". অর্থাৎ শিখন হল আচরণের পরিমার্জন বা বিভিন্ন চাহিদা পরিপূরণ করে।

According to Hilgard : "শিখন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কোনো নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে আচরণের সৃষ্টি হয় বা আচরণের পরিবর্তন হয়।

According to Klausmeir : "Learning is a process whereby a change in behaviour results from some form of experience, activity, training, observation and the like".

According to Smith, "অভিজ্ঞতার দ্বারা নতুন আচরণ অর্জন বা পুরোনো আচরণকে শক্তিশালী বা দুর্বল করাকে বলে শিখন"।

According to Morgan : "অভিজ্ঞতার বা চর্চার ফলে আচরণের আপেক্ষিক স্থায়ী পরিবর্তন হল শিখন"।

৬.৩.২ শিখনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Learning) :

"শিখন সম্পর্কে মূল কথা হল এই যে, এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে তার পুরোনো অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আচরণ ধারার পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজনে সহায়তা করে। এর সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে হলে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গে শিখনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

অতীত অভিজ্ঞতা (Previous Experience) :

শিখনের মূল ভিত্তি হল অতীত অভিজ্ঞতা। বর্তমান কাজের মধ্যে যে দক্ষতা প্রকাশ পায় তা প্রধানত অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। অতীতের এক বা একাধিক কাজের প্রভাব শিখনলব্ধ ক্রিয়াকে সক্রিয় করে।

আয়াস বা প্রচেষ্টা (Effort) :

শিখনের মূলে রয়েছে আয়াস বা প্রচেষ্টা। নতুন আচরণ আয়ত্ত করার আগে নানা রকম প্রচেষ্টা চালাতে হয়। এইভাবে প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে ক্রমশ ভুল প্রচেষ্টার সংখ্যা কমে আসতে থাকে এবং শেষে শিক্ষার্থী সঠিক প্রতিক্রিয়াটি আয়ত্ত করে। যেমন—হাতের লেখা, সাইকেল চড়া, টাইপ করা প্রভৃতি কাজগুলি আমরা প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিখে থাকি।

আচরণের উৎকর্ষতা সাধন (Behaviour excellence) :

শিখনের ফলে কর্ম-সম্পাদনের ক্ষমতা উন্নতর হয় এবং নতুন আচরণের সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষভাবে আমাদের পুরাতন আচরণ যখন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের ক্ষেত্রে অনুপযোগী হয়ে পড়ে, তখন সার্থকভাবে অভিযোজনের জন্য পুরাতন আচরণের মধ্যে উৎকর্ষ সাধন করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। তাই পুরোনো আচরণের উৎকর্ষ সাধনই হল শিখন।

নতুন আচরণ (New Behaviour) :

শিখনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যক্তির পুরাতন আচরণের উৎকর্ষ সাধন হয় তা নয়, ব্যক্তিকে অনেক সময় নতুন আচরণও আয়ত্ত করতে হয়। এই আচরণটি তার পূর্বের আচরণ থেকে পৃথক হয়। আমাদের

পূর্ব-অভিজ্ঞতা যেখানে কর্ম-সম্পাদনে ব্যর্থ হয়, সেখানে সেই পুরোনো অভিজ্ঞতাটিকে বর্জন করে নতুন আচরণ শেখা দরকার হয়ে পড়ে। এই ধরনের নতুন আচরণ সম্পাদনের নামই হল শিখন।

আচরণের পরিবর্তন (Changes of Behaviour) :

শিখনের ফলে ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তন ঘটে এবং সে নতুন আচরণ সম্পাদন করার যোগ্যতা অর্জন করে। বস্তুত ব্যক্তি ও পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে আচরণ ধারার মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা যায়, তাই হল, শিখন। এইক্ষেত্রে ব্যক্তির পুরাতন আচরণটি পরিবর্তিত হয়ে যায়।

সংগতি সাধন (Consistency) :

সমাজ পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে টিকে থাকতে হলে সার্থকভাবে অভিযোজন করা দরকার। এইজন্য ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের আচরণ শিখনের মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হয়। এর ফলে জন্মগত প্রবণতাগুলির উন্নতি সাধন হয় কিংবা নতুন আচরণ ধারা গঠিত হয়, আর পরিবেশের তাগিদ অনুযায়ী উপযুক্ত আচরণ আয়ত্ত করা সম্ভব হলেই সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করা সহজ হবে। এইক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণকে উপযুক্তভাবে পরিবর্তিত করা এবং সেই আচরণকে সুদৃঢ় করার প্রক্রিয়াই হল শিখন। তাই শিখন হল সঙ্গতি বিধানের নামান্তর।

লক্ষ্যাভিমুখীনতা (Goal Oriented) :

আমাদের সকল প্রকার শিখন হল লক্ষ্যাভিমুখী। প্রকৃতপক্ষে কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যই আমরা শিখতে বাধ্য হই। ব্যক্তির মধ্যে কোনও সমস্যার সৃষ্টি হলে ব্যক্তি তার সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। অবশেষে সে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছায়। সুতরাং বলা চলে যে, শিখন উদ্দেশ্যবিহীন নয়। বরং এটি একটি উদ্দেশ্যমূলক ও লক্ষ্যাভিমুখী প্রক্রিয়া।

সর্বজনীনতা (Universality) :

শিখন শুধু উন্নত প্রাণী হিসাবে মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জীব মাত্রেই শেখে, যদিও ইতর প্রাণী তাদের জন্মগত আচরণের মাধ্যমে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে পারে, তথাপি নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য তারাও শিখতে বাধ্য হয়। তা না হলে তাদের অস্তিত্ব বিঘ্নিত হবে। তাই শিখন একটি সর্বজনীন প্রক্রিয়া।

অনুশীলন নির্ভর (Practice) :

শিখন অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। পুরাতন আচরণ বর্জন করে নতুন আচরণ আয়ত্ত করার সময় ব্যক্তিকে নতুন আচরণটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য বারবার অনুশীলন করতে হয়। অভ্যাস ছাড়া শিখন কখনও পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তাই শিশু যখন পাঠ্যপুস্তকের নতুন কিছু বিষয় আয়ত্ত করতে চায়, তখন তাকে বারংবার ওই একই কাজ অনুশীলন করতে হয়।

সমস্যা (Problem) :

সমস্যা ছাড়া কখনও শিখন সংঘটিত হতে পারে না। এটি হল শিখনের একটি অপহির্য শর্ত। কারণ সমস্যামূলক পরিস্থিতির চাপেই ব্যক্তি শিখতে বাধ্য হয় এবং পুরাতন আচরণ পরিবর্তন করে নতুন আচরণ আয়ত্ত করে। সমস্যা না থাকলে ব্যক্তি শেখার কোনও তাগিদ অনুভব করত না। তাই প্রত্যেক শিখনের জন্য একটি সমস্যামূলক পরিস্থিতি অবশ্যই থাকা বাঞ্ছনীয়।

পরিণমন (Maturation) :

স্বাভাবিকভাবে শারীরিক বৃদ্ধির ফলে শিশুর যে পরিবর্তন দেখা যায় তাকে বলে পরিণমন। উপযুক্ত পরিণমন না ঘটলে শিখন সম্ভব হতে পারে না। তাই শিশুর শিখনের জন্য উপযুক্ত পরিণতি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এটি একটি প্রয়োজনীয় উপাদান, যেমন—শিশুর পেশি উপযুক্তভাবে পরিপুষ্ট হওয়ার আগে তাকে সাঁতার শেখাতে গেলে সেই প্রচেষ্টা কখনও কার্যকরী হবে না। তাই শিশুর শিখন অনেকাংশে পরিণমনের উপর নির্ভরশীল।

প্রেষণা (Motivation) :

প্রেষণা হল আমাদের অভ্যন্তরীণ স্পৃহা। এটি সকল কাজেই আমাদেরকে শক্তি যোগায়। এটি হল বিশেষভাবে কোনও লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য একটি আন্তরিক তাগিদ। এই তাগিদ প্রাণীর মধ্যে জাগরিত হলে তবেই শিখন সম্ভব হবে। প্রেষণা ছাড়া শিখন কখনোই সম্ভব নয়। সার্থক শিখনের অন্যতম শর্ত হল প্রেষণা। তাই শিখন প্রেষণার উপর নির্ভরশীল।

পরিবর্তনশীল পরিবেশ (Changing environment) :

সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। তাই তার সঙ্গে সার্থক অভিযোজনের জন্য আমাদের শিখন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু পরিবেশ যদি স্থবির হত অর্থাৎ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলি যদি স্থির থাকত, তাহলে আমাদের আচরণের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত করার কোনও প্রয়োজনই হত না আর তার ফলে শিখনেরও দরকার হত না। পূর্বের অর্জিত আচরণের মাধ্যমেই আমরা সব ধরনের পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে সমর্থ হতাম। প্রকৃতপক্ষে পরিবেশের তাগিদই আমাদের আচরণকে পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। বিশেষভাবে সমাজ পরিবর্তনশীল বলেই আমরা নতুন কিছু শিখতে বাধ্য হই।

আত্মসক্রিয়তা (Self-activation) :

পরিবর্তনশীল পরিবেশের দরুন ব্যক্তিকে নতুন আচরণ আয়ত্ত করতে হয় ঠিকই, কিন্তু আত্মসক্রিয়তা ছাড়া শিখন কখনও সংঘটিত হতে পারে না। কারণ শিখন একটি ব্যক্তিনির্ভর প্রক্রিয়া। ব্যক্তি যখন কোনও সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন সে আত্মসক্রিয়তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে সেই সমস্যাটির সমাধানের জন্য

সঠিক উপায় নির্ধারণ করার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে বাইরে থেকে চাপ দিয়ে কোনও নতুন আচরণ আয়ত্ত করানো সম্ভব নয়, বরং আত্মসক্রিয়তাই নতুন আচরণ আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ক্রমপরিবর্তনশীলতা (Mutability) :

শিখন একটি ক্রমপরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া। প্রচেষ্টাকে যদি X-অক্ষ বরাবর এবং শিখনের হারকে Y অক্ষ বরাবর স্থাপন করা যায়, তাহলে যে লেখচিত্রটি পাওয়া যাবে তাকে বলে শিখনের লেখচিত্র (Learning Curve)। এই লেখচিত্রের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, প্রচেষ্টার সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে শিখনের মাত্রাও তত বর্দ্ধিত হবে। যদিও শিখন-মাত্রার এই ধারাবাহিকতা সব সময় একই থাকে না, তবুও এটি সত্য যে প্রচেষ্টার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে শিখনের হার বৃদ্ধি পাবে।

শিখনের প্রকৃতি (Nature of Learning) :

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, শিখন এমন এক জটিল প্রক্রিয়া যে তাকে কোন একটিমাত্র সংজ্ঞা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই শিখনকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে এই প্রক্রিয়ার প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। তা ছাড়া অন্যান্য সমপর্যায়ভুক্ত মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গেও এর পার্থক্য করা দরকার।

শিখন ও পরিবেশ (Learning and Environment) :

শিখনের সংজ্ঞা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পরিবর্তনশীল পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তিজীবনের সীমা রাখার জন্যই শিখনের প্রয়োজন। অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি, বাইরের জগতের তাগিদ থাকলেই শিখন হয়। পরিবেশ যদি স্থবির হত তা হলে আমাদের নতুন আচরণ করার প্রয়োজন হত না। আর শিখনও প্রয়োজন হয় না। তাই শিখন প্রক্রিয়ার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে, বাইরের জগতের বা পরিবেশের তাগিদেই অনেক সময় এই প্রক্রিয়া শুরু হয়।

শিখন ও আত্মসক্রিয়তা (Learning and self-activeness) :

আবার, যখন কোন শিখন, বাইরের বা পরিবেশের তাগিদে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তা ঐ প্রক্রিয়া ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হয়। অতীত অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণের উপর ভিত্তি করে, ব্যক্তি আত্মপ্রচেষ্টায় এই পরিবর্তন সাধন করে। পরিবর্তিত পরিবেশে ব্যক্তি কিভাবে আচরণ করবে, তা সে নিজেই ঠিক করে। সুতরাং শিখন প্রক্রিয়া ব্যক্তির আত্মসক্রিয়তা (Self activity) জাগিয়ে তোলে।

শিখনের চাহিদা ও শিক্ষার উদ্দেশ্য (Learning needs and learning objectives) :

শিক্ষার উদ্দেশ্যের (Aim of Education) দিক থেকে আমরা যদি শিখন প্রক্রিয়ার এই দুটি বৈশিষ্টকে বিচার করি, তা হলে বলতে হয় যে, শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের এই তাগিদ এবং সুযোগ দুটিই গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তাদের সমবেত প্রচেষ্টায় এমন এক উদ্দেশ্য এবং সমস্যা স্থাপন করবেন,

যার জন্য বহুবিধ অভিযোজনের প্রয়োজন হবে। আর এই প্রয়োজনবোধেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে আসবে শিখনের তাগিদ। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় যে নানা রকম পরিবর্তন হচ্ছে, তার অনেক কিছুই এই চাহিদা মেটাতে গিয়ে, একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বলেছেন—"The creation of a favorable environment for learning is the basic function of our system of formal education."

শিখন ও প্রেষণা (Learning and Motiation) :

বহির্জগতের সঙ্গে অভিযোজনের তাগিদ যেমন শিখন প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে, তেমনি অন্তর্জগতের তাগিদ তাকে শক্তি যোগায়। অন্তর্জগতের এই তাগিদকে মনোবিদ্যার পরিভাষায় বলা হয় প্রেষণা (Motivation) প্রেষণা হল ব্যক্তির অন্তরের এমন এক অবস্থা যা তাকে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য বিশেষ এক ধরনের আচরণ করতে উদ্‌বুদ্ধ করে (A motive is a set or a state of the individual which disposes him for certain behaviour and for reaching certain goal)। অর্থাৎ এটি হল বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যক্তির আন্তরিক অবস্থা এই আন্তরিক অবস্থা বা তাগিদকে উদ্দেশ্যমুখী বাহ্যিক বস্তুসামগ্রীর দ্বারা জাগিয়ে তোলা যায় অর্থাৎ, বস্তুজগতে কোন কিছুকে পাওয়ার আগ্রহই প্রেষণাকে জাগ্রত করে এবং তখনই তা শিখনের জন্য প্রয়োজনীয় অভিযোজনে (adjustment) উদ্বুদ্ধ করে। এই ভাবে বহির্জগতের তাগিদ অন্তর্জগতের ইচ্ছাকে সক্রিয় করার মাধ্যমে আমাদের নতুন আচরণধারা গ্রহণে প্রবুদ্ধ করছে এবং এর ফলে শিখন সম্ভব হচ্ছে। যে বস্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করে, তাকে বলা হয় উদ্বোধক (Incentive)। এই উদ্বোধক এবং প্রেষণার পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে শিখন। মনোবিদ গ্যারেট্ (Garrett) বলেছেন, "Learning is a function of motive incentive condition", অর্থাৎ গাণিতিক সংব্যাখ্যানে, শিখন = [প্রেষণা × উদ্বোধক]। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার যে, প্রেষণার দ্বারা শিখন হয় ঠিকই কিন্তু এ কথাও সত্য যে, শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির মধ্যে নতুন নতুন তাগিদ বা প্রেষণারও সৃষ্টি করা যায়। সুতরাং, শিক্ষকের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মধ্যে শুধুমাত্র পাঠ্যবিষয়কে কেন্দ্র করে প্রেষণা জাগ্রত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তাদের মধ্যে নতুন প্রেষণার সৃষ্টি করা ও যাতে করে তারা পাঠ্য পুস্তকের বাইরেও নানা জিনিস জানার আগ্রহ বোধ করে।

শিখন ও ফল (Learning and Outcome) :

শিখনের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এটি একটি মানসিক প্রক্রিয়া (Mental process)। অর্থাৎ, শিখন হল বিকাশের ধারা বিকাশের ফল নয়। সাধারণ অর্থে, আমরা ফলটিকে (Result if Product) মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে একই অর্থে ব্যবহার করি। জ্ঞান (Knowledge), দক্ষতা (Skill) ইত্যাদি যে কথাগুলি আমরা সাধারণত শিখনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, তা হল শিখনের ফল (Result)। কিন্তু যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা এগুলি অর্জন করি মনোবিদরা তাকেই বলেন শিখন। কোন বিশেষ বিষয়ে

জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করার জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে সময়ের পরিসর তার মধ্যে আমাদের মধ্যে যে পরিবর্তন হয়, তাই হল শিখন। সুতরাং একে আমরা অনুশীলন নির্ভর প্রক্রিয়াও বলতে পারি। যদিও সব রকম শিখনের ক্ষেত্রে অনুশীলন প্রয়োজন নাও হতে পারে। এ প্রসঙ্গো আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যদিও শিখন এক ধরনের প্রক্রিয়া (Process) এবং তার ফল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক তবুও শিক্ষকের দায়িত্ব হবে ঐ ফলের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা।

শিখনের ক্রমবিকাশ (Envolution of learning) :

শিখন প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগতে পারে। অনুশীলনের সময় বিভিন্ন পর্যায়ে শিখন কিভাবে হয়। বিভিন্ন মনোবিদদের বিশ্লেষণ থেকে আমরা দেখতে পাই, কোন ব্যক্তি যখন কোন সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তখন সে সমস্যার সমাধানের জন্য তার প্রচলিত আচরণধারার মধ্যে পরিবর্তন আনে বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে। প্রত্যেক প্রচেষ্টায় সে সমস্যার সমাধানের দিকে এগিয়ে যায়। অর্থাৎ, প্রত্যেক পর্যায়ে তার শিখন বা আচরণের পরিবর্তন হয়। প্রতি পর্যায়ের এই উন্নতিকে আমরা যদি লেখচিত্রে (Graph) পরিবেশন করি, তাহলে দেখব যে, এই লেখচিত্র ক্রমশ অনুশীলনের সঙ্গো সঙ্গো উপরের দিকে উঠতে থাকে। একে বলে শিখনের লেখ (Learning Curve)। লেখচিত্রের বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায় শিখন হল ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া (Gradual developing process)। তবে প্রত্যেক প্রচেষ্টায় যে শিখন হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এই লেখচিত্রেও দেখা যায় কয়েকবার অনুশীলনের পর, শিখনের বৃদ্ধির হার কমতে থাকে এবং এক সময় প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

শিক্ষণ ও ব্যক্তিজীবনে ভারসম্য (Balance in teaching and personal life) :

শিখন সব সময় কোন না কোন চাহিদা (need) তৃপ্ত করে। সে চাহিদা ব্যক্তির নিজস্ব হতে পারে, বা সমাজেরও হতে পারে। শিখনের দ্বারা ব্যক্তির যে আচরণের পরিবর্তন হয়, তা উন্নতিকামী। আপাত দৃষ্টিতে যে আচরণ সমাজের কোন চাহিদা মেটাচ্ছে না বা অসামাজিক মনে হচ্ছে, অন্য দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তা ব্যক্তির নিজস্ব কোন চাহিদাকে চরিতার্থ করছে। তবে এটাও ঠিক নয় যে, সব আচরণের পরিবর্তনই শিখন। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অংশে উল্লেখ করব। শিখন সব সময় যে সামাজিক মূল্যেবোধের (Social value) পরিপ্রেক্ষিতে উন্নতি সাধন করে, একথা ঠিক নয়। অপর দিকে ব্যক্তিজীবনের কোন চাহিদা ছাড়াই সমাজ চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য অনেক সময় শিখন হয়। সুতরাং এই দুই ধরনের চাহিদা, ব্যক্তিগত (individual) এবং সামাজিক (Social) পরিতৃপ্তি করে ব্যক্তিজীবনের ভারসাম্য রক্ষার জন্যই শিখন একান্ত প্রয়োজন। শিখনের মূলে এই দু'ধরনের চাহিদা কোন ক্ষেত্রে পৃথকভাবে আবার কোন ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করে। সুতরাং যে কোন শিখনের পেছনে এই চাহিদাকে খুঁজে পাওয়া যাবে বিশ্লেষণ করলে।

শিক্ষন ও পরিণমন (Learning and Maturation) :

শিখনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থাকবে যদি শিখনের সঙ্গো অন্যান্য অনুরূপ প্রক্রিয়ার পার্থক্য নির্ধারণ না করতে পারি। বিশেষভাবে পরিণমনের (Maturation) সঙ্গো। শিখন এক ধরনের বিকাশ বা বুদ্ধির প্রক্রিয়া (Development process)। কিন্তু, পূর্বে আমরা ইঙ্গিত করেছি, সব রকম বৃদ্ধি বা আচরণের পরিবর্তনকে আমরা শিখন বলতে পারি না, কোন রকম শিখন ছাড়াই শিশুর পেশী শক্ত হলে, সে অধিকতর ভারী ওজনের জিনিস তুলতে পারে। বয়স বাড়ার সঙ্গো সঙ্গো পাকস্থলীর আয়তন বাড়ে এবং তার জন্য সে বেশী খাদ্যবস্তু গ্রহণ করতে পারে। এ ধরনের আচরণকে আমরা শিখন বলতে পারি না। কারণ, কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই এই ধরনের আচরণের পরিবর্তন হয়। এই সকল আচরণ পরিণমনের ফল।

৬.৩.৩ শিখনের নির্ধারক (Factors of Learning) :

(A) মনোযোগ (Attention) :

শিখনের একটি গুরুত্বপূর্ণ চলক হল মনোযোগ। সাধারণ অর্থে, মনোযোগ বলতে কোনো বস্তু সম্পর্কে একান্তভাবে সচেতন হওয়াকে বোঝায়। তবে মনোযোগ কী তা সঠিকভাবে বলা খুবই মুশকিল। শিখনের অন্য চলকগুলির মতোই মনোযোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামত আছে। প্রাচীন মনোবিদগণের মতে, মনোযোগ হল একটি মানসিক শক্তি, চর্চার সাহায্যে যার শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। আধুনিক মনোবিদগণের মতে, মনোযোগ মানসিক শক্তি নয়, মনোযোগ হল একটি মানসিক প্রক্রিয়া। মনোযোগের ক্রিয়াশীলতার উপর গুরুত্ব দিয়ে আধুনিক বিভিন্ন মনোবিদ্ মনোযোগের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন—

মনোবিদ স্টাউট (Stout) বলেছেন, "মনোযোগ হল ইচ্ছামূলক মানসিক সক্রিয়তা যা মানুষের জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে।"

মনোবিদ ম্যাকডুগাল (MeDougall) বলেছেন, "মনোযোগ হল এমন এক প্রকার মানসিক সক্রিয়তা যা আমাদের প্রত্যক্ষণের উপর প্রভাব বিস্তার করে।"

মনোবিদ রস (Ross) বলেছেন, "মনোযোগ হল সেই প্রক্রিয়া যা চিন্তাজগতের কোনো বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে মনের সামনে নিয়ে আসে।"

মনোবিদ ফ্লেচার (Fletcher) বলেছেন, "মনোযোগ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে পরিবেশের পর্যবেক্ষণযোগ্য বিষয়গুলি থেকে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়কে নির্বাচন করে এবং অবশিষ্টগুলিকে বর্জন করে।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে বলা যায় যে, মনোযোগ হল সেই মানসিক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আমরা

অসংখ্য উদ্দীপকের মধ্য থেকে একটি উদ্দীপককে নির্বাচন করে তার প্রতি সাড়া দিয়ে থাকি। আমাদের চেতনার পরিধিতে যে অসংখ্য বস্তু থাকে তার বেশিরভাগই থাকে আমাদের চেতনার প্রান্তসীমায়। এই বস্তুগুলি থেকে যদি কোনো বস্তুকে চেতনার কেন্দ্রস্থলে এনে তার স্বরূপকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হয়, তাহলে যে মানসিক প্রক্রিয়ার সহায়তা দরকার তাই হল মনোযোগ।

মনোযোগের স্বরূপ (Nature of Attention) :

(i) চেতনার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে কোনো বিশেষ বিষয়ে মনঃসংযোগ করাই হল মনোযোগ।

(ii) মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া, কোনো মানসিক শক্তির ফল নয়।

(iii) মনোযোগের মধ্যে জ্ঞান, অনুভূতি এবং কর্মপ্রেরণা—এই তিনটি বিষয়ই বর্তমান।

(iv) মনোযোগ ব্যক্তিকে তার পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে সাহায্য করে।

(v) মনোযোগ কোনো বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট উপলব্ধি ঘটায়।

মনোযোগ বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Attention) :

(১) ইচ্ছামূলক মানসিক প্রক্রিয়া (Willful mental process) :

মনোযোগ একটি ইচ্ছামূলক মানসিক প্রক্রিয়া কারণ। এই প্রক্রিয়াটিকে একটি নির্দিষ্ট দিকে চালিত করতে হয়।

(২) কেন্দ্রানুগ প্রক্রিয়া (Centralized process) :

মনোযোগের ফলে নির্দিষ্ট বস্তুটি আমাদের চেতনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হয়। মনের বিভিন্ন স্তরকে যদি দুটি এককেন্দ্রীয় বৃত্তের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে চিত্রানুযায়ী বাইরের বড়ো অংশটি হল 'অবচেতন মন' (Unconscious mind) আর কেন্দ্রটি হল চেতন মনের কেন্দ্র (Core of consciousness)। ভিতরে ছোটো বৃত্তটি হল চেতনার ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রের অন্তর্গত যে-কোনো বস্তু সম্পর্কে আমরা সচেতন।

(৩) নির্বাচনি ক্ষমতা (Electoral power) :

আমরা এক সঙ্গে একাধিক বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি না। মনোযোগ দেওয়ার জন্য অসংখ্য উদ্দীপকের মধ্য থেকে একটিমাত্র উদ্দীপককেই নির্বাচন করে থাকি। অর্থাৎ, মনোযোগ প্রক্রিয়ায় বস্তুর নির্বাচন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং, মনোযোগের নির্বাচনি ক্ষমতা আছে।

(৪) **পরিবর্তনশীলতা (Changeable) :**

মনোযোগ কোনো বিষয়বস্তুতে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। একটি বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ক্রমাগত সঞ্চালিত হতে থাকে। তাই মনোযোগ নিয়ত পরিবর্তনশীল।

(৬) উদ্দেশ্যমূলক (Purposeful) :

মনোযোগ একটি উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়াকরণ। মনোযোগ অনির্দিষ্ট বস্তুকে সুনির্দিষ্ট করে এবং অস্পষ্ট বস্তুকে সুস্পষ্ট করে তোলে।

(৭) অনুসন্ধানী (Investigative) :

মনোযোগ হল অনুসন্ধানী। বিষয়বস্তুকে নতুনত্ব, অভিনবত্ব বা বৈচিত্র্য না থাকলে সেই বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না।

(৮) ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দিক (Positive and negative aspects) :

মনোযোগের দুটি দিক। যে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হই সেটি হল মনোযোগের ধনাত্মক দিক, আর যে বিষয়টিকে বর্জন করি সেটি হল ঋণাত্মক দিক।

(B) প্রেষণা (Motivation) :

প্রেষণা (Motive) বা প্রেষণা ক্রিয়া (Motivation) কথাটি আমরা সাধারণভাবে যেমন বহু অর্থে ব্যবহার করি, তেমনি মনোবিদ্যায় এর কোন একক অর্থ ও তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অভিধানেও আমরা এই শব্দের বরকম অর্থ দেখতে পাই। তাই প্রেষণা বা প্রেষণ ক্রিয়া বলতে কি বোঝায়, সে সম্পর্কে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসার জন্য নোরাস্তা (Nobraska) বিশ্ববিদ্যালয়ে 1958 সালে বিশ্বের সকল মনোবিদগণের এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। কিন্তু এই আলোচনাচক্রের বিবরণ এত দীর্ঘ যে, তার দ্বারা প্রেষণা বা প্রেষণ প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আমরা এখানে তাই প্রকৃত পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রেষণা ও প্রেষণ প্রক্রিয়ার এক কার্যকরী সংজ্ঞা গঠনের চেষ্টা করব। এই কার্যকরী সংজ্ঞা আমাদের শিখন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা করলেই যথেষ্ট। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, যে কোন ধরনের আচরণ সম্পাদন করার পর আমরা তার ব্যাখ্যার জন্য কোন নির্দিষ্ট প্রবণতাকে নির্দেশ করি। যেমন, ধরা যাক একটি শিশু কাঁদছে। আমরা অনুমান করি তার খিদে পেয়েছে, তাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করি। খাওয়ানোর ফলে যদি তার কান্না বন্ধ হয়, তা হলে এই পর্যায়ে আমরা অনুমান করি, ক্ষুধার তাড়নায় (Hunger drive) শিশুটির কান্নার আচরণ দেখা দিয়েছিল এবং খাওয়ার পর সেই তাড়নার নিবৃত্তি হয়েছে। ক্ষুধা এখানে এক ধরনের তাড়না (Drive)। কিন্তু, এ রকম অভিজ্ঞতাও আমাদের আছে, শিশুরা অনেক সময় ক্ষুধা পেলেও খাদ্যবস্তুর আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করে। খেলায় মেতে থাকে। আবার বয়স্ক মানুষ খাদ্য গ্রহণের জন্য, ক্ষুধার তাড়নার অপেক্ষা করে না, সময়মত খাদ্যগ্রহণ করে। তাই তার এই ধরনের আচরণ ব্যাখ্যা করার পক্ষে শুধুমাত্র জৈবিক তাড়নাই (Organic need) যথেষ্ট নয়। এই শ্রেণীর আচরণের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য মনোবিদগণ আরও দীর্ঘস্থায়ী মানসিক প্রবণতা বা মানসিক স্থায়ী অবস্থার কথা বলেছেন, তাদেরই বলা হয় প্রেষণা

(Motive)। অর্থাৎ, সাধারণ অর্থে প্রেষণাও হল উদ্দেশ্যমুখী আচরণের সম্পাদনের প্রবণতা (Motives are set or state of the individual which disposes him for some goal directed behaviour)। এই অর্থে শ্লেষণ ক্রিয়া (Motivation) হল এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার প্রেষণার সঙ্গে যুক্ত বস্তুকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়।

মনোবিদ সুইফট্ (Swift) এই প্রক্রিয়ার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "Motivation is a dynamic process initiating and directing behaviour, continuous but fluctuating in intensities, and aimed at satisfaction of his individuals needs". অর্থাৎ ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য যে পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া তার আচরণধারাকে সতত নিয়ন্ত্রণ করে, তাই হল প্রেষণ প্রক্রিয়া।

প্রেষণার প্রকৃতি (Nature of Motivation) :

(i) প্রেষণা কর্মে উদ্‌বুদ্ধ করে।

(ii) প্রেষণা আচরণ নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রণ করে।

(iii) প্রেষণা বহু আচরণের মধ্যে নির্দিষ্ট আচরণ বাছাই করতে পারে।

(iv) প্রেষণা একটি ব্যক্তিগত চাহিদা থেকে শুরু হয়। এই চাহিদা জৈবিক, মানসিক বা সামাজিক হতে পারে।

(v) ব্যক্তি তার চাহিদা পূরণের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সক্রিয়তাই প্রেষণা প্রক্রিয়ার গতি নির্ধারণ করে।

(vi) প্রেষণা ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্দেশ্যমুখী আচরণে প্রবৃত্ত করে।

(vii) প্রেষণা উদ্দেশ্যমুখী বলে, যে-কোনো ধরনের প্রেষণাযুক্ত কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকে।

(viii) প্রেষণা খুব সরল প্রক্রিয়া নয়। যে-কোনো বিশেষ মুহূর্তে ব্যক্তির প্রেষণা বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন শক্তিতে কাজ করে।

(ix) প্রেষণা জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। চাহিদার তাড়নায় ব্যক্তির দৈহিক বা মানসিক যে পরিবর্তন ঘটে প্রেষণার ফলে চাহিদার নিবৃত্তিতে সেই ভারসাম্য ফিরে আসে। এই অবস্থাকে বলা হয় স্থিতাবস্থা।

(x) প্রেষণার একটি বাধ্যতামূলক ক্ষমতা (Compelling tendency) আছে। এই ক্ষমতা নির্ধারিত হয় চাহিদার প্রকৃতি ও লক্ষ্যের দ্বারা।

প্রেষণার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Motivation) :

প্রেষণার প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিম্নোক্তভাবে প্রেষণাকে শ্রেণিকরণ করা হয়।

A. শারীরিক প্রেষণা (Physiological Motives) :

প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য প্রেষণাগুলিকে এই শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—খাদ্য, পানীয়, বাতাস, যৌনতা, শরীরের দূষিত পদার্থ নিঃসরণ, দেহের তাপ ইত্যাদি আবেগকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

B. ব্যক্তিগত প্রেষণা (Personal Motives) :

প্রত্যেক ব্যক্তিই একটি অনন্য ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। ব্যক্তিসত্তাকে ভিত্তি করে যে প্রেষণাগুলি কার্যকরী হয় তাকে ব্যক্তিগত প্রেষণা বলে। এই ধরনের প্রেষণা অসংখ্য। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত পার্থক্য যত অধিক হবে তত এই ধরনের প্রেষণার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এই ধরনের প্রেষণা যা সকলের মধ্যে দেখা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—আগ্রহ, মনোভাব, মূল্যবোধ, আত্মসচেতনতা, আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি। আত্মপ্রকাশের চাহিদা এই ব্যক্তিগত প্রেষণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। মনোবিদ ম্যাসলো বলেন, প্রতিটি ব্যক্তিই নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। এই চাহিদাকে কেন্দ্র করে যে প্রেষণা সৃষ্টি হয় তাকেই আত্মপ্রকাশের প্রেষণা বলে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রেষণাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

C. সামাজিক প্রেষণা (Social Motives) :

মানুষ সামাজিক প্রাণী, সে সমাজে বাস করে। সমাজ প্রয়োজন মতো তার সদস্যদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজে বাস করার ফলে যে চাহিদাগুলি তৈরি হয় এবং সেই চাহিদাগুলি পূরণের জন্য যে প্রেষণা কার্যকরী হয় তাকে সামাজিক প্রেষণা বলে। সামাজিক প্রেষণা সামাজিক পরিবেশেই অর্জিত হয়। ব্যক্তির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জীবনদর্শন সামাজিক প্রেষণাকে প্রভাবিত করে। সামাজিক প্রেষণাই ব্যক্তিদের সংঘবদ্ধ করে এবং এর বিকাশের উপর সামাজিক প্রগতি নির্ভর করে। সামাজিক প্রেষণার মধ্যে অন্যতম হল সামাজিক মর্যাদা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, আত্মসম্মান, অর্থ ইত্যাদি। সামাজিক প্রেষণাগুলির উপর শিক্ষার যথেষ্ট প্রভাব আছে। শিক্ষার লক্ষ্যপূরণে সামাজিক প্রেষণার সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উপরিউক্ত তিন প্রকারের প্রেষণা পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। ব্যক্তিজীবনে তারা সম্মিলিতভাবে ক্রিয়াশীল হয়। প্রেষণাকে আবার উদ্‌বোধকের (Incentives) ভিত্তিতে দু-ভাগে ভাগ করা হয়—অভ্যন্তরীণ প্রেষণা এবং বাহ্যিক প্রেষণা। নিজের তাগিদেই যে প্রেষণা সৃষ্টি হয় তাই হল অভ্যন্তরীণ প্রেষণা। অপরদিকে যে প্রেষণা বাহ্যিক কোনো প্রভাবের দ্বারা সৃষ্টি হয় তা বাহ্যিক প্রেষণা বলে পরিচিত।

A. অভ্যন্তরীণ প্রেষণা (Intrinsic Motivation) :

কোনো কোনো ব্যক্তি তার নিজের মধ্য থেকে বিশেষ লক্ষ্যপূরণের তাড়না অনুভব করে। এই তাড়না অনুভব করার জন্য বাইরে থেকে কোনো উদ্দীপকের প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ ব্যক্তি নিজের চেষ্টাতেই বিষয়টিকে শিখতে চেষ্টা করে। এই ধরনের প্রেষণা প্রক্রিয়া-ই অন্তস্থ বা অভ্যন্তরীণ প্রেষণা। এইসব ব্যক্তি কাজ করবার আনন্দেই কাজ করে থাকে ফলের কথা চিন্তা করেন না। প্রেষণার কার্যকারিতার দিক থেকে বিবেচনা করলে এটি একটি আদর্শ অবস্থা। কিন্তু সব ব্যক্তির মধ্যেই এই ধরনের প্রেষণা দেখা যায় না। কারণ অধিকাংশ ব্যক্তি কোনোক্রমে লক্ষ্যপূরণ করতেই উৎসাহী।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের কর্তব্য হল, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ওই ধরনের প্রেষণা জাগ্রত করা, যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রতি আস্থাশীল হতে পারে। এই ধরনের প্রেষণা জাগ্রত করতে হলে শিক্ষককে সহানুভূতিশীল, বিষয়ে পাণ্ডিত্য, উন্নত শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রয়োগ ইত্যাদির অধিকারী হতে হবে। শিক্ষকের মধ্যে এই ধরনের গুণাগুণ থাকলেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ প্রেষণা জাগবে এবং ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের শিখনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

B. বাহ্যিক প্রেষণা (Extrinsic Motivation) :

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা জাগিয়ে তোলার জন্য কোনো বিমূর্ত উদ্দীপক যেমন—প্রশংসা, অধিক নম্বর ইত্যাদি অথবা মূর্ত উদ্দীপক পুরস্কার, সার্টিফিকেট ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। এই ধরনের কোনো বিমূর্ত বা মূর্ত উদ্দীপকের মাধ্যমে প্রেষণা জাগানোকেই বাহ্যিক প্রেষণা বলে। যেমন—স্কুলের নিয়মকানুন মেনে চললে স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করেন। প্রতিদিন ক্লাসে উপস্থিত থাকলে তাদের পুরস্কার দানের ব্যবস্থা থাকে। পরীক্ষায় ভাল ফল করলে শিক্ষার্থীদের (1, 2য়, 3য় স্থানাধিকারী ইত্যাদির) পুরস্কার দেওয়া হয়। এগুলি শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সারে সাহায্য করে। তবে এই ধরনের বাহ্যিক প্রেষণা বেশি দিন স্থায়ী হয় না।

সুতরাং শিক্ষকের কর্তব্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম দিকে বাহ্যিক প্রেষণাকে কাজে লাগিয়ে ধীরে ধীরে যাতে তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ প্রেষণা জাগ্রত হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা। নতুন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে শিখন প্রচেষ্টাকে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

প্রেষণার আর-একটি শ্রেণিভাগ হল সচেতন প্রেষণা এবং অচেতন প্রেষণা। ব্যক্তির আচরণ পর্যবেক্ষণ করে চেতন প্রেষণা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। অবচেতন প্রেষণা যেহেতু বাহ্যিকভাবে ক্রিয়াশীল হয় না তাকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার ভূমিকা (Role of Motivation in Learning) :

প্রেষণা শিখন প্রক্রিয়াতে বিভিন্নভাবে কাজ করে। এগুলি হল—

1. প্রেষণা ব্যক্তির কর্মে উদ্যম বা শক্তি জোগায়। প্রত্যেক আচরণের জন্য প্রয়োজন উদ্যমের। প্রেষণার মাধ্যমে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ উদ্যমকে জাগানো প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্য উদ্যম সৃষ্টির জন্য শাস্তি প্রশংসা, নিন্দা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের উদ্‌বোধক ব্যবহার করা হয়। এইসব উদ্‌বোধকগুলি স্থায়ীভাবে শিক্ষার্থীদের উদ্যম সৃষ্টি করতে পারে না। শিক্ষণীয় বিষয়কে যদি বিভিন্নভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তবে তা উদ্‌বোধকের কাজ করে শিক্ষার্থীদের স্থায়ী প্রেষণা সৃষ্টি করে।
2. আচরণের প্রকৃতি নির্বাচন করা। আমাদের আচরণের প্রকৃতি নির্বাচনধর্মী। এই নির্বাচনমূলক আচরণের পশ্চাতে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকের প্রেষণার বিভিন্নতা। যখন কোনো ক্লাসে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ দেবেন সেটিকে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত, নতুবা বিভিন্ন শিক্ষার্থী তার আগ্রহ অনুযায়ী ওই পাঠের বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগ দেবে এবং তার ফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।
3. প্রেষণার ফলে মানুষ শুধু কাজে উদ্যোগী হয় তাই নয়, কাজটি যাতে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায় সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। প্রেষণার দরুণ মানুষ নিজের চেষ্টাতেই অনেককাজ করে। বাধা এলেও তাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে। এই বাধা অতিক্রম করার জন্য অন্যের সাহায্য নিতেও সে দ্বিধা বোধ করে না। শিক্ষাকে কার্যকর করতে হলে শিক্ষার্থীকে যেমন উদ্যোগী করতে হবে তেমনি তাকে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে। লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলেই শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা লক্ষ্যের উপযোগী হবে এবং অনর্থক বা অপ্রয়োজনীয় আচরণ করে সময় ও শ্রমের অপব্যয় করবে না। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য শিক্ষক, অভিভাবক ও সহকর্মীদের সাহায্য নেবে।
4. প্রেষণা শিক্ষার্থীর শিখন কৌশলকেও প্রভাবিত করে। প্রেষণার দরুণ শিক্ষার্থীর কোনো কিছু শেখার জন্য প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। পাঠকে অর্থপূর্ণ ভাবে শেখার সম্ভাবনা বাড়ে। ডিউই-র মতে শিক্ষার প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা-ই যাতে শিক্ষার্থীর কাছে অর্থপূর্ণ হয় সেদিকে নজর দেওয়া শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য। শেখার সময় কেবলমাত্র যান্ত্রিক প্রচেষ্টা বা ভুল পদ্ধতিতে না শিখে শিক্ষার্থী যাতে অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগ করতে পারে সে বিষয়ে তাকে সাহায্য ও পরিচালনা করা শিক্ষকের কর্তব্য।
5. প্রেষণা শিক্ষার্থীদের আচরণের গতিপথ নির্ণয় করে। কোনো বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছোতে হলে কেবল আচরণ করলেই চলবে না, সেই আচরণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে উপযুক্ত লক্ষ্যে পৌঁছোনো যায় এবং তা থেকে চাহিদাও তৃপ্তি ঘটে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের কর্তব্য হল

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন আচরণের মধ্য থেকে যাতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আচরণটি বেছে নিতে পারে সে সম্বন্ধে তাকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া।

(C) স্মৃতি (Memorization) :

মানুষের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র সচেতন স্তরের উপর নির্ভরশীল নয়। অবচেতন মনও অনেকাংশে মানুষের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক ঘটনা আমাদের অবচেতন মনে জমা হয় এবং মাঝে মাঝে তা সচেতন মনে আসে, কিন্তু সর্বদা চেষ্টা করে অবচেতন মন থেকে ঘটনাগুলিকে চেতন স্তরে নিয়ে আসা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। মনের এই অবচেতন স্তর থেকে পূর্ব অভিজ্ঞতাকে চেতন স্তরে পুনরুদ্রেক করছি হল স্মরণক্রিয়া (Memory)। মনোবিদ্যায় 'স্মৃতি' বলতে কোনো গুণকে বোঝায় না, 'স্মরণ ক্রিয়াকে বোঝানো হয় (Process of memory)। Bentley এবং তাঁর অনুগামীরা মনে করেন মানুষ যে অভিজ্ঞতাগুলি অর্জন করে তা মস্তিষ্কে একটি ছাপ রেখে যায়। এই মনোবিজ্ঞানীরা ধারণাক্রিয়াকে (Retention) একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া (Physiological Process) বলে মনে করেন। কিন্তু Bartlett, Prion, Gibson এবং আরও কিছু মনোবিজ্ঞানী স্মৃতিকে একটি মানসিক প্রক্রিয়া (Mental Process) বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন স্মৃতি অনেকাংশেই অনুরাগ (Interest), প্রেষণা (Motivation) প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রতিটি মানসিক প্রক্রিয়ারই একটি শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি (Physiological Basis) বর্তমান। এটি স্মৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই স্মৃতিকে একটি জৈব-মানসিক প্রক্রিয়া (Psycho-physoilogical Activity) বলে মনে করা হয়। স্মৃতি আসলে কী? সে সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের যেসব মতামতকে ব্যক্ত করেছেন সেগুলিকে আমরা স্মৃতির সংক্ষা বলে থাকি।

স্মৃতির ধারণা (Concept of Memory) :

সংরক্ষিত অভিজ্ঞতাকে পুনরায় মনের মধ্যে যথাসম্ভব অবিকল জাগিয়ে তোলার ক্ষমতাকে স্মৃতি বলে এবং এই প্রক্রিয়াকে স্মরণক্রিয়া বলা হয়। তবে স্মৃতিকে কোনো একটি বিশেষ সংজ্ঞার দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। স্মৃতিকে তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। যেমন—

প্রচলিত অর্থে (Conventional Meaning) : প্রচলিত সাধারণ অর্থে স্মৃতিকে একটি গুণবাচক বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আমরা বলি, শ্যামলের স্মৃতি খুব প্রখর, ও একবার শিখলে আর সহজে ভোলে না বা কমলের একেবারেই স্মৃতিশক্তি নেই, ও কিছুই মনে রাখতে পারে না।

প্রাচীন ধারণা (Traditional Concept) : প্রাচীনকালে স্মৃতিকে একপ্রকার মানসিক শক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হত, বলা হত, স্মৃতি মনের একটি ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে আমাদের অভিজ্ঞতার ছাপগুলি জমা হয়।

দার্শনিক অর্থে (Philosophical Meaning) : দার্শনিকদের মতে, যেসব অভিজ্ঞতা বর্তমানে

চেতন-মনে নেই, অথচ পূর্বে ছিল, সেইসব অভিজ্ঞতা বা ধারণাকে চেতনার স্তরে আনার ক্ষমতাই হল স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া।

মনোবৈজ্ঞানিক অর্থে (Psychological Meaning) : মনোবিজ্ঞানে স্মৃতিকে কোনো গুণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, স্মৃতি বলতে স্মরণক্রিয়াকেই বোঝায়।

আধুনিক অর্থে (Modern Meaning) : স্মরণক্রিয়া সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূচনা করেন মনোবিদ এবিংহস (Ebbinghaus) বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার পর আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা স্মরণক্রিয়ার যে বিভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তা এখানে আলোচনা করা।

মনোবিদ স্টাউট (Stout) বলেছেন, "পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গো পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে আদর্শগতভাবে তাকে পুনরায় মনে করার প্রক্রিয়াই হল স্মৃতি।"

মনোবিদ উডওয়ার্থ (Woodworth)-এর মতে, "যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা পূর্বে শেখা কোনো বিষয়কে একইভাবে পরবর্তীকালেও সম্পাদন করতে পারি, তাই হল স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া।"

মনোবিদ টেলফোর্ড (Telford) বলেছেন, "শিখনের ফলে আচরণের পরিবর্তন হয়, আর সেই পরিবর্তনকে ধারণ করে রাখার প্রক্রিয়াই হল স্মৃতি।"

মনোবিদ রস্ (Ross) বলেছেন, "যে জটিল মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ন, সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্রেক হয়, তাই হল স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া।" মনোবিদ্ রস্ প্রদত্ত সংজ্ঞাটিকে স্মৃতির সম্পূর্ণ সংজ্ঞা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তিনি স্মৃতিকে শিখনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেননি বরং স্মরণক্রিয়ার মধ্যে শিখন প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করেছেন। কারণ, শিখনের উদ্দেশ্য হল আচরণের পরিবর্তন দ্বারা ভালো ফল পাওয়া, আর যার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতার পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংরক্ষণ। সুতরাং স্মরণক্রিয়ার অন্তর্গত হল—শিখন, সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্রেক।

স্মৃতির উপাদানসমূহ (Factors of Memory) :

1. **সাংকেতিকীকরণ (Encoding) :**

   সাংকেতিকীকরণের মাধ্যমে কোনো তথ্য অনেক বেশি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থপূর্ণ তথ্য স্থায়ী স্মৃতিতে স্থানান্তরিত হয়, এর ফলে ব্যক্তি কোনো নতুন অভিজ্ঞতাকে তার অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গো সংযুক্ত করে যা তাকে পরবর্তীকালে কোনো নতুন সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে, অর্থাৎ এটি একটি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়নের প্রক্রিয়া। এটি একটি ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়াও বটে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই মনের মধ্যে ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতার স্থিরীকরণ (Fixation) ঘটে। কোনো বিষয়ে তথ্যের সাংকেতিকীরণ না ঘটলে তাকে স্মরণ করার কোনো প্রশ্নই আসে না।

2. ধারণা (Storage) :

কোনো বিষয় যদি আমাদের মনের মধ্যে সংরক্ষিত না হয় তাহলে তাকে স্মরণ করা সম্ভব নয়। আবার আমরা যা কিছু শিখি তার পুরোটাই আমাদের স্মৃতিতে রাখতে পারি না। নির্দিষ্ট সময় পরে আমাদের মন যেটুকু সংরক্ষণ করে রাখতে পারে, তাই হল ওই সময়ের মধ্যে ধারণের পরিমাণ। যে মানসিক প্রক্রিয়া এই ধারণা সাহায্য করে, তাই হল ধারণ ক্রিয়া সাধারণ অর্থে একেই আমরা স্মৃতিশক্তি বলে থাকি।

3. পুনরুদ্রেক (Retrieval) :

পুনরুদ্রেক হল সেই সব মানসিক প্রক্রিয়া যেগুলি শিখনলব্ধ অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ উদ্দীপকের অবর্তমানে, মানসিক কল্পের সাহায্যে পুনরায় চেতনায় আনতে সাহায্য করে। অর্থাৎ সংরক্ষিত অভিজ্ঞতাকে পুনরায় মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলা। কোনো বিষয়বস্তু শিখনের পর তার কতটুকু সংরক্ষিত আছে তা নির্ভর করে, যতটুকু পুনরুদ্রেক করা সম্ভব হয় না। সুতরাং ধারণ ক্রিয়ার অস্তিত্ব নির্ভর করে পুনরুদ্রেকের উপর।

পুনরুদ্রেক দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে। এই দুটি প্রক্রিয়া হল—(a) অভিভাবন প্রক্রিয়া (Process of Suggestion) এবং (b) অনুষঙ্গের নিয়ম (Law of Association)।

(D) চিন্তন (Thinking) :

যেসব মানসিক প্রক্রিয়া আমাদের জ্ঞান আহরণে বিশেষভাবে সাহায্য করে বা আমাদের শিখনে সহায়তা করে, তাদের মধ্যে চিন্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চিন্তন শুধুমাত্র শিখন প্রক্রিয়ার পরিচালনায় সহায়তা করে তাই নয়, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর যথাযোগ্য মানসিক সংগঠনে সাহায্য করে। চিন্তালব্ধ জ্ঞানের বা শিখনের প্রয়োগের সম্ভাব্যতা অনেক বেশী। তাই আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে বা শিক্ষা মনোবিদ্যায় চিন্তন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। দার্শনিকগণ মনে করেন, চিন্তন (Thinking) মনের অস্তিত্বের পরিচায়ক। প্রাচীন দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছেন, চিন্তন প্রক্রিয়া মানুষকে অন্যান্য ইতর প্রাণী থেকে পৃথক করে রেখেছে। চিন্তনের অস্তিত্বের কথা বিচার করে দার্শনিকগণ মানুষের অভিজ্ঞতার জগৎকে দু'ভাবে ভাগ করেছেন। একটি হল সংবেদনগত নিতান্তই বস্তুময় জগৎ; অপরটি হল চিন্তার জগৎ বা চিন্ময় জগৎ। এই দ্বিতীয় জগতেই সে বিমূর্ত চিন্তার সাহায্যে বিশ্ব প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং, চিন্তনের প্রকৃত কাজ হল ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতার ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম করে, ইন্দ্রিয়াতীতলোকে জ্ঞানের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা। কিন্তু এই চিন্তন-ক্রিয়ার স্বরূপ কি?

চিন্তনের স্বরূপ (Nature of Thinking) :

সাধারণ অর্থে যে কোন জ্ঞানদায়ক অবগতিকে (Cognition) আমরা চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করি। সুতরাং এই ধারণা অনুযায়ী, প্রত্যক্ষ (Perception), স্মৃতি (Memory), কল্পন (Imagination) ইত্যাদি যে কোন জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াকেই আমরা চিন্তন বলতে পারি। যেমন, দার্শনিক লক্ (Lock) চিন্তনকে এক বিশেষ ধরনের প্রত্যক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—"Thought is the perception of the agreement and disagreement of ideas" অর্থাৎ, বিভিন্ন ধারণার মধ্যে মিল ও অমিল প্রত্যক্ষ করার প্রক্রিয়াই হল চিন্তন। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা বিশেষ থেকে সাধারণ ধারণায় আসা যায়, যুক্তির দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে আসা যায়, সম্বন্ধের আবিষ্কার ও সমস্যার সমাধান করা যায়, তাকেই বলা হয় চিন্তনক্রিয়া (Thinking)। অনেক সময়ে তাই মনোবিদ্যায় চিন্তনের প্রতিশব্দ হিসেবে ভাবনার বিস্তার (Elaboration) কথাটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু চিন্তনের এটি সংকীর্ণ অর্থ। সব জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াকে চিহ্ন বলা যায় না। সুতরাং, চিন্তা কি, তা জানতে হলে তাকে আরও বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার।

চিন্তন ও প্রত্যক্ষণ (Thinking and Perception) :

চিন্তন যে কি, তা সঠিকভাবে বলতে হলে তার বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করার দরকার এবং সেই প্রসঙ্গে অন্যান্য সমজাতীয় মানসিক প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে তার পার্থক্য করার দরকার। সাধারণ অর্থে চিন্তন ও প্রত্যক্ষণকে (Perception) একই শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য থেকে চিন্তনের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে। চিন্তনের সঙ্গে প্রত্যক্ষণের প্রধান পার্থক্য হল, প্রত্যক্ষণ বস্তুনির্ভর, কিন্তু চিহ্ন বস্তুনির্ভর নয়। প্রত্যক্ষণের জন্য উদ্দীপকের প্রয়োজন। কিন্তু চিন্তন বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। চিন্তার ক্ষেত্রে বস্তুর উপস্থিতি প্রয়োজন হয় না। প্রত্যক্ষণের দ্বারা বিশেষ বস্তু সম্পর্কে আমরা জ্ঞানলাভ করে থাকি। এই প্রত্যক্ষণলব্ধ বিষয়বস্তুকে বলা হয় প্রত্যক্ষিত বস্তু বা প্রত্যক (Percept)। অন্যদিকে চিন্তন দ্বারা আমরা বিশেষ এক শ্রেণীর বস্তু সম্পর্কে ধারণা পাই। চিন্তা হয় ভাবমূর্তি বা কল্পের (Image) সাহায্যে।

চিন্তন ও সামগ্রিক জ্ঞান (Thinking and Complete Knowledge) :

এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, চিন্তনের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, এর দ্বারা কোন বিশেষ এক শ্রেণীর বস্তু সম্পর্কে আমরা সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করি। কোন বস্তু সম্পর্কে আমরা যখন চিন্তা করি, তখন ঐ বস্তুর কোন গুণ (Quality), ভাব (Characteristic) বা অর্থকে (Context) বিশ্লেষণ করি। 'বস্তুর অর্থ' বলতে তার পরিবেশগত তাৎপর্যকে বোঝায়। অন্য বস্তুর সঙ্গে তার সম্বন্ধ, সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য বিচারকরে তাকে একটি বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত করি। এইভাবে বস্তুর যে অর্থ বা গুণবোধ হয়, তা ঐ জাতীয় সব বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মনোবিদ্‌গণ তাই বলেছেন, চিন্তনের বিষয়বস্তু সব সময়ই সাধারণ প্রকৃতির (General) হয় এবং প্রত্যক্ষণের বস্তুর মত তা স্থান কালের গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; একেবারেই মুক্ত।

চিন্তন ও বিমূর্তজ্ঞান (Thinking and Abstract Knowledge) :

প্রত্যক্ষণ যেমন আমাদের জ্ঞানের বস্তুকে কেন্দ্র করে হয়, চিন্তনে তা হয় না। যখন কোন বস্তু, ব্যক্তি বা সমস্যা নিয়ে আমরা চিন্তা করি, তখন সে বস্তুর সব অংশের কথা একসঙ্গে ভাবি না। তার কোন বিশেষ গুণকে আলাদা করে নিয়ে ভাবি। ফুলকে প্রত্যক্ষ করার জন্য তার বিভিন্ন অংশকে পৃথক করে নিয়ে দেখা যায় না। কিন্তু ফুলের সৌন্দর্যকে ফুল থেকে পৃথক করে নিয়ে অনুধাবন করা চিন্তায় সম্ভব। এই জন্যই চিন্তাকে বিমূর্ত (Abstract) বলা হয়। মনোবিদ কফকা (Kofika) চিন্তনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনাকালে তাই মন্তব্য করেছেন, আমাদের চিন্তনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, আমরা বস্তুকে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যক্ষ না করেও তার সম্পর্কে বিমূর্ত চিন্তা করতে পারি। চিন্তনের ক্ষেত্রে তাই আমরা প্রতীক (Symbol) ব্যবহার করে থাকি। এই প্রতীক (Symbol) বা চিহ্ন (Sign) মূর্ত বস্তুর প্রতিস্থাপিতরূপ হিসেবে কাজ করে।

চিন্তন ও বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া (Thinking and Analytical-Synthetical Process) :

চিন্তনে, বস্তুর বিভিন্ন গুণকে বিচ্ছিন্ন করে বিমূর্ত অবস্থায় দেখা সম্ভব হয়, বিশ্লেষণ ক্রিয়ার মাধ্যমে (Analytic process)। এই বিশ্লেষণী ক্ষমতা চিন্তনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবার কোন বস্তুর বিশেষ গুণ সম্পর্কে বিশেষ ধারণা পেতে হলে তাকে শুধু বিশ্লেষণ করলেই চলবে না, তাদের সংযুক্তিকরণ বা সংশ্লেষণ (Synthesis) করা প্রয়োজন কারণ, বিচ্ছিন্ন গুণগুলিকে বিচার করে তাকে আবার বস্তুর মধ্যে আরোপ করাই হল চিন্তার ধর্ম। সুতরাং, চিন্তনে বিশ্লেষণ (Analysis) এবং সংশ্লেষণ (Synthesis) এই দুধরনের প্রক্রিয়াই পর্যায়ক্রমে কাজ করে।

চিন্তন ও উদ্দেশ্য (Thinking and Objectives) :

চিন্তনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, চিন্তন সবসময়ে উদ্দেশ্যমুখী (Purposive)। সমগ্রতাবাদী মনোবিদগণ (Gestalt Psychologists) চিন্তনের এই বৈশিষ্ট্যের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। চিন্তনের ধর্ম হচ্ছে সমস্যা সমাধান করে সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই উদ্দেশ্যে নিছক জ্ঞানলাভও হতে পারে, বা ব্যবহারিক উপযোগিতা পূর্ণও হতে পারে। যে কোন ধরনের চিন্তার ক্ষেত্রে একটি সমস্যার উদ্ভব হয় এবং সেই সমস্যা আমাদের অতীত জ্ঞানসামগ্রীর মধ্যে শূন্যতার (Gap) সৃষ্টি করে। চিন্তনের কাজ হল ঐ সমস্যার সমাধান করে জ্ঞানের ক্ষেত্রের এই শূন্যতাকে পূরণ করা।

সবশেষে, বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, চিন্তা মনের এক ধরনের বিশেষ প্রক্রিয়া (Mental process)। সুতরাং মনের সক্রিয়তা চিন্তনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষণ, কল্পন ইত্যাদি প্রক্রিয়াতেও মন সক্রিয় থাকে কিন্তু চিন্তনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ইচ্ছা-প্রণোদিত মনোযোগের (Volitional attention) প্রয়োজন হয়। কল্পনার জন্য এ ধরনের মনোযোগের কোন প্রয়োজন হয় না। উদ্দেশ্যের পথে মনকে

বিশেষভাবে সক্রিয় করতে না পারলে, চিন্তনের দ্বারা সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। মনোবিদ বার্টন (Burton) চিন্তনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাঁর এই সক্রিয়তার বৈশিষ্ট্যের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, “Thinking results when there is persistant effort to examine the evidence with supports and belief, solution or conclusion which is suggested for acceptance together with the implications and further conclusions of the evidence.”

(E) প্রক্ষোভ (Emotion) :

প্রক্ষোভের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল “Emotion”। ল্যাটিন শব্দ ‘Emovere’ থেকে ‘Emotion’ শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। ‘Emovere’ কথাটির অর্থ হল ‘উত্তেজনাকর অবস্থা। কোনও উদ্দীপক আমাদের সামনে হাজির হলে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয় তা থেকে উদ্ভূত উত্তেজনাকর অবস্থা যা দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে মনকে বিচলিত করে, তাই হল প্রক্ষোভ। প্রক্ষোভ সম্পর্কে বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্নভাবে তাঁদের সংজ্ঞা দিয়েছেন।

প্রক্ষোভের সংজ্ঞা (Definitions of Emotion) :

মনোবিদ জেমস্ (James) মনে করেন যে, “কোনও বস্তু প্রত্যক্ষণের ফলে দৈহিক দিক থেকে যে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে বলে প্রক্ষোভ।”

মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল (MeDougall)-এর মতে, “মানুষের আচরণের মূলে যে প্রবৃত্তি রয়েছে তার সঙ্গে জড়িত অনুভূতিকে বলে প্রক্ষোভ।” উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভয় হল একপ্রকার প্রক্ষোভ; কিন্তু তার পিছনে রয়েছে পলায়নী প্রবৃত্তি (Instinct of Escape)। আবার রাগের পিছনে আছে আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি (Instinct of Combat)।

ওয়াটসন (Watson) মনে করেন যে, “প্রক্ষোভ হল একপ্রকার দৈহিক প্রতিক্রিয়া যা অস্তিযন্ত্রে ও গ্রন্থিসমূহে আলোড়ন সৃষ্টি করে।”

ক্লিংগিনা ও ক্লিংগিনা (Kleinginna and Kleinginna) বলেন যে, “প্রক্ষোভ হল স্নায়ুতন্ত্র ও গ্রন্থির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত প্রাণীর অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগত (Subjective) ও বস্তুগত (Objective) উপাদানগুলির এক জটিল মিশ্রণ যা বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং শারীরিক ভারসাম্যের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়; আর ফলশ্রুতিতে প্রাণীকে লক্ষ্য অর্জনে সহয়তা করে।”

সুতরাং, প্রক্ষোভ হল সহজাত প্রবৃত্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন এক ধরনের জটিল অনুভূতি যা বিশেষ বিশেষ ধারণা বা বস্তুর প্রভাবে জাগরিত হয়ে দেহের আভ্যন্তরীন পরিবর্তন সাধনের ও মানসিক দিককে বিচলিতকরণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট আচরণ সম্পন্ন করতে উদ্‌বুদ্ধ করে।

প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য (Charecteristics of Emotion) :

প্রক্ষোভ সম্পর্কে বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা দিলেও সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রক্ষোভ হল এক ধরনের জটিল অনুভূতি। এটি কোনও বিশেষ কারণে জাগরিত হলে মানুষের দৈহিক ও মানসিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে। তাই প্রক্ষোভকে বিশ্লেষণ করলে তার কয়েকটি দিক উন্মোচিত হয়। এই দিকগুলি হল যথাক্রমে বাহ্যিক দিক, অভ্যন্তরীণ দিক এবং অনুভূতিমূলক দিক। প্রথমত, ব্যক্তির মধ্যে যখন প্রক্ষোভ জাগরিত হয়, তখন সে কিছু কিছু বাহ্যিক আচরণ সম্পন্ন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভয় পেলে দৌড়ে পালানো, রাগ হলে চেঁচামেচি করা বা হাত-পা ছোঁড়া ইত্যাদি হল প্রক্ষোভমূলক আচরণের বাহ্যিক দিক। দ্বিতীয়ত, অভ্যন্তরীণ দিক হিসাবে বলা যায় যে, প্রক্ষোভের উদ্রেক ঘটলে দেহের ভিতরেও তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তার ফলে নাড়ির স্পন্দন, নিশ্চিদ্র গ্রন্থির রস নিঃসরণ, পরিপাচন প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াগুলির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে। তৃতীয়ত, প্রত্যেকটি প্রক্ষোভের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে যুক্ত থাকে এক একটি অনুভূতি। অর্থাৎ কোনও একটি বিশেষ পরিস্থিতি চিন্তায় বা কল্পনায় মনের মধ্যে আবির্ভূত হলেও প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যেমন বলা যায় যে, সাপের কথা চিন্তা করলে ভয়ের অনুভূতি হয়। অন্যদিকে আনন্দদায়ক ঘটনা সুখকর অনুভূতি এবং বেদনাদায়ক ঘটনা দুঃখজনক অনুভূতির উদ্রেক ঘটায়। প্রক্ষোভের এইসব দিক পর্যালোচনা করে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে। এইগুলি হল—

ভাব বা ধারণাকেন্দ্রিক (Conceptual) :

প্রক্ষোভ সাধারণত ভাব বা ধারণার দ্বারা উদ্দীপিত হয়। অর্থাৎ কোনও বস্তু বা ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করার পর তার ভাব বা ধারণা অন্য কোনও সময়ে মনের মধ্যে জাগরিত হলে প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাই ভাব বা ধারণা হল প্রক্ষোভের উৎস। এই কারণে বলা হয় যে, প্রক্ষোভ সৃষ্টির মূলে রয়েছে কোনও না কোনও ভাব বা ধারণা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সাপের কথা মনে পড়লে ভয়ের উদ্রেক হয় কিংবা শতরুর কথা চিন্তা করলে আমাদের রাগ হয়।

পরাশ্রয়িতা (Parasitic) :

কোনও প্রক্ষোভ আপনা থেকে সৃষ্টি হয় না। এর মূলে রয়েছে একটি একটি প্রবৃত্তি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, ছানা কেড়ে নিলে মাতৃস্নেহ জনিত প্রবৃত্তির তাড়নায় মা-কুকুর রেগে গিয়ে কামড়ে দেয়। এখানে স্নেহ হল প্রবৃত্তি এবং রাগ হল প্রক্ষোভ। আবার বিপদের সম্ভাবনা দেখলে আমরা সেখান থেকে ভয়ে পালিয়ে আসি। এখানে পলায়ন হল একপ্রকার প্রবৃত্তি এবং ভয় হল এক ধরনের প্রক্ষোভ।

সংবেদনধর্মীতা (Sensitivity) :

প্রক্ষোভ সৃষ্টির ফলে দৈহিক সংবেদন ঘটে। এর ফলে দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে। যেমন—খুব রাগ হলে আমাদের রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, চোখ-মুখের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে, পেশিগুলির মধ্যে গতির সঞ্চার হয় ইত্যাদি।

আকস্মিকতা (Contingency) :

প্রক্ষোভ সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি আকস্মিকতা লক্ষ করা যায়। এটি আমাদের মধ্যে হঠাৎ জাগরিত হয়ে মানসিক ভারসাম্যকে বিধ্বস্ত করে। তবে এই পর্যায়ে প্রক্ষোভটি হঠাৎ আবির্ভূত হলেও, সেটি সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হয়ে যায় না। তার রেশ অনেকক্ষণ ধরে থাকে এবং ধীরে ধীরে তা প্রশমিত হয়।

ব্যাপকতা (Extension) :

প্রক্ষোভের পরিধি বহুবিস্তৃত। একই প্রক্ষোভ বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কারণে কিংবা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা উপলক্ষে সৃষ্টি হতে পারে। যেমন বলা যায় যে, ভয়ের প্রক্ষোভটি বিভিন্ন জনের মধ্যে বিভিন্নভাবে জাগরিত হয়ে থাকে। শিশু অন্ধকারে একা থাকতে ভয় পায় এবং ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার কথা শুনলে ভয় পায়। আবার বয়স্করা বাঘ দেখলে ভয় পায়। অন্যদিকে স্মরণ, কল্পন ও চিন্তনের মাধ্যমেও ভয়ের প্রক্ষোভটি জাগরিত হতে পারে।

বিচারবুদ্ধিহীনতা (Irrationality) :

প্রক্ষোভ এমনভাবে আচ্ছন্ন করে যে, এর ফলে আমরা বিচারবুদ্ধিহীন হয়ে পড়ি। সেই সময় আমাদের কোনও হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। এমনকী নিজের উপর নিয়ন্ত্রণও আমরা হারিয়ে ফেলি। বস্তুতপক্ষে প্রক্ষোভের তীব্রতা যত বৃদ্ধি পায়, বিচারবুদ্ধিও তত আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সেজন্য চরম রাগের বশে কেউ কেউ আত্মহননে প্রবৃত্ত হয় কিংবা প্রচণ্ড ভয় পেলে আমরা স্থানুবৎ নিশ্চল হয়ে পড়ি।

বস্তুমুখীনতা (Object orientation) :

প্রক্ষোভ জাগরণের ক্ষেত্রে বস্তুর একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রক্ষোভ জাগরণের অন্যতম কারণ হল বস্তুর প্রত্যক্ষণ বা স্মরণ। অর্থাৎ কোনও বস্তুর কথা মনে পড়লে কিংবা তা প্রত্যক্ষণ করলে আমাদের মধ্যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয়। তাই বলা হয় যে, আবেগ সবসময় বস্তুমুখী।

স্থায়িত্ব (Durability) :

প্রত্যেকটি প্রক্ষোভের কম-বেশি স্থায়িত্বকাল আছে। অর্থাৎ কোনও প্রক্ষোভ জাগরিত হলে তা ধীরে ধীরে বেড়ে গিয়ে চরম সীমায় পৌঁছায়। তারপর আবার ধীরে ধীরে তা প্রশমিত হতে থাকে। তবে তার রেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রক্ষোভের অভিব্যক্তি সব বয়সেই বিদ্যমান। এটি বিভিন্ন অবস্থা বা পরিবেশের দ্বারা জাগরিত হয়। তাই প্রক্ষোভ জাগরণের উপসংহার পশ্চাতে কোনও না কোনও কারণে নিহিত থাকে। তবে এটি পরাশ্রয়ী এবং অনুবর্তন-সাপেক্ষ। এই পর্যায়ে উল্লেখ্য যে, সব ধরনের প্রক্ষোভ জাগরণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সমভাবে প্রযোজ্য নয়। রাগ, ভয় ইত্যাদির

মতো তীব্র প্রক্ষোভগুলি (Strong Emotions)-র ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যগুলি যতটা প্রকাশমান থাকে, প্রেম, দয়া ইত্যাদির মতো মৃদু প্রক্ষোভের (Soft Emotions) ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকাশ ততটা স্পষ্ট নয়।

৬.৪ শিখনের আচরণবাদী তত্ত্ব এবং শিক্ষাগত তাৎপর্য : সংযোজনবাদ, প্রাচীন এবং অপারেন্ট অনুবর্তন (Behaviouristic Theories of Learning and its Educational Implications : Connectionsm, Classical and Operant Conditioning)

সংযোজনবাদ (Connectionism) :

1899 খ্রীষ্টাব্দে "Animal Intelligence" নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের লেখক হলেন বিখ্যাত আমেরিকান মনোবিদ থর্নডাউক (Thorndike, E. L.)। এই বইয়ের মধ্যে থর্নডাইক যে মতবাদ প্রচার করেন, তা পরবর্তীকালে শিখন (Learning) সম্পর্কে সমস্ত চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। থর্নডাইক বিভিন্ন প্রাণীর শিক্ষাকালীন আচরণ বিশ্লেষণ করে শিখনের সরলতম কৌশল আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শিখন অনেক কারণে জটিল হয়ে পড়ে। তাই তিনি শিখনের উন্নত পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা না করে, তার সরলতম অবস্থা থেকে শুরু করলেন। তাঁর মতে শিখনের সরলতম ক্ষেত্র হল একটি উদ্দীপকের (Stimulus, S) সঙ্গে একটি প্রক্রিয়ার (Response, R) বন্ধন বা সংযোজন (Connection)। অর্থাৎ তাঁর মতে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপনই হল শিখন (Learning is due to the formation of bond between Stimulus and Response)। একটি উদ্দীপক-এর সঙ্গে একটি প্রতিক্রিয়া-এর সংযোজনের তাৎপর্য হল এই যে, যখনই উদ্দীপক আমাদের সামনে আসবে, আমরা একইভাবে প্রতিক্রিয়া করব। থর্নডাইক নিজেই বলেছেন—"That a Connections S → R, exists in a cetain organism means....simply that there is a probability greater than infinitesimal that is S ocurs, R, will occur" সুতরাং, এই মতানুযায়ী শিখন কোন ইতস্তত কাজ নয়। উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আচরণধারার নিয়ন্ত্রণ করাই হল শিখন। আরও বিস্তৃত অর্থে, যে কোন ধরনের গঠনমূলক অভিজ্ঞতা, আচরণ এবং ব্যক্তিসত্তা সবই উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া বন্ধনের (S–R connection) এক একটি তন্ত্র (System)। শিখন ব্যাপক অর্থে ব্যক্তিজীবনের সকল দিকের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই শিখনের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া বন্ধন সৃষ্টি হয় এবং ঐ সকল একক (unit) বন্ধনগুলি, এক একটি সুবিন্যস্ত তন্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হয়। মনোবিদ্ রাফ গ্যারী (R. Garry) আধুনিক যে কোন উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া সংযোগমূলক তত্ত্বের মূল বক্তব্য উল্লেখ প্রসঙ্গে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। থর্নডাইক, তাঁর তত্ত্বের বিশ্লেষণে এই উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার বন্ধনকে (Bond) শারীরবৃত্তীয় তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে এই বন্ধন ঘটে স্নায়ুর (Nerve)

মাধ্যমে। উত্তেজনা আসা যাওয়ার পথে স্নায়বিক (Synaptic Resistance) কমে যাওয়ার ফলেই এই সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর উপর পরীক্ষা করে ধর্নডাইক তাঁর মতবাদ প্রচার করেন।

থর্নডাইকের পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত (Thorndike's experiments and decisions) :

থর্নডাইক বিশেষভাবে মাছ, মুরগী, বিড়াল, কুকুর, বানর ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর উপর পরীক্ষা করেন। তবে তাঁর যে পরীক্ষা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়, তা হল বিড়ালের উপর পরীক্ষা। এই ধরনের পরীক্ষায় তিনি এক বিশেষ যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহার করেন, যাকে বলা হয় পাজল বক্স (Puzzle box)। এই সব বাক্স এরূপভাবে তৈরি যে, তা থেকে বেরিয়ে আসার একটি মাত্র পথ আছে। আবার কোন কোনটায় বোতাম টিপলে, কোনটায় একটা দড়ি টানলে বাক্সের দরজাটি খুলে যায়। এই অবস্থায় থর্নডাইক একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে এরূপ বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন এবং বাইরে কিছু খাবার রাখলেন। এটাই হল তাঁর পরীক্ষামূলক পরিস্থিতি (Experimental set up)। এই ধরনর পরিস্থিতিতে তিনি বিড়ালের বাইরে বেরিয়ে আসার প্রতিক্রিয়া অনুশীলন করলেন। এবং যখনই বিড়ালটি বেরিয়ে আসতে পারল, তখনই আবার তাকে ভেতরে রেখে আগের মত দরজা বন্ধ করে দিতে লাগেলন। এই অবস্থায় থর্নডাইক বিড়ালের আচরণের তিনটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন—

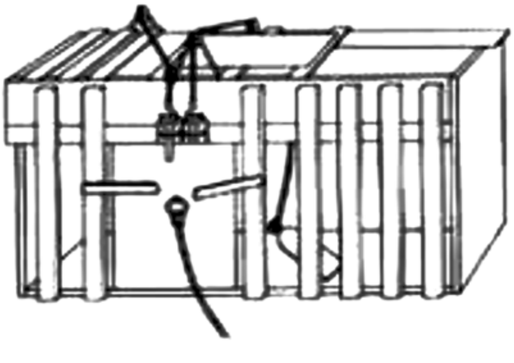

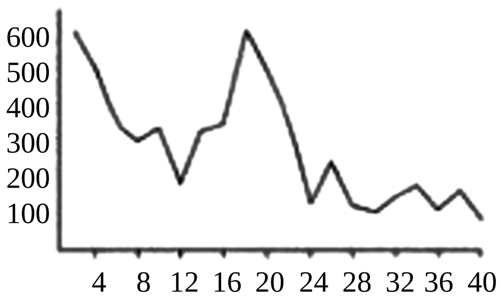

- ❖ প্রথম যখন বিড়ালকে ঐ পরিস্থিতির মধ্যে রাখা হল, তখন সে এদিক ওদিক দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলে লাগল। কখনও বা বাক্সের কাঠের ফাঁকগুলি দিয়ে, কখনও বা উপরে লাফ দিয়ে। এইভাবে ইতস্তত চেষ্টা করতে করতে এক সময় হঠাৎ দড়ির উপর চাপ পড়ায় ছিটকিনিটা খুলে গেল। এবং বিড়ালটা প্রথমবারের মতে বেরিয়ে আসতে পারল।
- ❖ ঐ অবস্থায় পুনরাবৃত্তিতে দেখা গেল, বিড়ালের ভুল প্রচেষ্টার পরিমাণ ক্রমে ক্রমে আসছে এবং সে সঠিক পদ্ধতিটা ক্রমশঃ নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করছে। বা ক্রমে সফল প্রচেষ্টাগুলি

(Successful movement) তার স্থায়ী আচরণের অংশ হিসেবে গৃহীত হচ্ছে আর ভ্রান্তিমূলক আচরণ বা প্রচেষ্টাগুলিকে (Unsucessful movement) সে ত্যাগ করছে।

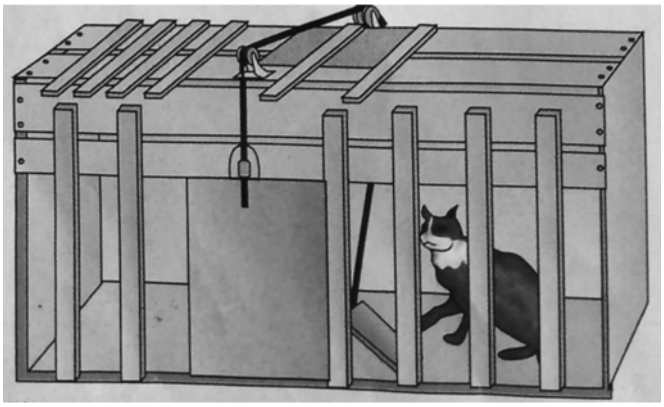

Fig. **থনডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুলের তত্ত্বের পরীক্ষা**

- ❖ যতই পুনরাবৃত্তি করা হতে লাগলো, ততই লক্ষ্য করা গেল, বিড়ালের 'পাজল বক্স' থেকে বেরিয়ে আসতে কম সময় লাগছে। থর্নডাইক পুনরাবৃত্তির সময়কে লেখচিত্রের সাহায্যে পরিবেশন করলেন। পুনরাবৃত্তির সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই লেখ (Curve) ক্রমশ নিচের দিকে নেমে আসতে লাগল।
- ❖ প্রায় প্রতি পরীক্ষাতেই থর্নডাইক এই তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন এবং তাঁর এই পর্যবেক্ষণ (Observation) থেকে থর্নডাইক যে সিদ্ধান্ত করলেন, তা তাঁর ভবিষ্যৎ শিখন সংক্রান্ত গবেষণার মূল ভিত্তি বলা যেতে পারে। তাঁর মতে, প্রাণীর ক্ষেত্রের ভুল প্রচেষ্টাকে বাদ দেওয়া (Elimination of Unsuccessful movement) এবং সফল প্রচেষ্টাকে গ্রহণ (Fixation of Successful movement) উভয় প্রক্রিয়াই যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়। প্রাণীর শিখনের জন্য চিন্তন (Thinking), যুক্তি (Reasoning) বা অনুকরণ (limitation) কোন কিছুর সাহায্য গ্রহণ করে না তারা প্রত্যক্ষভাবে সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে শেখে। এই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে তারা অপ্রয়োজনীয় প্রচেষ্টাগুলিকে ধীরে ধীরে ত্যাগ করে, আর প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টাগুলি গ্রহণ করতে থাকে। আত্মপ্রচেষ্টায় ভুল পথগুলিকে ত্যাগ করে সঠিক পথকে গ্রহণ করার মাধ্যমে যে শিখন হয়, তাকে থর্নডাইক নাম দিয়েছেন ট্রায়াল এন্ড এরর শিখন (Trial and Error learning) বা প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে শিখন। আর শিখনের এই পদ্ধতিকে বলা হয় প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতি (Trial and Error method Learning)। খাদ্য পাওয়ার জন্য অন্তরের যে তাগিদ, তাই বিড়ালকে এই প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতিতে শিখনে সাহায্য করেছে। থর্নডাইকের মতবাদ প্রচারের পর বহু মনোবিদ তাঁর সমালোচনা

করেছেন। এই তত্ত্বের মধ্যে যে সত্যতা নেই, এ কথা আমরা সম্পূর্ণভাবে বলতে পারি না। বরং থর্নডাইকের শিখন সম্পর্কে মতবাদ বহু দিন ধরে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। একজন বিশিষ্ট মনোবিদ স্প্রিন্টহল্ (Sprinthall, R.C.) শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এক সরস মন্তব্য করেছেন, যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন, “যদি থর্নডাইকের কোন একটি বিড়াল পাজল বক্সের অন্যরকম আচরণ করত, তা হলে সে আমেরিকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীকে বদলে দিতে পারতো (If one of those cats acted at all unpredictably it woulf change education, curricular, throughout the nationz)। যাই হোক, এই তত্ত্বের মূল কথা হল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভুল শুধরে নিয়ে প্রাণী শেখে। উদ্দেশ্য বা ফল লাভ এই তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মনোবিদ ম্যাক্ কোনেল (Me Connel) তাই বলেছেন, “The sailent point is that the trial error method of learning is not senseless process it is a process of approximation and correction”.

শিখনের সূত্রাবলী (Laws of Learning) :

থর্নডাইক কেবলমাত্র শিখনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেই শেষ করেননি। তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে তিনি যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, তার আরও বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কি করে এবং কেন ভুল প্রচেষ্টাগুলি পরিত্যক্ত হয় এবং সফল প্রচেষ্টাগুলি আচরণের অন্তর্ভুক্ত হয়, তা ব্যাখ্যা করার জন্য থর্নডাইক কতকগুলি সূত্রের অবতারণা করেছেন। এইগুলিকে শিখনের সূত্র (Law of Learning) বলা হয়। অনেকে শিখনের সূত্রগুলিকে শিখনের নীতি (Principle of Learning) মনে করে থাকেন কিন্তু আসলে তা নয়। শিখনের মূল একটি নীতির কথাই থর্নডাইক বলেছেন। তা হল প্রচেষ্টা ভুলের নীতি (Principle of trial and error) বা আরও ব্যাপক অর্থে সংযোজনবাদ (Connectionism)। প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতিতে শেখার কারণগুলিই উল্লেখ করা হয়েছে শিখনের সূত্রে। থর্নডাইক মোট আটটি সূত্রের কথা বলেছেন। তবে তার মধ্যে মুখ্য সূত্র হল তিনটি-ফললাভের সূত্র (Law of effect), অনুশীলনের সূত্র (Law of exercise), প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness).

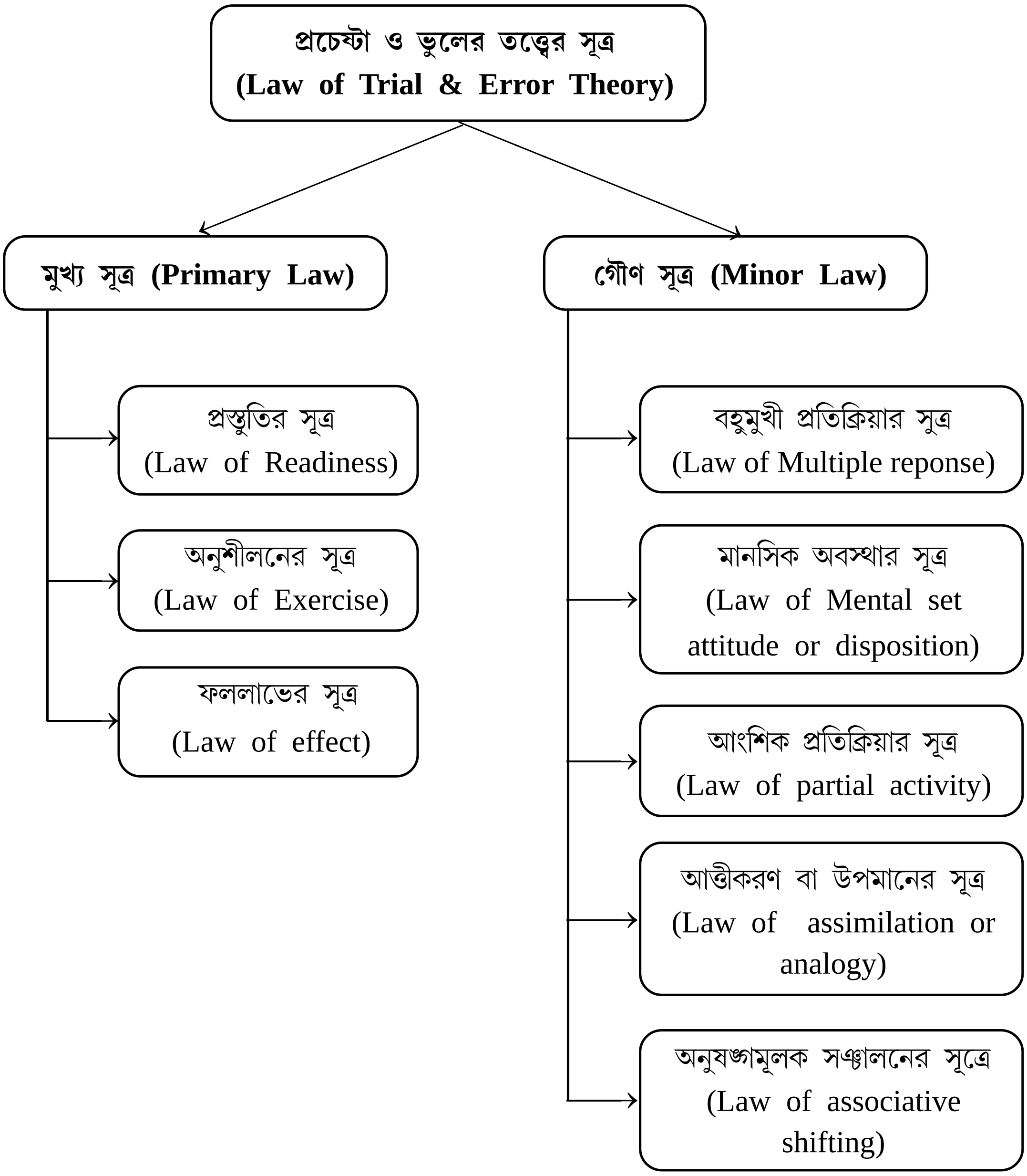
প্রচেষ্টা ও ভুলের তত্ত্বের সূত্র
(Law of Trial & Error Theory)
মুখ্য সূত্র (Primary Law)
গৌণ সূত্র (Minor Law)
প্রস্তুতির সূত্র
(Law of Readiness)
অনুশীলনের সূত্র
(Law of Exercise)
ফললাভের সূত্র
(Law of effect)
বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সূত্র
(Law of Multiple reponse)
মানসিক অবস্থার সূত্র
(Law of Mental set attitude or disposition)
আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র
(Law of partial activity)
আত্তীকরণ বা উপমানের সূত্র
(Law of assimilation or analogy)
অনুষঙ্গামূলক সঞ্চালনের সূত্রে
(Law of associative shifting)

A. প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness) :

শিখনের জন্য যে প্রস্তুতি দরকার, তা থেকে থনডাইক উল্লেখ করেছেন প্রস্তুতির সূত্রে (Law of Readiness)। তাঁর মতে কোন উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সার্থক সম্বন্ধ স্থাপন করতে হলে ব্যক্তির উন্মুখতা দরকার। তবে এই প্রস্তুতি বলতে তিনি কেবলমাত্র দৈহিক প্রস্তুতির কথাই বলতে চেয়েছেন। তাই তাঁর সূত্রে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার উল্লেখ দেখতে পাই। তিনি বলেছেন—"When any conduction unit is ready to conduct, for it to do so is satisfying. When any conduction unit is not in readiness to conduct, for it to conduct ia annoying. When any conduction unit is in readiness to conduct for it not to do so in annoying." আগেই উল্লেখ করেছি, থর্নডাইক শিখন প্রক্রিয়ার শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্নায়ু তত্ত্বর (Nerve) মাধ্যমে হয়। প্রস্তুতির সূত্রে থর্নডাইক এই দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে উত্তেজনা স্নায়ু বহন করতে প্রস্তুত, তাকে তা বহন করতে দিলে, ব্যক্তির তৃপ্তি আসবে। যে উত্তেজনা স্নায়ু বহন করতে রাজী নয়, তাকে দিয়ে জোর করে বহন করালে বিরক্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। সবশেষে যে কাজ করার জন্য দেহ উদগ্রীব, তা করতে না দিলেও বিরক্তির সৃষ্টি হবে। এই সূত্রকে বিশ্লেষণ করলে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। থর্নডাইক অনুশীলনের সূত্রে (Law of exercise) যেমন ফলের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি প্রস্তুতির বেলাতেও সেই ফলটির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছেন। অর্থাৎ, শিখন পরিস্থিতির ফল কিভাবে নির্ধারিত হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই প্রস্তুতির সূত্রে।

B. অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise) :

থর্নডাইকের মতে ফলই (effect) একমাত্র শিখনের শর্ত নয়। শিখনকে দৃঢ়তর করতে হবে। উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সমৃদ্ধ স্থাপন হয়েছে তাকে দৃঢ়তর করতে না পারলে, পরে তা কার্যকরী হবে না। তাই কিভাবে তা দৃঢ় হয়, সে কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে থর্নডাইক তাঁর দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করেছেন। একে বলা হয় অনুশীলনের সূত্র (Law of Exerciese)। এই সূত্রের দুটি অংশ আছে। প্রথম অংশে তিনি বলেছেন—"When a mofifiable connection is made between a situation and a response, that connections strength is, other thing being equal, increased". অর্থাৎ অন্য সব অবস্থা ঠিক থাকলে, একটা উদ্দীপক এবং একটা প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয় বন্ধন স্থাপনের পরে যদি তাকে বারবার চর্চা করা হয়, তা হলে সেই সংযোগের শক্তি বাড়বে। অনুশীলনের সূত্রের এই অংশকে বলা হয় অভ্যাসের সূত্র (Law of use)। অপর অংশে থর্নডাইক

বলেছেন—"When a modifiable connection is not made between a situation and a respose during a length of time. That connections strength is decreased." মূলসূত্রের এই অংশকে বলা হয় অনভ্যাসের সূত্র (Law of disuse)। কোন পরিবর্তনীয় উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া বন্ধন স্থাপনের পর বহুদিন চর্চা না করলে তাদের মধ্যেকার বন্ধন ক্রমে শিথিল হতে থাকে। এই সূত্রের মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই, প্রাচীন সংযোগের সূত্রের (Law of association) বা অভ্যাসের সূত্রেরই (Law of habit formation) পুনরাবৃত্তি মাত্র। থর্নডাইকের এই সূত্রে "অন্যান্য অবস্থা ঠিক থাকলে" (Other things being equal)। কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যান্য অবস্থা ঠিক থাকলে বলতে থর্নডাইক ফলপ্রাপ্তির কথাকেই স্মরণ করাতে চেয়েছেন। এখান থেকে বোঝা যায়, তিনি অনুশীলনের চেয়ে ফললাভের সূত্রের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ, ফল আনন্দদায়ক হলে উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া বন্ধনের শক্তিকে চর্চার দ্বারা বাড়ানো যায়।

C. ফললাভের সূত্র (Law of effect) :

ফললাভের সূত্রে কাজের ফললাভের উপর যে শিখন নির্ভর করে, সে কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ থর্নডাইকের পরীক্ষায়, বিড়াল খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলে প্রত্যেকবারই খাদ্য পায়, তাই প্রত্যেকবার যতদূর সম্ভব সহজ পথে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। যদি খাদ্য পাওয়ার তৃপ্তি না থাকত, তাহলে সে সঠিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে গ্রহণ করত না। থর্নডাইকের নিজের ভাষায় সূত্রটি এইরূপ—"When a modifiable connection between a situation and a response is made and accompained or followed by a satisfying state of affairs, that connection's strength is increased; when made and accompained or followed by an annoying state of affairs, its strength is decreased. অর্থাৎ, উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয় সংযোগের মাধ্যমে যদি সুখকর বা তৃপ্তিদায়ক ফল পাওয়া যায়, তবে ঐ সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় হবে, আর যদি ঐ সংযোগের মাধ্যমে বিরক্তিকর ফল পাওয়া যায়, তবে ঐ সম্পর্কের বন্ধন শিথিল হবে। থর্নডাইকের এই সূত্রে "পরিবর্তনীয় সংযোগ" (Modifiable Connection) কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। 'পরিবর্তনীয় সংযোগ' বলতে থর্নডাইক উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার (উঃ) মধ্যে সেই ধরনের সংযোগের কথা বলেছেন যা শিখনের দ্বারা সংস্কার করা যায়। যেহেতু, তৃপ্তিদায়ক বা বিরক্তিকর অবস্থা (Satisfying or annoying state of affairs) আংশিকভাবে প্রাণীর প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল, তাই তাঁর মতে, এই প্রান্তিক অবস্থা কোন্ প্রচেষ্টা বা প্রতিক্রিয়া গ্রহণযোগ্য হবে, তা নির্ধারণ করে দেয়।

উপরিউক্ত তিনটি মুখ্য সূত্র ছাড়াও থর্নডাইক আরও পাঁচটি সূত্রের কথা বলেছেন। তাদের গৌণ সূত্র (Minor Law) বলা হয়।

1. বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Multiple response) :

মানুষ বা অন্য যে কোন প্রাণী যখন কোন নতুন অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখন তারা সম্ভাব্য সব রকম উপায়ে তার সমাধান করতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ, সঠিক প্রতিক্রিয়াটি করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার যত রকম অর্জিত ও অনর্জিত আচরণধারা আছে, তার দ্বারা সমস্যার সমাধান করতে চায়। এইভাবে চেষ্টার মাধ্যমে সফলতা আসে। এই যে একই উদ্দীপকের দরুন প্রাণীর বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া রীতি তাকে থর্নডাইক বলেছেন বহুমুখী প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা। তাই থর্নডাইকের এই সূত্রকে বলা হয়, বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Multiple response)। তবে এটি তাঁর প্রচেষ্টা ভুলের পদ্ধতির নামান্তর মাত্র। শিক্ষাক্ষেত্রে এর উপযোগিতা হল শিক্ষার্থীদের নিজেদের চেষ্টার দ্বারা কোনও সমস্যার সমাধান করার সুযোগ দিতে হয়। তার ফলে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং যথাযথভাবে তা শুধরে নিতে পারে। তা ছাড়া, ভুল করলেও, সেই ভুল শিক্ষার্থীকে নতুন আচরণ সম্পাদনে বা শিক্ষার পথে আগ্রহান্বিত করবে। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ মনে করেন ভুল অভিজ্ঞতারও শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্য আছে।

2. মানসিক অবস্থার সূত্র (Law of Mental set attitude or disposition) :

থর্নডাইক তাঁর প্রস্তুতির সূত্রে (Law of readiness), বিশেষভাবে দৈহিক প্রস্তুতির গুরুত্বের কথা বলেছেন। কিন্তু পরে তিনি উপলব্ধি করেন যে, শিখনের জন্য দৈহিক প্রস্তুতির যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি মানসিক প্রস্তুতিরও প্রয়োজন আছে। থর্নডাইক, এ প্রসঙ্গে যে সূত্রের অবতারণা করেছেন, তাহল মানসিক অবস্থার সূত্র (Law of Mental set attitude or disposition)। মানসিক অবস্থা হল ব্যক্তির আন্তরিক এক ক্রিয়াশীলতন্ত্র যা তাকে কোন কাজে উদ্‌বুদ্ধ করে, তাকে অনুপ্রাণিত করে বিশেষ এক ভঙ্গীতে প্রতিক্রিয়া করতে। এই মানসিক অবস্থা শিখনের সহায়ক। থর্নডাইকের পরীক্ষায় বিড়ালটি ক্ষুধার্ত ছিল বলেই বাইরে খাদ্যবস্তু দেখে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল। পেট ভর্তি থাকলে তার বেরিয়ে আসার কোন তাগিদ থাকত না, শিখনও সম্ভব হত না। তাই যে কোন শিখনের জন্য উপযুক্ত মানসিক প্রস্তুতি চাই। আমাদের শিক্ষালয়ে শিখনকে সার্থক করে তুলতে হলে ছাত্রদের মধ্যে উপযুক্ত মানসিক অবস্থা (Mental set) সৃষ্টি করার দরকার। বিভিন্নভাবে এই অবস্থা সৃষ্টি করা যায়। এর মধ্যে প্রধান হল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের জীবনের প্রত্যক্ষ সমস্যার সঙ্গে সংযুক্ত করা। শিক্ষার্থীরা যদি তাদের পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্ক খুঁজে পায়, তবে তারা জ্ঞান আহরণে আগ্রহান্বিত হবে। এ ছাড়া, শিক্ষাপযোগী মানসিক অবস্থা সৃষ্টির পেছনে শিক্ষকের কর্মদক্ষতারও প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি শিক্ষক তাঁর শ্রেণীতে আনন্দকর ও সুখদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন, তবেই শিক্ষার্থীদের আগ্রহ আসবে। ছাত্র-ছাত্রীরা যদি শিক্ষককে

ভয় পায় তা হলে তাদের অন্তরে মানসিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তার ফলে শিখন সম্ভব হয় না।

3. আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of partial activity) :

থর্নডাইকের আর একটি গৌণ সূত্র হল আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of partial activity)। এই সূত্রের মূল কথা হল প্রাণীরা সামগ্রিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রতিক্রিয়া করে না। অর্থাৎ তারা ভিন্ন ভিন্ন অংশ পৃথকভাবে প্রত্যক্ষ করে এবং অংশ বিশেষের প্রতি প্রতিক্রিয়া করে, প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে শিক্ষা করে। এর ফলে শিখনের জন্য শক্তির অপচয় কম হয়। কারণ সব সময় অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের জন্য সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় না। যেহেতু, কোন একটি পরিস্থিতির মধ্যে যে কোন একটি অংশ বা উপাদানের অবস্থান, পূর্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম, সেহেতু শিক্ষালয়ে যদি বিভিন্ন অবস্থায় পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্ন অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, তা হলে শিক্ষার্থীদের কাজ সহজসাধ্য হবে এবং সম্পূর্ণ হবে।

4. আত্তীকরণ বা উপমানের সূত্রে (Law of assimilation or analogy) :

প্রাণীর শিখনের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা থর্নডাইক উল্লেখ করেছেন তাঁর আত্তীকরণ বা উপমানের সূত্রে (Law of assimilation or analogy)। যে অবস্থায় অভিযোজন করার মত আমাদের কোন অর্জিত বা অনর্জিত প্রতিক্রিয়া জানা নেই, সে রকম কোন অবস্থার সম্মুখীন হলে আমরা পূর্বের কোন অবস্থার সঙ্গো কোন আংশিক মিল খুঁজে বের করি, এবং পূর্বে ঠিক যে ভাবে প্রতিক্রিয়া করেছিলাম, সেইভাবে প্রতিক্রিয়া করে থাকি। অর্থাৎ, সমজাতীয় অবস্থায় আমরা বিশেষ বিবেচনা না করে, পূর্বে অর্জিত কোন উপায়ে প্রতিক্রিয়া করে থাকি। তাই শিক্ষালয়ে শিখনকে সহজসাধ্য করতে হলে নতুন পাঠ্য বিষয়ের বা সমস্যার সঙ্গো আগের শেখা কোনা পাঠের কি মিল আছে, তা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। যার ফলে শিক্ষার্থীরা সহজে সমস্যার সমাধান করতে পারবে। এক কথায়, তাকে জানা বিষয়বস্তু থেকে অজানা জ্ঞানের ভাণ্ডারের দিকে (From known to unknown) এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ইতিহাস পড়াতে গিয়ে যে শিক্ষক ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গো বর্তমান জীবনের ঘটনার মিলটুকু ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম, তিনিই শিখনের মাধ্যমে আদর্শ নাগরিকতার শিক্ষা দিতে পারবেন।

5. অনুষঙ্গামূলক সঞ্চালনের সূত্র (Law of associative shifting) :

সবশেষে থর্নডাইক তাঁর অনুষঙ্গামূলক সঞ্চালনের সূত্রে (Law of associative shifting)

শিখনের সময় উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সংযোগ স্থাপন হয়, তার এক বিশেষ প্রকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে কোন উদ্দীপকের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে যুক্ত কোন প্রতিক্রিয়াকে অন্য উদ্দীপকের সঙ্গে সংযোজিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী যেসব প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম, সেগুলিকে শিখনের দ্বারা যে কোন অন্য উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব (Any response of which the learner is may be attached to any stimulation to which he is sensitive)। এই প্রক্রিয়াকে অনুবর্তন (Conditioning) বলা যেতে পারে। শিশুরা বিদ্যালয়ে যে সব অভ্যাস (habit), অনুরাগ (Interest) বা অন্যান্য মানসিক ধর্ম (Mental properties) অর্জন করে, তা তারা পরবর্তী বৃহত্তর জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে। এটাই হল এই সূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য, সুতরাং, শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হল শিক্ষালয়ে বিভিন্ন পাঠ্যবস্তুর মাধ্যমে ছাত্রদের এমন কতকগুলি অভ্যাস ও মানসিক সংগঠন তৈরি করা যা তারা ভবিষ্যৎ জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। এর ফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে।

থর্নডাইকের শিখন সূত্রের শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational significance of Thorndike's theory):

থর্নডাইকের শিখনের সূত্র পরবর্তীতে বিভিন্নভাবে সমালোচিত হলেও এই তত্ত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

A. ফললাভের সূত্রের প্রয়োগ (Application of Law of Effect) :

- শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর কাছে সুখকর ও তৃপ্তিদায়ক হবে।
- পাঠ্যবিষয় যদি শিক্ষার্থীদের কাছে বোধগম্য হয় তাহলে শিখন তৃপ্তিদায়ক হয়।
- পাঠ্যবিষয়বস্তুর সাথে যদি শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের মিল থাকে তবে তা অর্থপূর্ণ হয় ও শিখুন সুখদায়ক হয়।
- পাঠ্যবিষয় যেন শিক্ষার্থীর দৈহিকও মানসিক ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
- বিষয়বস্তুকে সহজ থেকে কঠিন করে সাজালে শিক্ষার্থীর সাফল্যের পরিমাণ বাড়ে ও ফল তৃপ্তিদায়ক হয়।

B. অনুশীলনের সূত্রের প্রয়োগ (Application of Law of Exercise) :

- শিক্ষার্থীদের প্রচুর সুযোগ দিতে হবে যাতে তারা অর্জিত জ্ঞানকে পুনরাবৃত্তি করতে পারে।
- শিক্ষক মাঝে মাঝে পুরনো পাঠ থেকে কিছু বিষয় অভ্যাস করাবেন, না হলে শিখন-দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

- বর্ণমালা, নামতা ইত্যাদি শিখনের সময় অনুশীলনের উপর গুরত্ব দেওয়া উচিত।
- থর্নডাইকের মত অনুসারে নিম্নশ্রেণিতে অনুশীলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

C. প্রস্তুতির সূত্রের প্রয়োগ (Application of Law of Readiness) :

- দৈহিক প্রতিক্রিয়ার জন্য যে প্রস্তুতি প্রয়োজন, সেটি পুরোপুরি পরিণমনের উপর নির্ভর করে।
- মানসিক প্রস্তুতি পরিণমন দ্বারা প্রভাবিত হলেও শিক্ষক/শিক্ষিকা মানসিক প্রস্তুতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষক বা শিক্ষিকা মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পূর্বে বিষয়সম্পর্কিত অন্যান্য আলোচনা শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

D. বহুমুখী প্রতিক্রিয়া সূত্রের প্রয়োগ (Application of Law of Multiple Response) :

- শিক্ষার্থী যাতে বহুমুখী চিন্তন করতে পারে সে ব্যাপারে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য করা উচিত।
- শিক্ষার্থীকে বহুমুখী চিন্তনের ও ভুল প্রচেষ্টার সুযোগ দিতে হবে।

E. মানসিক অবস্থার সূত্রের প্রয়োগ (Application of Law of Mental Conditions) :

- শিক্ষক/শিক্ষিকা ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মীবৃন্দের সহযোগিতা শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষের প্রতি ধনাত্মক মনোভাব এবং উপযুক্ত মানসিক অবস্থা (Mental set) সৃষ্টিতে সাহায্য করে।
- প্রাক্ষোভিক নিরাপত্তা (emotional security) শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থাকে উপযুক্তভাবে তৈরি করে।

F. আংশিক প্রতিক্রিয়া সূত্রের প্রয়োগ (Application of Law of Partial Response) :

- শিখন পরিস্থিতির অংশগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, সেটার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে অবগত করা উচিত।
- কোনো বিষয়ের কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকলে সেটির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করানো উচিত, তাহলে শিখন সহজ হবে।

G. সাদৃশ্যের সূত্রের প্রয়োগ (Application of Law of Analogy) :

- শিক্ষার্থী যখন নতুন বিষয় পড়বে তখন পুরনো ধারণার সাথে ওই বিষয়টির সাদৃশ্য কোথায় আছে, সেটা দেখানো উচিত।
- শিক্ষার্থীকে জানা থেকে অজানা জ্ঞানের দিকে নিয়ে যেতে হবে। জীবনের কোনো অবস্থার সাথে যদি পাঠ্যবিষয়ের কোনো মিল থাকে, তবে সেটিও ব্যাখ্যা করে দেওয়া উচিত।

H. অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালন সূত্রের প্রয়োগ (Application of Law of Association Shifting) :

- শিশুরা যে সমস্ত অভ্যাস, মনোভাব, আগ্রহ ইত্যাদি অর্জন করে, সেগুলি যেন তারা বড়ো হয়ে প্রয়োগ করতে পারে, সেদিকে নজর দিতে হবে।
- শিক্ষক/শিক্ষিকার দায়িত্ব হল এমন অভ্যাস বা মনোভাব গঠন করা, যা তারা ভবিষ্যতে প্রয়োগ করতে পারবে।

অনুবর্তন তত্ত্ব (Conditioning Theory) :

অনুবর্তন (Conditioning) কথাটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে কোন ধরনের অভ্যাস (habit) বা অর্জিত মানসিক বৈশিষ্ট্যকেই আমরা অনুবর্তিত প্রক্রিয়া (Conditioned response) হিসেবে বিবেচনা করি। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক প্যাডলভের পর থেকে অনুবর্তনের উপরে নানা রকম পরীক্ষা আজও চলছে। ফলে, অনুবর্তন বলতে আমরা বর্তমানে সঠিকভাবে কি বুঝি, তা এখনই বলা মুশকিল। তবে এটুকু বলা যেতে পারে 'অনুবর্তন' (Conditioning) বলতে আমরা বিশেষ এক ধরনের পরীক্ষণের রীতিকেও বলে থাকি এবং এইসব পরীক্ষার ফলে আচরণ সম্পর্কে আমরা যে তথ্য পাই, তাকেও বলতে পারি। পদ্ধতি হিসেবে অনুবর্তন (Conditioning as method) সরলতম পরিস্থিতিতে প্রাণীর আচরণের প্রকৃতি অনুশীলন করে অর্থাৎ, এক ধরনের শিখনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুশীলন করে। অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপক পরিস্থিতির (Relatively controlled stimulus situation) মধ্যে প্রাণী কিভাবে শিক্ষা করে তাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে অনুবর্তনের তত্ত্বের মধ্যে। তবে এ কথা বললেও বর্তমানে ভুল হবে কারণ অনুবর্তন তত্ত্বের বহু পরিবর্তন হয়েছে। প্যাভলভের পরবর্তীকালেও হাল, (Hull), স্কিনার (Skinner) প্রভৃতি এই নীতির অনেক পরিবর্তন করে শিখনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তাই অনুবর্তনকে (Conditioning) হিলগার্ড এবং মার্কুইস (Hillgard and Marquis) দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্যালভের পদ্ধতিকে তাঁরা বলেছেন, অনুবর্তনের প্রাচীন পদ্ধতি (Classical conditioning) এবং তাঁর পরবর্তী পদ্ধতিগুলিকে বলেছেন, সক্রিয় অনুবর্তন (Instrumental conditioning)। মার্কস (Marx, Melvin) এই দু'ধরনের অনুবর্তন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—("In both cases the adequate stimulus is referred to as a reinforcer but in classical conditioning itis made contingent on another stimulus, which is independent of S's behaviour, in instrumental conditioning it is made contingent on a designated response." অর্থাৎ প্রাচীন অনুবর্তন পদ্ধতিতে শক্তিদায়ী উদ্দীপকের উপস্থাপন (reinforcer) নির্ভর করে উদ্দীপকের উপর। কিন্তু সক্রিয় অনুবর্তনে (Instrumental conditioning) শক্তিদায়ী উদ্দীপকের উপস্থাপন নির্ভর করে ব্যক্তির বা শিক্ষার্থীর আচরণের উপর। এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হবে, যদি বিভিন্ন ধরনের অনুবর্তন সম্পর্কে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করি।

প্যাভলভ প্রবর্তিত অনুবর্তিত প্রক্রিয়া বা প্রাচীন অনুবর্তনের মতবাদ (Pavlovian condition response or Classical conditioning) :

অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার উপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রথম করেন রাশিয়ান শারীরবিজ্ঞানী আইভান্ প্যাভলভ (IvanPavlov)। এই পরীক্ষণের কাজ শুরু হয় প্রায় 1904 খ্রীষ্টাব্দ থেকে। ঐ বছর প্যাভলভকে চিকিৎসাশাস্ত্রে গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তবে এই পরীক্ষার সূত্র তিনি পূর্ববর্তী বিভিন্ন পরীক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছিলেন। প্যাভলভ প্রথম প্রথম তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল রুশ ভাষায় প্রকাশ করেন এবং বাইরে তার প্রচারও খুব কম হয়। কিন্তু ক্রমে তাঁর কাজের ইংরাজী অনুবাদ যখন প্রকাশ পায়, তখন পৃথিবীর মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। বিশেষ করে আমেরিকান মনোবিদরা তখন অন্তদর্শনভিত্তিক মনোবিদ্যার (Introspective Psychology) পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই তাঁরা ভাবলেন, এই প্যাভলভীয় অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার (Conditioned response) মাধ্যমে অন্ততঃ মানুষের আচরণের নৈর্ব্যক্তিক (Objective) অনুশীলন সম্ভব হবে। ঠিক এই সময় মনোবিদ্যয় যে নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলছিল, তাকে বলা হয় আচরণবাদ (Behaviourism)। প্যালভের অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব তাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার এক সুযোগ এনে দিল।

অনুবর্তনের শারীরতত্ত্ব মূলক ভিত্তি (Physiological basis of Conditioning) :

প্যাভলভের অনুবর্তিত প্রক্রিয়া (Condition response mechanism) সম্পূর্ণভাবে শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ প্যাভলভ নিজে ছিলেন শারীরবিজ্ঞানী (Physiologist)। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক প্রাণীর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের জ্ঞান আহরণ করার ক্ষমতা আছে। কোন উদ্দীপক (Stimulus) ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিক করলে তার একটি প্রতিক্রিয়া (Response) হয়। সব প্রাণীর ক্ষেত্রে এক একটি উদ্দীপকের জন্য এক একটি স্বভাবজ প্রতিক্রিয়া (Natural response) নির্দিষ্ট আছে।

বিশেষভাবে, ইতর প্রাণীদের মধ্যে এই উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার স্থিরতা (Fixed S–R relation) লক্ষ্য করা যায়। তারা কোন বিশেষ উদ্দীপকের বর্তমানে ঠিক একই ভাবে প্রতিক্রিয়া করে। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে এই ঘটনার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, প্রত্যেক উদ্দীপকের একটি করে নির্দিষ্ট 'আচরণ মূল্য' (Behaviour value) আছে। কারণ, যে কোন প্রতিক্রিয়াকে মনোবিদরা আচরণ হিসেবেই বিবেচনা করেন। এ রকম কতকগুলি স্বভাবজ আচরণ করার ক্ষমতা নিয়ে মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে। এগুলিকেই বলা হয় সহজাত আচরণ (Innate behaviour)।

প্যাভলভের পরীক্ষা (Pavlov's Experiment) :

প্যাভলভ তাঁর অনুবর্তিত প্রক্রিয়ার পরীক্ষা করে দেখলেন, এইসব স্বভাবজ প্রতিক্রিয়ারও পরিবর্তন হয়। তিনি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণও করলেন, তাঁর যে পরীক্ষার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়, তা

তিনি কুকুরের লালাক্ষরণের উপর করেছিলেন। পরীক্ষাটি খুবই সাধারণভাবে আমরা এখানে বিবৃত করব। ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে কোন খাদ্যবস্তু রাখলে তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হবে লালাক্ষরণ (Salivation)। এই লালাক্ষরণ খাদ্যবস্তু জিহ্বার সংস্পর্শে এলে হতে পারে, বস্তুর গন্ধ বা দর্শনজনিত সংবেদন (Olfactory For visual sensation) থেকেও হতে পারে। তা হলে লালাক্ষরণ (Salivation) হল খাদ্যবস্তুর (উদ্দীপক) স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (Natural response)। প্যালভ পরীক্ষাগারে কুকুরের লালাক্ষরণের পরিমাণ নির্ণয় করলেন। এরপর প্রত্যেক দিন এই পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে কুকুরের সামনে খাবার দেওয়ার আগে একটি ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। অর্থাৎ, তিনি কুকুরকে পরীক্ষাগরে আনার পর কিছুক্ষণ ঘণ্টাধ্বনি করলেন এবং সেই ঘণ্টার ধ্বনি যখন বন্ধ করবেন, ঠিক তার আগের মুহূর্তে কুকুরের সামনে খাদ্যবস্তু উপস্থাপন করলেন। কিছুদিন এইভাবে পুনরাবৃত্তি করার পর দেখা গেল, খাবার দেওয়ার পূর্বেই, ঘণ্টাধ্বনি করাতেই কুকুরের লালাক্ষরণ হচ্ছে। প্রথম প্রথম খাবার দেওয়ার পূর্বে ঘণ্টাধ্বনি করলে কুকুরের লালাক্ষরণ হত না। শব্দের দরুন যে স্বাভাবিক সজাগভাবের প্রতিক্রিয়া (Response of alertness) তাই দেখা যেত। কিন্তু পুনরাবৃত্তি করার ফলে একটি উদ্দীপকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া অন্য উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং এ অবস্থায় কুকুর খাদ্য ছাড়াই শুধুমাত্র ঘণ্টাধ্বনিতে লালক্ষরণের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। একেই প্যাভলভ বললেন অনুবর্তিত আবর্ত ক্রিয়া (Conditioned reflex)। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়া বৈজ্ঞানিক অর্থে আবর্ত ক্রিয়া (Reflex action) বলা যায় না। তাই বর্তমানে মনোবিদগণ একে অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া (Conditioned response) বলে থাকেন বা সংক্ষেপে CR-ও বলে থাকেন। যেমন, এখানে লালাক্ষরণ হল অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া (Conditioned Response; CR)। আর যে উদ্দীপকের (Stimulus) সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে যুক্ত ছিল, তাকে বলা হয় অনাবর্তিত উদ্দীপক (Unconditioned Stimulus) বা সংক্ষেপে US যেমন, এখানে খাদ্যবস্তু অনাবর্তিত উদ্দীপক। যে কৃত্রিম উদ্দীপকের দ্বারা বর্তমানে অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে, তাকে বলা হয় অনুবর্তিত উদ্দীপক (Conditioned Stimulus : CS)। আর এই উদ্দীপকের সঙ্গে যুক্ত স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় অনুবর্তিত উদ্দীপক (Inconditioned Response) বা UR এখানে ঘণ্টাধ্বনি হল অনুবর্তিত উদ্দীপক (CS) এবং সজাগভাবের প্রতিক্রিয়া (Alertness) হল অনাবর্তিত প্রতিক্রিয়া (UR) যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এই সম্পূর্ণ ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে, তাকেই বলা হয় অনুবর্তিত প্রক্রিয়া বা অনুবর্তন (Conditioned responses mechanism or conditioning) ড্রিভার (Drever) তাঁর মনোবিদ্যার অভিধানে এই প্রক্রিয়াকে এক সুন্দর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন—“Conditioning” process by which a response comes to be elicited by a stimulus, object or situation, other than that, to which it is the normal or natural response.” এই অনুবর্তিত প্রক্রিয়ার প্রকৃতি নিম্নের ছবির সাহায্যে ছবির সাহায্যে খুব সহজে বিশ্লেষণ করা যায়।

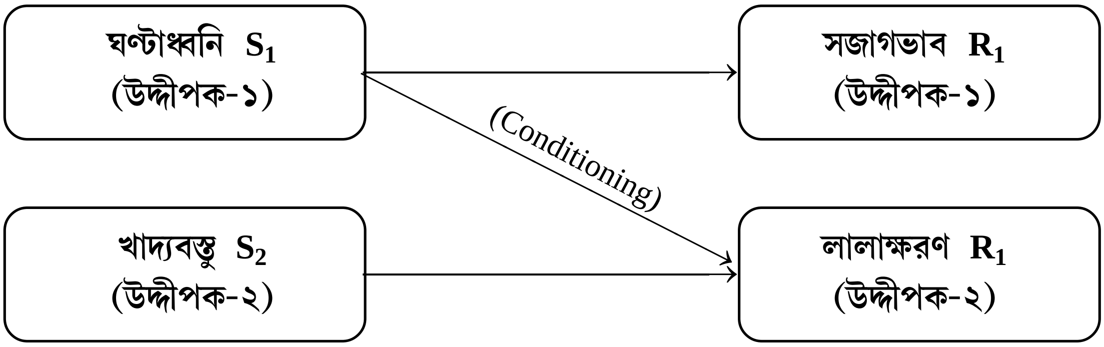

ঘণ্টাধ্বনি খাদ্যবস্তু প্রতিক্রিয়া-১ প্রতিক্রিয়া-২ ———→ লালাক্ষরণ প্রতিক্রিয়া-২

অনুবর্তনের শর্তাবলী (Terms of Conditioning) :

মনোবিদ সাইমণ্ড (Symond) বলেছেন, অনুবর্তন (Conditioning) ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা ছাড়াই কতকগুলি উদ্দীপক এবং তার উপস্থাপনগত কারণের উপর নির্ভরশীল। তাঁর মতে, একটি উদ্দীপকের সঙ্গো একটি কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ার সংযোগ কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে ঘটে থাকে। এই শর্তগুলি তিনি প্যাভলভ ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাপদ্ধতি বিশ্লেষণ করে নির্দেশ করেছেন। এই শর্তগুলির ব্যতিক্রম ঘটলে, অনুবর্তন হয় না, তা প্রমাণিত হয়েছে। প্যাভলভীয় প্রাচীন অনুবর্তনের এই শর্তগুলি হল—

উদ্দীপকের অনুবর্তন (Conditioned Stimulus) :

যে উদ্দীপকের অনুবর্তন করতে হবে (Conditioned Stimulus), সেটি অপর স্বাভাবিক উদ্দীপকের (Unconditioned Stimulus) পূর্বে উপস্থাপন করার দরকার। অর্থাৎ, এখান ঘণ্টাধ্বনিকে (Sound of the bell) আমরা অনুবর্তন করতে চাই, সুতরাং খাদ্য দেওয়ার আগেই ঘণ্টাধ্বনি করতে হবে।

অনুবর্তিত উদ্দীপক (Conditioned Stimulus) :

অনুবর্তিত উদ্দীপকের (Conditioned Stimulus) অবস্থানের সঙ্গো সঙ্গোই অপর উদ্দীপককে (Unconditioned Stimulus) উপস্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ, ঘণ্টাধ্বনি থাকতে থাকতেই খাদ্য উপস্থাপন করতে হবে। তা না হলে অনুবর্তন সম্ভব হবে না। প্যাভলভ তাঁর পরীক্ষা ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ করার পূর্বেই প্রতিদিন খাদ্যবস্তু উপস্থাপন করতেন।

অনাবর্তিত উদ্দীপক (Unconditioned Stimulus) :

অপর উদ্দীপক অনাবর্তিত উদ্দীপকটি (Unconditioned Stimulus) অনুবর্তিত উদ্দীপকের (Conditioned Stimulus) চেয়ে বেশী শক্তিশালী হওয়া দরকার। তা না হলে অনুবর্তন সম্ভব হবে

না। ক্ষুধার্ত কুকুরের কাছে ঘণ্টাধ্বনির চেয়ে খাদ্যবস্তু অনেক বেশী শক্তিশালী উদ্দীপক, তাই ঘণ্টাধ্বনি অনুবর্তিত হয়েছিল।

অনুবর্তনের পুনরাবৃত্তি (Re-Conditioning) :

যে পর্যন্ত না অনুবর্তন ঘটে, সে পর্যন্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় উদ্দীপক একই ক্রমে বারবার উপস্থাপন করতে হবে। পুনরাবৃত্তি অনুবর্তনের একান্ত প্রয়োজনীয় শর্ত।

শিক্ষাক্ষেত্রে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ (Educational implications of Conditioning) :

প্যাভলভের অনুবর্তনের তত্ত্ব একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। এই তত্ত্ব মনোবিদ্যায় বিশেষত শিখনে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল তাঁর এই তত্ত্বটি ছিল নৈর্ব্যক্তিক ও পরীক্ষানির্ভর। তাঁর অনুবর্তন তত্ত্ব প্রকাশের পর বিভিন্ন মনোবিদ এই অনুবর্তন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন যেমন, Watson, Hollingrowth প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে ওয়াটসনের কাজটি এখানে উল্লেখ করা হল স্বল্পাকারে। ওয়টসন তাঁর পরীক্ষায় অ্যালবার্ট নামে একটি এগরো মাসের শিশুকে নিয়ে পরীক্ষা করেন। অ্যালবার্ট ইঁদুরকে ভয় করে না এবং ইঁদুরকে দেখলে ধরতে যায়। শিশুরা সাধারণভাবে জোর শব্দকে (loud noise) ভয় পায়। অ্যালবার্ট যখনই ইঁদুরকে ধরতে যায়, ঠিক সেই মুহূর্তে ওয়াটসন্ জোরের শব্দ উপস্থাপন করলেন। এইভাবে ঘটনাটিকে পুনরাবৃত্তি করে দেখা গেল অ্যালবার্ট ইঁদুর দেখালে ভয় পাচ্ছে। এটি অনুবর্তনের ফল। আবার একইভাবে ওয়াটসন পিটার নামের একটি শিশুকে বিয়োগাত্মক অনুবর্তন (negative conditioning) দিয়ে ভয়মুক্ত করেন। অনুবর্তনের তত্ত্বটি শিক্ষার যে যে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা নীচে আলোচনা করা হল—

উত্তম অভ্যাস গঠন (Forming good habits) :

পরিচ্ছন্নতা, বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা, সময়ানুবর্তিতা প্রভৃতি শিশুদের মধ্যে বর্ণিত অভ্যাস গঠনে প্রাচীন অনুবর্তন প্রতিক্রিয়ার প্রয়োগ দেখা যায়।

অবাঞ্ছিত অভ্যাস দূরীকরণ এবং অনুবর্তিত ভয়, আবেগ থেকে মুক্ত করা (Eliminate unwanted habits and release the following fears, emotions) :

অধিকাংশ শিখনই সামাজিক পরিবেশে অর্জিত হয়। প্রাচীন অনুবর্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যে অর্জিত শিখনকে অপানুর্বতন করা যায়। অপসংগতিমূলক শিশুদের মধ্য থেকে অকারণ ভীতি এবং দুশ্চিন্তা দূর করতে প্রাচীন অনুবর্তন প্রতিক্রিয়া কৌশল ব্যবহার করা যায়।

প্রাণীদের প্রশিক্ষণ (Animal training) :

সার্কাস বা অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রাণীর প্রশিক্ষকগণ প্রাণীদের প্রশিক্ষণ দেবার সময়ে এই অনুবর্তন প্রতিক্রিয়াই ব্যবহার করেন, তবে অনেক সময়েই এ সম্পর্কে তারা সচেতন নন।

মনোচিকিৎসায় ব্যবহার (Use in psychiatry) :

মানসিক অসুস্থ রোগীদের আবেগজনিত ভয়, ঘৃণা, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এই কৌশল প্রয়োগ করে থাকেন।

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন (Positive Attitude Formation) :

বিদ্যালয়, শিক্ষক প্রভৃতির ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে প্রাচীন অনুবর্তন প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

অক্ষর শিক্ষা (Symbolic Learning) :

শিশুদের অক্ষর এবং পাটিগণিতের 4টি মৌলিক ক্রিয়া (যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ) শেখানোর জন্য শিক্ষকগণ কিছু মূর্ত বস্তুর সাহায্যে প্রাচীন অনুবর্তন প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করেন।

স্কিনারের সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্ব (Skinner’s Operant Conditioning Theory) :

প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া করার জন্য উদ্দীপকের প্রয়োজন এবং সেটি প্রতিক্রিয়ার পূর্বে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু বাস্তবে আমরা এমন কিছু আচরণ করি, যা এই তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না।

মানুষ এমন কিছু কাজ বা আচরণ করে যার জন্য উদ্দীপকের পূর্ব উপস্থিতি প্রয়োজন নাও হতে পারে। যেমন, কোনো শিক্ষার্থী ভালো ফল করার জন্য পড়ছে, কারণ সে এটা বোঝে পরীক্ষায় ভালো ফল করলে বাবা-মা সবাই খুব খুশি হবে এবং তাকে প্রশংসা করবে। এখানে আচরণ করার আচরণ পরবর্তী ফলাফল (Consequences)। এই ধরনের পদ্ধতিকে বলে সক্রিয় অনুবর্তন (Operant Conditioning)।

স্কিনার এই ধারণাকে বিস্তৃতভাবে বলেন যে, জীবের আচরণ বা প্রতিক্রিয়া দু'ধরনের। কিছু প্রতিক্রিয়া উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্টি করা হয়, এগুলিকে বলে সৃজিত প্রতিক্রিয়া (Elicited response) এবং কতকগুলি প্রতিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয় যেগুলি হল নিঃসৃত প্রতিক্রিয়া (Emitted response)।

একইভাবে স্কিনার প্রাণীর আচরণকেও দুভাগে ভাগ করেছেন—

- **প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ (Respondent Behaviour) :** প্যাভলভের কুকুরের পরীক্ষায় কুকুরের লালাক্ষরণ এই ধরনের আচরণ।
- **স্বতঃক্রিয়ামূলক আচরণ (Operant Behaviour) :** যেখানে জীবের আচরণ পরবর্তী ফলাফলের উপর নির্ভর করে। স্কিনার তাঁর পরীক্ষায় এই ধরনের আচরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

স্কিনারের পরীক্ষা (Skinner's Experiment) :

স্কিনার তাঁর পরীক্ষা করার জন্য একটি বিশেষ ধরনের বাক্স ব্যবহার করেন, যা স্কিনার বাক্স (Skinner's Box) নামে পরিচিত। স্কিনারের পরীক্ষা বোঝার জন্য স্কিনার বাক্স-এর বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। এটি এক ধরনের বিশেষ বাক্স যেখানে প্রাণীর আচরণ পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড করার জন্য বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা থাকে। খাবার উপস্থাপনের জন্য একটি ট্রে বা পাত্র থাকে। আর থাকে একটি লিভার বা বোতাম, যাতে চাপ দিলে খাবার ট্রে-তে এসে পড়ে। স্কিনার যে সমস্ত প্রাণীদের নিয়ে পরীক্ষা করেন, তার মধ্যে ইঁদুরের পরীক্ষাটি এখানে বর্ণনা করা হল।

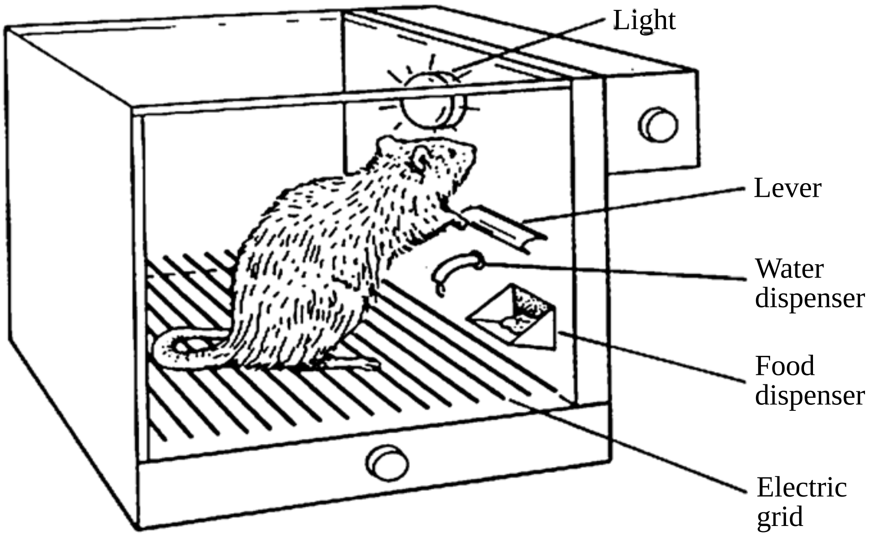

Fig : স্কিনারের সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্ব

প্রথমে একটি ক্ষুধার্ত ইঁদুরকে বাক্সে (Skinner's Box) ঢোকানো হয় এবং ট্রে-তে খাবার দেওয়া হয়। ইঁদুরটি ট্রে থেকে খাবার খায়। এখানে স্কিনার বা ইঁদুর কেউই খাদ্যবস্তু লিভার টিপে আনেন। পরবর্তীতে ইঁদুরকে বাক্সে ঢোকানোর পর স্কিনার নিজেই লিভার টিপে খাবার ট্রে-তে আনার ব্যবস্থা করেন এবং ইঁদুরটি ওই খাবার খায়। এইভাবে স্কিনার ইঁদুরটিকে পরীক্ষামূলক পরিস্থিতির সাথে পরিচয় করান। এরপরে স্কিনার মূল পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। এবার ওই ইঁদুরটিকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাক্সে ঢোকানো হয় এবং ট্রে-তে কোনো খাবার দেওয়া হয় না। ইঁদুরটি খাবার পাবার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া করতে থাকে এবং একসময় হঠাৎ ইঁদুরটি লিভারে চাপ দিয়ে ফেলে এবং ট্রে তে খাবার এসে পড়ে এবং খাবার খায়। পরে আবার ইঁদুরটিকে বাক্সে ঢুকিয়ে দিলে দেখা যায় ইঁদুরটি নিজেই লিভারে চাপ দিয়ে খাবার আনতে পারছে। অর্থাৎ ইঁদুরটির মধ্যে একটি নতুন আচরণ সৃষ্টি হচ্ছে। স্কিনার এই

ধরনের প্রক্রিয়াকে বলেন সক্রিয় অনুবর্তন (Operant Conditioning)। স্কিনার এই ধরনের অনুবর্তনকে R-type conditioning নাম দিয়েছিলেন এবং প্রাচীন অনুবর্তনকে S-type conditioning বলেছিলেন।

সক্রিয় অনুবর্তনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (Different features of Operant Conditioning) :

স্কিনার সক্রিয় অনুবর্তনের তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে অনুবর্তনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ :

A. প্রবলক (Reinforcement) :

যখন কোনো উদ্দীপক কোনো এক আচরণের সম্ভাব্যতাকে বাড়িয়ে তোলে, তখন সেই উদ্দীপককে বলে প্রবলক। Parson-এর অনুসারে “A reinforcement is anything that increase the frequency of the behaviour that has led to it.” Santrock বলেছেন “Reinforcement (reward) is a consequence that increases the probability that a behaviour will occur.”

এখানে প্রবলককে পুরস্কারের (Reward) সাথে তুলনা করেছেন। কোনো বাংলা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি রচনা লিখতে বলেছেন। শিক্ষক কোনো এক শিক্ষার্থীর রচনা পড়ার পর বললেন, “বাঃ’ খুব সুন্দর লিখেছো। তোমার লেখা আমার খুব ভালো লেগেছে।” শিক্ষকের এই প্রশংসা ওই শিক্ষার্থীর রচনা লেখাকে আরও উৎসাহিত করবে এবং পরবর্তী ওই ধরনের লেখাকে প্রভাবিত করবে। এই উদাহরণে শিক্ষকের প্রশংসা এক ধরনের প্রবলক (reinforcement)। অনেক সময় বাবা-মা তার শিশুকে বলে, “এই কাজটা কর, তোকে একটা চক্‌লেট দেবো।” এখানে চক্‌লেটকে হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে (প্রশংসা)।

প্রবলককে দু ভাগে ভাগ করা হয়—ধনাত্মক (positive) এবং ঋণাত্মক (negative) প্রবলক। যে উদ্দীপক কাঙ্ক্ষিত আচরণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে তাকে বলে প্রবলক বা reinforcement। প্রবলক ধনাত্মক বা ঋণাত্মক দুধরনের হতে পারে।

(a) **ধনাত্মক প্রবলক (Positive Reinforcement) :** এটি এক ধরনের সুখদায়ক বা কাঙ্ক্ষিত (desired) উদ্দীপক যার উপস্থাপন কোনো আচরণকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। উপরের দুটি উদাহরণেই প্রশংসা এবং ‘চক্‌লেট’ ধনাত্মক প্রবলক।

(b) **ঋণাত্মক প্রবলক (Negative Reinforcement) :** এক শিশু বাড়িতে পড়াশুনো না করে টিভি দেখছে এবং বাবা সারাক্ষণ বলে চলেছে, “পড়াশুনো করছিস্ না কেন? শিশুটি বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত পড়াশুনো করতে বসলো। এখানে শিশুটি যে আচরণটি (পড়াশনো) করলো তার কারণ কী? এখানে কিন্তু কোনো সুখদায়ক কিছু ঘটেনি। পরন্তু বাবার একঘেয়ে কথাতে বিরক্ত হয়ে এবং বাবার জ্বালাতন (nagging) থেকে রেহাই পেতে উদ্ভ আচরণটি করলো

এবং বাবাও কিন্তু চাইছিল শিশুটি এই আচরণটি (পড়াশুনো) করুক। এখানেও কিন্তু কাঙ্ক্ষিত আচরণ বৃদ্ধি পেল। এটি ঋণাত্মক প্রবলকের উদাহরণ। অর্থাৎ ঋণাত্মক প্রবলক হল “Removal of an adverse (unpleasant) stimulus” বা “Withdrawing an in hibiting or adverse stimulus, অর্থাৎ অসুখকর উদ্দীপকের বিলোপ বা নিবৃত্তি হল কণাত্মক প্রবলক। প্রবলক (reinforcement) ও শাস্তি (punishment) এই দুটির ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রবলক কাঙ্ক্ষিত আচরণ বৃদ্ধি করে। কিন্তু শাস্তি অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণকে রোধ করে বা হ্রাস করার চেষ্টা করে।

B. শাস্তি (Punishment) :

প্রবলকের বিপরীত প্রক্রিয়া হল শাস্তি। প্রবলক (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) সব সময় কাঙ্ক্ষিত আচরণের বৃদ্ধি ঘটায়, কিন্তু শাস্তি কখনো কাঙ্ক্ষিত আচরণ বৃদ্ধি করে না। শাস্তি অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ বন্ধ করতে বা উক্ত আচরণের শক্তিকে হ্রাস করতে বা পুনঃসম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। ক্লাসে একজন শিক্ষার্থী গল্প করছিল বলে শিক্ষক তিরস্কার (rebuke) করলেন। এখানে শিক্ষকের তিরস্কার হল শাস্তি (punishment)। শাস্তি আবার দু’ধরনের হতে পারে।

(a) **ধনাত্মক শাস্তি (Positive Punishment) :** ধনাত্মক শাস্তি হল অপছন্দের বা অনাকাঙ্ক্ষিত উদ্দীপকের উপস্থাপন (Presentation of an undesirable or adversive stinulus)। অর্থাৎ কোনো আচরণের পরে যদি এই ধরনের উদ্দীপকের উপস্থাপন করা হয়, তবে তাকে বলে ধনাত্মক শাস্তি। উপরের তিরস্কারের উদাহরণটি এই ধরনের শাস্তি। কোনো শিশু বানান (spelling) ভুল লিখলে শিক্ষক বলেন বানানটি ১০০ বার শুদ্ধ করে লিখে অভিভাবকের সই করে আনবে। এটিও এক ধরনের ধনাত্মক শাস্তি।

(b) **ঋণাত্মক শাস্তি (Negative Punishment) :** ঋণাত্মক শাস্তিতে পছন্দের বা কাঙ্ক্ষিত উদ্দীপককে বন্ধ বা লোপ বা কমানো হয়। অর্থাৎ কোনো আচরণের পরে যদি কোনো পছন্দের উদ্দীপককে সরিয়ে নেওয়া হয় বা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন তাকে বলে ঋণাত্মক শাস্তি। যেমন, কোনো শিশু কোনো নির্দিষ্ট কাজ না করার পর বাবা বা মা বললো, “আজকে তোমার টিভি দেখা বন্ধ।” কোনো ক্লাসে একজন শিক্ষার্থী বন্ধুদের সাথে ক্লাস চলাকালীন গল্প করছিল বলে শিক্ষক তাকে বন্ধুদের কাছ থেকে সরিয়ে অন্যত্র বসিয়ে দিলেন। এই দুটি উদাহরণ ঋণাত্মক শাস্তির উদাহরণ। শাস্তির ক্ষেত্রে কোনো একটি আচরণকে বন্ধ বা কমানোর চেষ্টা করা হয়। আর প্রবলক কোনো একটি আচরণকে তৈরি বা বাড়াতে সাহায্য করে।

C. শেপিং (Shaping) :

সাধারণভাবে কোনো একটি আচরণ শেষ হবার পর প্রবলক বা reinforcement দেওয়া হয়। কিন্তু আচরণটি যদি দীর্ঘ বা জটিল হয়, তাহলে প্রবলক অনেকসময় উপস্থাপন করা যায় না যতক্ষণ

পর্যন্ত না সম্পূর্ণ আচরণটি সম্পন্ন হয়। সেক্ষেত্রে সক্রিয় অনুবর্তনের প্রয়োগ করানো কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ হয়। এই অবস্থায় যদি সমগ্র আচরণকে কিছু ছোটো ছোটো অংশে বিভক্ত করে, প্রতিটি অংশের সঠিক আচরণের জন্য প্রবলক দেওয়া হয়, তবে দেখা যাবে ধীরে ধীরে সমগ্র আচরণটি করা সম্ভব হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াটির নাম শেপিং। Coleman-এর ভাষায় শেপিং হল “a technique of operant conditioning that involves gradually building up a desired pattern of behaviour by selectively reinforcing closer and closer approximati to it”. Parson, Hinson & Brown বলেছেন, “Shaping is a reinforcement strategy in which remote approximations of a target behaviour are rewarded.”

D. প্রবলকের সিডিউল (Schedule of Reinforcement) :

স্কিনার বলেন শক্তিদায়ক উদ্দীপক বিভিন্নভাবে দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ সিডিউল বিভিন্ন রকমের হতে পারে—

1. **অবিচ্ছিন্ন সিডিউল (Continuous Schedule) :** প্রতিটি সঠিক আচরণের পর প্রবলক উপস্থাপন করাকে অবিচ্ছিন্ন সিডিউল বলে। যেমন, শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী ঠিক উত্তর দিলেই ‘খুব ভলো উত্তর দিয়েছো’ বলা। এটি এই ধরনের সিডিউলের উদাহরণ।
2. **স্থির অনুপাতভিত্তিক সিডিউল (Fixed Ratio Schedule) :** এখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক সঠিক আচরণের পর যদি একবার করে প্রবলকের উপস্থাপন করা হয়। যেমন, কোনো কুইজে পর পর চারটি ঠিক উত্তর দিলে একটি বোনাস পয়েন্ট দেওয়া।
3. **স্থির সময় ব্যবধানভিত্তিক সিডিউল (Fixed Interval Schedule) :** এখানে নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রবলক উপস্থাপিত হয়। যেমন, প্রতিদিন চার পিরিয়ড ক্লাস করার পর যে টিফিনের সময় দেওয়া হয়, সেটি এক ধরনের উদাহরণ।
4. **পরিবর্তনীয় অনুপাতভিত্তিক সিডিউল (Variable Ratio Schedule) :** এখানে প্রবলক কখন দেওয়া হবে সেটা বোঝা আগে থেকে সম্ভব নয়। কতবার আচরণটি করলে প্রবলক উপস্থাপন করা হবে সেটি পরিবর্তনশীল। যেমন—লটারির টিকিট কেটে পুরস্কার পাওয়াটা এই শ্রেণির উদাহরণ।
5. **পরিবর্তনীয় সময় ব্যবধানভিত্তিক সিডিউল (Variable time Schedule) :** এখানে কত সময় পরে প্রবলক উপস্থাপিত হবে তা পরিবর্তনীয় এবং পূর্ব অনুমান সম্ভব নয়। যেমন, বেশ কিছুদিন টানা কাজ করার পর হঠাৎ করে ছুটি দেওয়া এই শ্রেণির উদাহরণ।

E. নির্বাপণ ও পুনরাবর্তন (Extinction and Reconditioning) :

সক্রিয় অনুবর্তনে নির্বাপণ ও পুনরাবর্তনের ধারণাটি প্রাচীন অনুবর্তনের অনুরূপ। যদি লিভারে চাপ

দেবার পর খাবার দেওয়া না হয় এবং এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলে, তাহলে দেখা যাবে ইঁদুরটি লিভারে চাপ দেবার আচরণটি আর সম্পাদন করছে না অর্থাৎ আচরণের নির্বাপণ (Extinction) হয়েছে। নির্বাপণের কিছুদিন পরে যদি আবার শক্তিদায়ক উদ্দীপকের উপস্থাপন করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে ইঁদুরটি পুনরায় অনুবর্তন অনুরূপ আচরণ করছে অর্থাৎ পুনরনুবর্তন (reconditioning) হয়েছে।

F. প্রমট (Promt) :

প্রমট হল একধরনের উদ্দীপক বা সূত্র (clue) যা প্রতিক্রিয়ার আগে দেওয়া হয়, যার ফলে প্রতিক্রিয়া করতে সুবিধে হয় বা প্রতিক্রিয়া করার প্রবণতা বাড়ে। Santrok-এর কথায় প্রমট হল—"an added slimulus or cue that is given just before response and increases the likelihood the response will occur."

ধরে নেওয়া যাক, কোনো একজন শিক্ষক ক্লাসে 'সরল সুদ' আলোচনা করবেন। তিনি দেখতে চান শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে পূর্বজ্ঞান কতটা। তিনি শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করলেন—আমরা টাকা কোথায় গচ্ছিত রাখি? কেউ কেউ উত্তর দিল—আলমারিতে। কিন্তু শিক্ষক চাইছিলেন শিক্ষার্থীরা ব্যাঙ্ক উত্তর দিক। এবার শিক্ষক বললেন—'আর কোথায় রাখা হয়?' এবার শিক্ষার্থী উত্তর না দেওয়াতে শিক্ষক বললেন—যেখানে টাকা রাখি আমরা যেটি ইংরেজি 'B' দিয়ে শুরু। এটি একধরনের প্রশ্নটা। ধরে নেওয়া যাক, এক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর উত্তর দিতে পারল না। তখন শিক্ষক আবার বললেন—এটার সাথে 'ব্যাঙ' কথাটির মিল্ আছে। তখন শিক্ষার্থীরা উত্তর দিল স্যার উত্তরটা কি ব্যাঙ্ক হবে। এখানে শিক্ষক যা করলেন তা হল প্রথমটা।

স্কিনারের তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Implications of Skinner's Theory) : স্কিনারের তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্যগুলি হল—

(i) শাস্তির ব্যবহারযোগ্যতা (Usability of punishment) :

শাস্তি কিন্তু কোনো কাঙ্ক্ষিত আচরণকে উৎসাহিত বা বৃদ্ধি করে না, এটি অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণকে বন্ধ বা লোপ করে। সুতরাং শাস্তির চাইতে প্রবলক (reinforcement) অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

(ii) প্রবলকের ব্যবহার (Use of reinforcement) :

নতুন আচরণ সৃষ্টির সময় প্রবলকের উপস্থাপন শিক্ষণকে অত্যন্ত কার্যকরী করে। সুতরাং শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে এই ধরনের উদ্দীপককে ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে আর একটি পরিস্থিতির কথা মনে রাখতে হবে। যে, প্রবলক কিন্তু কাঙ্ক্ষিত আচরণের পরেই দিতে হবে, দীর্ঘসময় ব্যবধানে ওই উদ্দীপকের কার্যকারিতা হ্রাস পায়। প্রবলক উপস্থাপনের বিভিন্ন সিডিউল আছে, সেগুলিকে চিন্তা করে প্রবলক উপস্থাপন করতে হবে।

(iii) বৃহৎ ও জটিল আচরণকে ক্ষুদ্র অংশে রূপান্তরিত করা (Transforming large and complex behaviors into smaller ones) :

আমরা দেখেছি শেপিং একটি গুরুত্বপূর্ণ শিখন-পদ্ধতি যখন কোনো আচরণ জটিল ও বৃহৎ হয়। আচরণটিকে বা কাজটিকে ছোটো অংশে বিভক্ত করে প্রতিটি অংশের সঠিক আচরণকে শক্তিদায়ক উদ্দীপক দিয়ে উৎসাহিত করলে পূর্ণ আচরণটি তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করতে সুবিধে হয়। পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীর অনেক সময় সিলেবাসকে ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে প্রতিদিনের অধ্যয়নের কর্মসূচি নির্ধারণ করে। এটিও এক ধরনের শেপিং। এটি শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(iv) শিক্ষার্থীর পূর্ব প্রস্তুতি (Student Pre-Preparation) :

কোনো নতুন আচরণ তৈরির পূর্বে শিক্ষক বা শিক্ষিকার শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। অর্থাৎ তিনি দেখবেন ওই আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী কতটা প্রস্তুত। শিক্ষার্থীর যদি পূর্বজ্ঞান বা পূর্ব প্রস্তুতি না থাকে, তাহলে কাঙ্ক্ষিত আচরণ তৈরি করা কষ্টসাধ্য হবে।

(v) সংকেত প্রদান বা সাহায্য দান (Signaling or assistance) :

শিক্ষার্থীর যখন প্রথম কোনো আচরণের শিখন হচ্ছে তখন শিক্ষক বা শিক্ষিকা যদি শিক্ষার্থীকে কোনো সঙ্কেত (clue) বা সাহায্য (prompt) দেন, তাহলে শিক্ষার্থীর শিখন সহজ হয় এবং সেতাড়াতাড়ি কাঙ্ক্ষিত আচরণে পৌঁছাতে পারে।

(vi) কাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ (Desired and undesirable behaviour) :

এই পদ্ধতিতে যেমন কাঙ্ক্ষিত আচরণ তৈরি সম্ভব, একইভাবে অনভিপ্রেত আচরণকেও দূর করা সম্ভব।

(vii) প্রোগ্রাম শিখন (Programmed Learning) :

স্কিনারের এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই প্রোগ্রাম শিখন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। এটি একটি স্বশিখন পদ্ধতি, যেখানে শিক্ষার্থী নিজে থেকেই নিজের শিখন সম্পূর্ণ করে।

প্রজ্ঞামূলক শিখন তত্ত্ব (Cognitive Theories of Learning) :

যখন ব্যক্তি কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের “সার্বিক অবস্থাকে” (Whole pattern) অনুধাবনের মাধ্যমে বিষয়কে আয়ত্ত করে বা আচরণের পরিবর্তন করে তখন প্রজ্ঞামূলক শিখন হয়। অর্থাৎ, এই ধরনের শিখনে ব্যক্তি নির্দিষ্ট বিষয়ের আংশিকভাবে প্রত্যক্ষণ না করে, বরং সমগ্র অংশের একটি সম্পূর্ণ ধারণা তৈরি করে। এই সম্পূর্ণ ধারণা তৈরি করতে ব্যক্তি নিজস্ব প্রত্যক্ষণ, চিন্তন, যুক্তি, স্মৃতি, কল্পনা, বুদ্ধি ইত্যাদিকে কাজে লাগায়। জ্ঞানমূলক বা প্রজ্ঞামূলক শিখনের ক্ষেত্রে গেস্টাল্ট, বরুনার ও পিঁয়াজের শিখন তত্ত্বকে তুলে ধরা হল—

৬.৫ শিখনের প্রজ্ঞামূলক তত্ত্ব (অন্তর্দৃষ্টি মূলক এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ) এবং এদের শিক্ষাগত তাৎপর্য (Cognitive Theories of Learning (Insightful and Information Processing) and its Educational Implications)

গেস্টাল্ট তত্ত্ব (Theory of Gestalt) :

পূর্বে আমরা যে তিনটি শিখন তত্ত্বের (প্যাভলভ, থর্নডাইক, স্কিনার), আলোচনা করেছি, সেগুলিতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনকেই শিখন বলা হয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে একদল মনোবিদরা এই যান্ত্রিক শিখন তত্ত্বকে সমালোচনা করেন। তারা বলেন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মাঝে যে মানসিক প্রক্রিয়া কার্যকরী তা উপরের শিখন তত্ত্বগুলিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যে সমস্ত মনোবিজ্ঞানীরা এই যান্ত্রিক উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব স্বীকার করেননি তারা হলেন সমগ্রতাবাদী (Gestal Psychologist)। জার্মান ভাষায় ‘Gestalt’ কথার অর্থ সমগ্র অবয়ব বা সমগ্ররূপ, সেজন্য এই ধরণের শিখন তত্ত্বকে বলে গেস্টাল্ট তত্ত্ব। গেস্টাল্ট তত্ত্বে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম হলেন—ওয়ার্দিমার (Wartheimer), কফকা (Koffka) এবং কোহলার (Kohlar)। গেস্টাল্টবাদী মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে শিখন বিচার বিবেচনাহীন যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। তাদের মতে সমস্যামূলক পরিস্থিতির সমগ্ররূপকে উপলব্ধি করার পরেই শিখন সম্ভব হয়। এজন্যই এই মতবাদকে সমগ্রতবাদের (Field theory) বলা হয়ে থাকে।

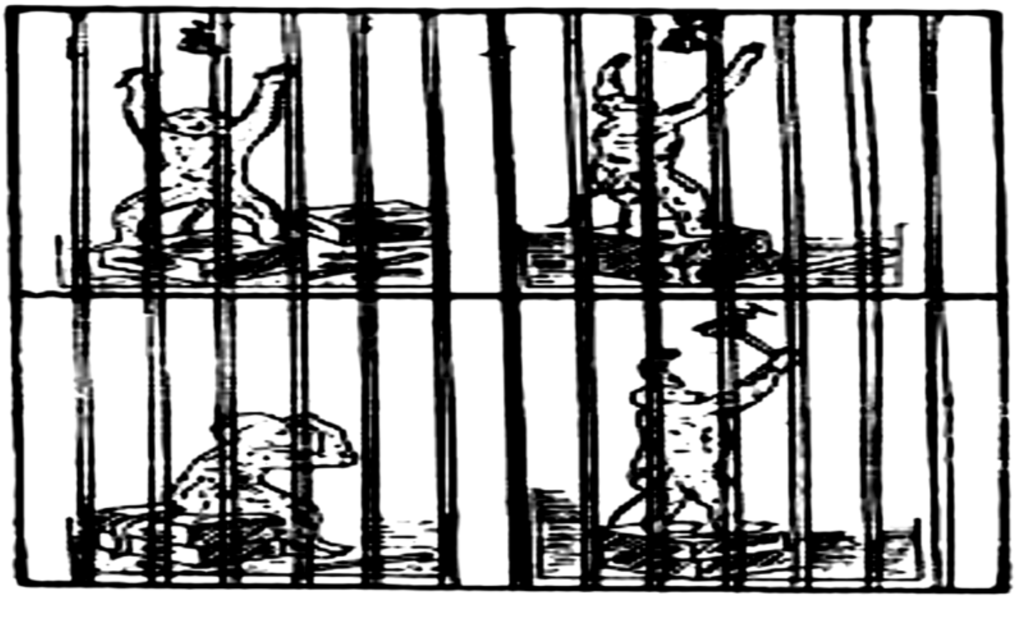

Fig : Insightful learning theory

এই শিখন তত্ত্বটি ব্যাখ্যার আগে আমরা কোহলারের দুটি পরীক্ষার আলোচনা করব। কোহলার একটি খাঁচাতে কিছু কলা উপর থেকে ঝুলিয়ে দিলেন এবং খাঁচার মধ্যে দুটো কাঠের বাক্স রেখে দিলেন। বাক্স দুটির উচ্চতা এমনই যে কোনো একটির উপরে দাঁড়ালে কলার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দুটি বাক্স একটির উপরে আর একটি রাখলে কলার নাগাল পাওয়া যায়। এই অবস্থায় কোহলার অনেকগুলি শিম্পাঞ্জিকে খাঁচায় ঢোকালেন। কিন্তু কোনো শিম্পাঞ্জিই কলা পাড়তে পারল না। অবশেষে সুলতান নামে একটি বুদ্ধিমান শিম্পাঞ্জিকে খাঁচায় ঢুকিয়ে কোহলার একটি হাতের উপর আর একটি হাত রেখে ইশারা করতেই সুলতান বাক্স দুটি নামিয়ে দিল। পরবর্তীতে সুলতান কোনো ভুল না করে প্রত্যেকবারই কলা নামাতে শিখল। পরে আর একটি পরীক্ষায় কলা রাখা হল খাঁচায় বাইরে আর খাঁচার মধ্যে রাখা হল দুটি লাঠি। দুটি লাঠির কোনটি দিয়েই কলার নাগাল পাওয়া যায় না। কিন্তু লাঠি দুটি একসঙ্গে আটকানো যায় এবং তখন খাঁচার ভেতর থেকে কলা টেনে আনা হয়। এখানেও সুলতানকে বাঁচার মধ্যে খাঁচার মধ্যে ঢোকানো হল এবং কোহলার ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করলেন। সুলতান লাঠি দুটো নিয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ লাঠি দুটো জুড়ে ফেলে এবং সহজেই কলা টেনে নিয়ে আসে।

দুটি ক্ষেত্রেই সুলতান যখন সমগ্র পরিস্থিতিতে বিচার করতে পেরেছেন তখনই সে হঠাৎ করে সমস্যা সমাধানের পন্থা খুঁজে বার করতে পেরেছে। হঠাৎ করে এই সমস্যা সমাধান করে ফেলাকে গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন—অন্তর্দৃষ্টি (Insight)। এজন্য গেস্টাল্ট শিখন তত্ত্বকে অন্তদৃষ্টিমূলক শিখনও (Insightful learning) বলে।

Colman তাঁর 'Dictionary of Psychology'-তে অন্তদৃষ্টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—The process by which the meaning of significance of the solution of a suddenly becomes class..." অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হঠাৎ কোনো কিছুর অর্থ বা কোনো সমস্যার সমাধান অর্থপূর্ণ হয় তাই হল অন্তর্দৃষ্টি। Colman উদাহরণ হিসেবে আর্কিমিডিসের ইউরেকা গল্পটির কথা উল্লেখ করেছেন। যেখানে আর্কিমিডিস কথাটিকে স্নান করতে করতে হঠাৎ তার সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন। এটিও অন্তর্দৃষ্টির একটি প্রকৃস্ট উদাহরণ। এছাড়াও Kosslyn এবং Rosenberg অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন—Learning that occurs when a person of animal suddenly grasps what something means and incorporates that new knowledge into old knowledge অর্থাৎ কোনো মানুষ বা প্রাণী (সুলতানের ক্ষেত্রে) যখন হঠাৎ করে কোনো কিছুর অর্থ বুঝতে পারে তখনই তার অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন হয় এবং তখন যে সেই নতুন জ্ঞানকে পুরানো জ্ঞানের মধ্যে আত্মস্থ করে নেয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা বলেন অন্তর্দৃষ্টি ধীরে ধীরে বা ধাপে সংগঠিত হয়। ধাপগুলি হল

- প্রথমে ব্যক্তি পরিস্থিতি পুরোপুরি প্রত্যক্ষণ করার চেষ্টা করে।

- এই প্রত্যক্ষণের ভিত্তিতে ব্যক্তি প্রতিক্রিয়া করে। এই প্রতিক্রিয়া পরিস্থিতির মধ্যে পরিবর্তন আসে যা তার প্রত্যক্ষণের প্রকৃতিকেও পাল্টে দেয়।
- পরিবর্তিত প্রত্যক্ষণের মধ্যেমে যে পর্যায়ক্রমে প্রতিক্রিয়া করতে থাকে।
- এভাবে যে হঠাৎ সমস্যাটির সমাধান খুঁজে পায় এবং সেই পর্যায়টি হল অন্তর্দৃষ্টি।

গেস্টাল্ট মতবাদের শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Significance of the Gestalt) :

গেস্টাল্ট মতবাদের শিক্ষাগত তাৎপর্যগুলি হল—

(i) প্রথমত কোনো বিষয় উপস্থাপনের সময় প্রথমে সমগ্র রূপটি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। পরে প্রতিটি অংশের ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—কোনো শিক্ষক/শিক্ষিকা যদি কোনো কবিতা পড়তে চান তবে প্রথমে কবিতাটির সমস্ত অংশ পাঠ করবেন বা কবিতাটির মূল বিষয় ব্যাখ্যা করবেন ও পরে প্রতিটি ছত্র বা লাইনের ব্যাখ্যা দেবেন।

(ii) গেস্টাল্টবাদীদের মতে শিখন হয় অন্তর্দৃষ্টি থেকে, যখন শিক্ষার্থী কোনো পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্পর্ক সাধন করতে পারে তখন তার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি হয়। সুতরাং শিক্ষার্থী যেন বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক সাধন করতে পারে সেদিকে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

(iii) গেস্টাল্টবাদীদের মতে অন্তর্দৃষ্টি জাগরণের জন্য প্রয়োজনীয়—পৃথকীকরণ ও সাম্যনীকরণ। শিক্ষক/শিক্ষিকা যদি বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য চিহ্নিত করতে সাহায্য করেন। তবে শিক্ষার্থীর শিখনে সুবিধা হয়।

(iv) গেস্টাল্ট মতে শিখন যান্ত্রিক প্রচেষ্টা নয়। শিখন হল একধরনের মানসিক উপলব্ধি। সুতরাং শিক্ষক/শিক্ষিকা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন শিক্ষার্থীরা মুখস্থ বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিখন করতে উদ্যোগী না হয়।

(v) যে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, সেগুলিকে কম সময়ের ব্যবধানে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

(vi) যদি পূর্ববর্তী পার্টির সঙ্গো পরবর্তী পাঠকের সম্পূর্ণ যুক্ত করে উপস্থাপন করা যায় তবে শিখন সহজ হবে।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণের দৃষ্টিভঙ্গি (Information processing approach) :

বর্তমানে মানুষের স্মরণক্রিয়াকে কম্পিউটারের সাথে তুলনা করা হয়। কম্পিউটারে যেমন—Input—

Process–Output রয়েছে তেমনি মানুষের স্মরণক্রিয়াতেও এই তিনটি প্রক্রিয়া কাজ করে বলে এই মতবাদে বিশ্বাস করা হয়।

মানুষের তথ্য প্রক্রিয়াকরণকে ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের মডেলের উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় মডেলটি হল অ্যাটকিনসন ও সিফরিনের (Attkinson & Shifffrin)।

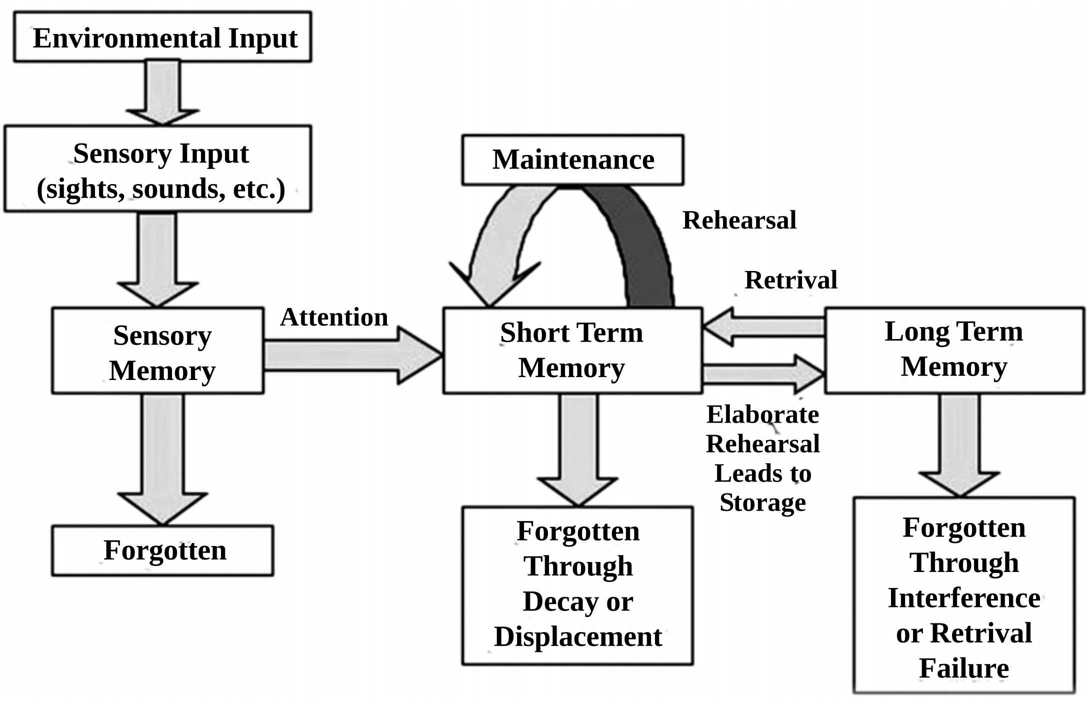
Environmental Input
Sensory Input (sights, sounds, etc.)
Maintenance
Rehearsal
Retrival
Sensory Memory
Attention
Short Term Memory
Long Term Memory
Elaborate Rehearsal Leads to Storage
Forgotten
Forgotten Through Decay or Displacement
Forgotten Through Interference or Retrival Failure

Fig : Attkinson & Shiffrin Multi Store Model

এই মডেলে বলা হয়েছে তথ্য পরিবেশ থেকে আমাদের বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সেন্সরি রেজিস্টারে (Sensory Register) প্রবেশ করে। সেখান থেকে কিছু তথ্য যেগুলি আমাদের পূর্ব পরিচিত ও আগ্রহসম্ভারক (interesting) সেগুলি পরবর্তী ধাপে যায়, যেটির নাম ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি (Short Term Memory of STM)। এটি প্রথম তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ধাপ। যেগুলি প্রক্রিয়াকরণ হল না সেই তথ্যগুলির বিস্মৃতি ঘটল। এবারে STM থেকে বেশ কিছু তথ্য নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকরণের ফলে পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করে, যার নাম দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি (Long Term Memory or LTM)। যে তথ্যগুলি LTM প্রবেশ করল না সেগুলিরও বিস্মৃতি ঘটবে। অর্থাৎ চিত্র আকারে এটিকে প্রবেশ করলে পরের পৃষ্ঠায় চিত্রটি পাবে—

এই মডেলে তিনটি স্তর বা পর্যায়ের (stage) কথা বলা হয়েছে। স্তর তিনটি হল

A. সেন্সরি রেজিস্টার (Sensory Register বা সংবেদনমূলক স্তর)

B. ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি (Short term Memory বা STM)

C. দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি (Long term Memory বা LTM)

(A) প্রথম স্তর : সেন্সরি রেজিস্টার (Sensory Register বা সংবেদনমূলক স্তর) :

পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রথমে মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয়ে এসে আঘাত করে এবং এই স্তরে পৌঁছায়। একসাথে অনেক তথ্য গ্রহণ করতে পারলেও এই স্তরে তথ্যের স্থায়িত্ব খুব কম (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 1 সেকেন্ডেরও কম)। অর্থাৎ অধিকাংশ তথ্যই বিস্মৃতিতে চলে যায়। এখানে তথ্যগুলি অর্থহীনভাবে থাকে। এই স্তর থেকে কিছু তথ্য পরবর্তী পর্যায় বা স্তরে পৌঁছায়। যে তথ্যগুলি অর্থপূর্ণ এবং যে তথ্যগুলির উপর আমরা বিশেষ মনোযোগ দিই সেগুলিই শুধুমাত্র পরবর্তী STM স্তরে নির্বাচিত হয়। এই তথ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির তথ্য সম্বন্ধে পূর্ব অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

(B) দ্বিতীয় স্তর : ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি (Short term Memory—STM) :

সেন্সরি রেজিস্টার থেকে কিছু নির্বাচিত তথ্য এই পর্যায়ে আসে। এখানেও কিন্তু তথ্য স্থায়ীভাবে থাকে না। এখানে তথ্য কমবেশি 30 সেকেন্ডের কাছাকাছি স্থায়ী হয়। এই স্তর থেকে কিছু তথ্য LTM স্তরে প্রবেশ করে বাকি তথ্যের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে। এই পর্যায়ে স্থির হয় কোন তথ্যগুলি LTM-এ যাবে এবং কোনগুলি বর্জিত হবে।

(C) তৃতীয় স্তর : দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি (Long term Memory বা LTM) :

তথ্য প্রক্রিয়াকরণের এটি শেষ বা অন্তিম পর্যায়। এই স্তরে তথ্য পৌঁছালে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই পর্যায়ের পরিসর অনেক বেশি। এই স্তরে যেসব তথ্য থাকে সেগুলি সম্পর্কে আমরা সচেতন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে তথ্য দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে স্বাভাবিকভাবে যায় না, সেটির জন্য কিছু কৌশল প্রয়োজন। যেমন—

(i) **পুনরাবৃত্তি (Repetition) :** তথ্য বারংবার মনে করার চেষ্টা করলে তথ্য LTM-এ পৌঁছায়।

(ii) **বিস্তৃতিকরণ (Elaboration) :** এর মানে হল নতুন তথ্যকে অর্জিত জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে অর্থপূর্ণ করা। (adding meaning to new information by connecting with already existing knowledge)

(iii) **বিভাজিত অনুশীলন (Distributed practice) :** এর অর্থ হল বিশ্রাম ও বিরাম সহযোগে অল্প অল্প সময় ধরে অনুশীলন করা। পরীক্ষার আগে অনেক তথ্য একসাথে টানা মনে রাখার চেষ্টা করলে সমস্যা তৈরি হয় এবং তথ্য দীর্ঘস্থায়ী স্তরে পৌঁছাতে পারে না। ফলে পরীক্ষার

পর ঐ তথ্যগুলির বিলুপ্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এটিকে বলে 'mass practice'. এর বিপরীত প্রক্রিয়া হল বিভাজিত অনুশীলন, যেখানে বিরাম সহকারে অল্প অল্প তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।

কার্যকরি স্মৃতি (Working memory) :

ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি বা STM হল কার্যকরী স্মৃতি। সেন্সরি রেজিস্টার দিয়ে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে যে তথ্য প্রবেশ করে এবং প্রয়োজনমত দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি থেকে তথ্য নিয়ে কার্যকরী স্মৃতি কাজ করে। কম্পিউটারে যেমন একসাথে অনেক তথ্য নিয়ে কাজ করা হয় না, কার্যকরী স্মৃতিতেও তেমন প্রয়োজনীয় তথ্য দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি থেকে নিয়ে কাজ করা হয়। দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে তথ্য পৌঁছাবার পর সেগুলি বিভিন্নভাবে সজ্জিত থাকে। সেগুলি

A. **অর্থগত স্মৃতি (Semantic memory) :** এখানে ধারণা, শব্দ সম্পর্কিত তথ্য সজ্জিত থাকে। যেমন—গ্রহ, গাছ প্রভৃতির তথ্য।

B. **পর্যায়ক্রমিক স্মৃতি (Episodic memory) :** বিভিন্ন ঘটনা যা আমাদের জীবনে ঘটে থাকে সেগুলির স্মৃতি। এখানে কোনো যৌক্তিকতার ভিত্তি থাকে না। যেমন কেউ একজন বেড়িয়ে এসে কোথায় কোথায় গিয়েছিল, কী কী দেখেছিল তার বিবরণ দিতে পারে।

C. **প্রক্রিয়াগত স্মৃতি (Procedural memory) :** কোনো একটি কাজ বা প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পাদ করতে হয় সেই সম্পর্কিত তথ্য এখানে সঞ্চিত থাকে। যেমন কীভাবে গাড়ি বা কম্পিউটার চালাতে হয় তা স্মৃতিতে রাখা।

D. **চিত্রগত স্মৃতি (Photographic memory) :** কোনো ছবি বা চিত্র সম্বন্ধীয় তথ্য এই স্মৃতিতে সজ্জিত থাকে।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ দৃষ্টিভঙ্গীর শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Implication of Information Processing Approach) :

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ দৃষ্টিভঙ্গীর শিক্ষাগত তাৎপর্যগুলি হল—

(i) প্রারম্ভিক পর্যায়ে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য মনোযোগ বিশেষভাবে প্রয়োজন। সেজন্য শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকাকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

(ii) তথ্য তখনই অর্থপূর্ণ হয় যখন সেটি শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সুতরাং শিক্ষক/শিক্ষিকাকে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

(iii) তথ্য যদি সুসংগঠিতভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত হয় তাহলে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সহজ হয়। সুতরাং শিক্ষক/শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে তথ্য সুসংবদ্ধভাবে উপস্থাপন করবেন।

(iv) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকা অনেক কিছু আলোচনা করেন। সবকিছুই হুবহু মনে রাখতে হয় না। শিক্ষক/শিক্ষিকা অবশ্যই যেন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি আলাদাভাবে চিহ্নিত করেন, তাহলে তথ্য দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে সহজে পৌঁছাতে পারে।

(v) পূর্বপাঠের যেন মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি হয় সে ব্যাপারে শিক্ষক/শিক্ষিকার দৃষ্টি রাখা উচিত। এক্ষেত্রে তিনি মাঝে মাঝে পূর্বপাঠ থেকে প্রশ্ন করতে পারেন বা কিছু অনুশীলনী দিতে পারেন।

(vi) কোনো তথ্য কীভাবে মনে রাখা সহজ হবে সে ব্যাপারেও শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেবেন। যেমন—শিক্ষার্থীরা যখন সরল (অঙ্ক) করতে যায়, তখন কখন যোগ, বিয়োগ, গুণ ইত্যাদি হবে তা গুলিয়ে ফেলে। যদি তাদের BODMAS নীতিটি ভালো করে দেখিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তা দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে প্রবেশ করে।

(vii) নতুন জানা তথ্যকে বাস্তবের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত করা যেতে পারে তা দেখিয়ে দিলে তথ্য সহজে সংরক্ষিত হয়।

৬.৬ সারাংশ (Summary)

- শিখন তত্ত্বগুলি শেখার বিস্তৃত নীতি এবং কৌশলগুলিকে উপস্থাপন করেন ও আমরা কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করি তাঁর প্রক্রিয়ার উপর আলোকপাত করে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগবাদ তত্ত্ব, অন্তর্দৃষ্টিমূলক এবং প্রজ্ঞামূলক তত্ত্ব। এবং সর্বশেষে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা গঠন করে।
- থনডাইক দ্বারা প্রস্তাবিত ভুল এবং প্রচেষ্টার তত্ত্ব বা সংযোজনবাদ তত্ত্ব আমাদেরকে শেখায় যে আমরা কিভাবে প্রচেস্টা এবং ভুলের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করি।
- রুশ শারীরতত্ত্ববিদ আইভন প্যাভলভ দ্বারা প্রবর্তিত প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বটি আচরণবাদের মধ্যে একটি অন্যতম তত্ত্ব। এখানে কুকুরের সাথে একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্যাভলভ সফলভাবে দেখিয়েছেন যে একটি কৃত্রিম উদ্দীপক একটি প্রাকৃতিক উদ্দীপকের সাথে মিলিত হয়ে প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া করতে সচেস্ট হয় এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে।
- স্কিনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অপারেন্ট কন্ডিশনিং, যা আচরণ বাদের তত্ত্বের মধ্যে একটি অন্যতম তত্ত্ব। স্কিনার জোর দিয়েছিলেন যে প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য উদ্দীপকের উপস্থিতি অপরিবহার্য নয়। বেশিরভাগ শিখন পরিস্থিতিতে আমাদের আচরণ তার পরিণতি দ্বারা পরিচালিত হয়।

- শিখন তত্ত্ব হিসেবে অন্তর্দৃষ্টি মূলক শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীদের প্রতিষ্ঠিত থেকে বিকশিত হয়েছে। এই তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন জার্মান মনোবিদ কোহলার। তিনিই প্রথম অন্তর্দৃষ্টি মূলক কথাটি ব্যবহার করেন। উপরের সব তত্ত্বগুলি, এই ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে।

৬.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্ন (Self-assessment Question)

১. শিখন বলতে কী বোঝো?

২. শিখনের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

৩. শিখনের দুটি নির্ধারক সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪. আচরণবাদ বলতে কী বোঝো?

৫. অনুবর্তন এর সংজ্ঞা দাও?

৬. রেইনফোর্সমেন্ট কি?

৭. অন্তর্দৃষ্টি মূলক শিখন এর সংজ্ঞা দাও?

৮. তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ বলতে কী বোঝো?

৬.৮ গ্রন্থপঞ্জি (Reference)

Agarwalla, Dr. Sunita, (2008) Psychological Foundation of Education and Statistics, Bookland.

Aggarwal, J. C. (2004). Essentials of Educational Psychology, Vikas Publishing House, Pvt, Lted. New Delhi.

Chauhan, S. S. (1993) Advanced Educational Psychology, Vikas Publishing House.

Chaube, S. P., (2001), Educational Psychology", Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra-3

Mangal, Dr. S. K., (1998) Psychological Foundations of Education, Prakash Brothers, Ludhiana. 70

McLeod, S. A. (2013). Psychology perspectives. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/perspective.html

Johnson, A. Editor (2019). Child Growth and Development, ECE 101. California Community College, Santa Clarita Community College Distric & Distance.

Learning Office of Canyons. OER Publication by College of the Canyons, pp.

Safaya R. N. Shukla, C. S. Bhatia B. D. (2002), Modern Educational Psychology", Dhanpat Rai Publishing Company (P) Ltd., New Delhi.

Sarkar, B. (2013). Childhood & Growing up, Aaheli Publication, Kolkata.

পাল, দ., ধর, দ. দাস, ম., এবং ব্যানার্জী, প. (২০১২), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি কলকাতা।

রায়, স. (২০১০), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

NOTES

NOTES

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

NOTES

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....